Mehgony Homshikha

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED
MATERIAL

মেহগনি

হোমশিখা

ছোট গল্প সংকলন

গার্গী ভট্টাচার্য

টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার ক্রীড়া সম্পাদক

রূপায়ন ভট্টাচার্য (ভাইয়া দা) ও সুদর্শনাকে

☺

অ্যান লি

দরজাটা খুলে গেলো অল্প আওয়াজ করে। ভেতরে এলো এক দীর্ঘকায় ব্যাক্তি।

কালোমানুষ। নাম স্যাম। স্যাম সিল্‌বাসা। টোগোর মানুষ। এই দোকানেই কাজে এসেছেন। যেখানে এখন আমি এসেছি। আমি, মোম সেন। লেখিকা। গল্প লিখি। এসেছি আসলে দোকানটির সম্পর্কে জানতে। এখানে ওষুধ তৈরি করে দেওয়া হয় আমাদের কবিরাজির মতন, খল নুড়ি দিয়ে বেটে। এটা একটি ফার্মাসির ওয়ার্কশপ বলা যায়। কিছু ফার্মাসিস্ট মিলে এই দোকান চালু করেছেন। মূল মালকিন এক মঙ্গোলিয়ান মেয়ে। নাম অ্যান লি। এই লাট্রোবিয়া দেশে এসে পড়েছেন ফার্মাসি নিয়ে। এখানে অর্ডার দিয়ে নিজের স্কিনের মোতাবেক ময়েশচারাইজার, শ্যাম্পু, ক্রিম এইসবও মেলে। নানান ওষুধ ওরা বানিয়ে দেন ইন্সট্যান্ট বা সময় নিয়ে।

অ্যান লি ছিলেন না তাই স্যাম অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কালোমানুষ – খুবই মার্জিত। একটি বই খুলে পড়তে শুরু করেন। মনে হয় অভিনয় করেন কারণ বইটি সেই সংক্রান্ত। একটু হেসে আলাপ করি, যেচে।

শুনলাম অ্যান লি ওকে আসতে বলেছেন। ভদ্রলোক কিছু কিনতে আসেন নি বরং অ্যান লির সাথে দর কষাকষি করতে এসেছেন।

আজকের আবহাওয়াটি খুব সুন্দর। স্বর্ণালি সকাল। হলুদ রং। হিমেল হাওয়া। উজ্জ্বল একটি দিন যা সচরাচর হয়না আজকাল।

ভদ্রলোক সঙ্গের ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে নিলেন –আমাকে শুধালেন আমি নেবো কিনা। কাপ ওর সাথেই আছে, প্লাস্টিকের। সাদা সরু কাপ। ইউজ অ্যান্ড থ্রো। সাথের সবুজ ব্যাগ থেকে বার করছেন এক এক করে। আমি গদি আঁটা সোফার এক কোণে। অন্য পাশে উনি। কাপ হাতে আমি দাঁড়ালাম। উনি কফি ঢেলে দিলেন। এমন সময় দরজা খুলে সশব্দে ঢুকলেন হলুদ সুন্দরী অ্যান লি। উচ্চতা ৫ ফুট হবে, হলুদ রং, চাপা নাক ও চোখ, পাতলা গোলাপী ঠোঁট আর সপ্রতিভ একটি উপস্থিতি। বক্ষযুগল ঈষৎ ভারী।

একটু যেন বেশি ভারী। অনেকটা কাঁঠালের মতন। দোদুল্যমান।

ফেনিল মাতৃদুগ্ধের ভান্ডার যে তা সেটা পরে জানলাম। স্যাম উঠে গিয়ে ওর সাথে হাই হ্যাল্লো করে এলেন। অ্যান লির কাঁধে বড় মেটে একটি ব্যাগ। সেটি একপাশে রেখে কথায় লেগে গেলেন। আমার অস্তিত্বকে তোয়াক্কা না করেই কথা এগোতে লাগলো। যা বুঝলাম তা হল : অ্যান লি মাতৃদুগ্ধ বিক্রি করেন মাত্র ১৫০ ডলারে। দিনে তিনজনকে দেন। মূলত দেন গে কাপেলদের যারা শিশু দত্তক নিয়েছেন। আসলে ওদেরকেই দেন। অন্যদের দেন না। স্যাম গে। ওর পার্টনার এক সাহেব। অ্যান্ড্রু। ওদের শিশু এক চৈনিক।তার জন্যে এর দুগ্ধ নিয়ে যাবেন।

এসেছেন সেই কারণে। অ্যান লি সেইজন্যেই বক্ষভারে ন্যুব্জ। বক্ষযুগল বর্ষার ভরা নদীর মতন। প্লাবন এসেছে যেন। বাণ ডেকেছে। দুইকূল ছাপিয়ে উঠেছে, তোমরা এসো।

কলস ভরে নিয়ে যাও, অমৃত, নিষ্পাপ শিশুটির জন্যে।

এইদেশে সেম সেক্স ম্যারেজ সম্প্রতি আইনত স্বীকৃত হয়েছে আর ওরা শিশু সন্তান দত্তক নিতেও পারেন তবে সারোগেট মা মনে হয় ধার করতে

পারবেন না এখনও। কাজেই অ্যান লির এই সমাজ সেবার সুব্যবস্থা। আগে এরকম কেউ করেছেন বলে শুনিনি।

অন্যরকম বেশ। ভাবলাম অ্যান লি অন্যরকম মানুষ। কারণ ওর দোকানটিও ভিন্ন ধরণের। ফার্মাসি কিন্তু খলনুড়ি নিয়ে বসেন কবিরাজদের মতন। অর্ডার দিয়ে সব বানানো যায়। মায় শ্যাম্পু। চুলের বাহার ও ধরণ দেখে তৈরি করে দেবেন। কেশ হবে ফুরফুরে, গহিন বন, কালো। দারুণ।

অ্যান লি এবার আমার দিকে ঘুরলেন। মিষ্টি হাসির ফোয়ারা।

জানতে চাইলেন : কি মনে করে ?

আমি: ভাইটামিন ডি এর এক মাসের একটি ক্যাপসুল নিতে এসেছি। ইঞ্জেকশান হলেও হবে।

অ্যান : ওটা ক্যাপসুলেই হবে। একটু পরে এসো আমি বানিয়ে রাখবো। কেন তোমার ডি লেভেল খুব কম নাকি ?

আমি: হ্যাঁ, খুবই কম। ক্লান্ত লাগে।

অ্যান : আজকাল গরম দেশেও এরকম হচ্ছে। তুমি তো একটু ডার্কের দিকে বেশি করে রোদে ঘুরবে, চড়া রোদে নয় তাহলেই হবে। সানবাত নেবার চেষ্টা করবে।

আমি : সমুদ্রের ধারে মাঝে মাঝে নিই। তবুও বাড়েনা।

অ্যান : এই ক্যাপসুল খেলে বাড়বে তবে সময় নেবে। ঘুম খুব ভালো হবে কদিন।

যাইহোক ঘুরে এসো আমি প্রিপেয়ার করছি।

স্যামের সাথে হাসিমুখের আদান প্রদান করে আমি উঠে পড়লাম। আমার আবার চায়ের একটু বদাভ্যাস আছে তাই বাইরে এসে একটি কাফেতে গেলাম। সেখানে চা নিয়ে বসলম সাথে চিকেন এর ডানা ভাজা। আসলে একটু ক্ষুধা পেয়েছিলো।

ভাবছিলাম – কত রকমের মান আর হুঁশ আছেন জগতে।

এই আমি নিজে। বেশির ভাগ সময় থাকি সিমেটারি ও ফিউনেরাল গ্রাউন্ডে। রাতে এক কামরার বাসায় শুতে যাই। আমার পার্টনার মেল নার্স। ইতালিয়ান। অ্যান্থনি নেপোলি ওর নাম। লম্বা চুল। বেণী করে। তাই নিয়ে ঝামেলা হয় ওর সাথে। উইক এন্ডে বেড়াতে যাবার সময় অনেকটা টাইম নষ্ট হয় ঐ বেণী করতে। জট ছাড়াতে। বলি : চুল কেটে ফেলো।

ও শোনে না। এটাই নাকি ফ্যাশান। এদিকে আমি ন্যাড়া। আমার চুল নেই। কি কনট্রাস্ট। নেপোলি নানান ইরোটিক পোজে সেক্স করে আমার মোটেও পছন্দ হয়না। কিন্তু ওকে এত ভালোবাসি যে ছেড়ে যেতে মন চায়না। বিদেশে তো এসব খুব কমন। এখানে যৌনজীবনকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। সবাই নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। নেপোলিও করে। নর্মাল। অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যখন আমি ওষুধ আনতে গেলাম তখন একথা সেকথার পরে অ্যান লি বললে যে ও অবসরে একটি ডিসেবিলিটি কেয়ার সেন্টারে যায় কাজ করতে। সমাজ সেবা। সেখানে নানান বিকলাঙ্গ ও পঙ্গু মানুষেরা আছেন। তাদের নিয়ে একবার ওরা স্লাটদের সঙ্গে করে একটি হোটেল ভাড়া করে ছিলো এক টুরিস্ট স্পটে। ওরা খুব এনজয় করেছে। কারণ ওদের মধ্যে অনেকেই এই যৌনজীবন কোনোদিন উপভোগ করার সুযোগ পাননি। দৈহিক অক্ষমতার জন্য।

কিন্তু দেহপসারিনীদের জন্যে ওরা জানতে পেরেছেন এই কলার সৌন্দর্য্যের কথা। কোমল দিকের কথা। যা এই জীবনে ওরা ভেবেছিলেন ভাগ্যের পরিহাসে অজানাই রয়ে যাবে।

পরে দেহপসারিনীদের ঐ অক্ষমদের অর্গানাইজেশানের পক্ষ থেকে নানান উপহারে সজ্জিত করা হয়। পঙ্গু মানুষগুলি ওদের ভূষিত করেন নানান উপহারে। ওদের জীবনে এক একটি স্বর্ণালী মূহুর্ত আনার জন্যে।

একটু কোমলতা। একটু হৃদয়ের ছোঁয়া, কখনো বা, ভুল করেও !

অ্যান লি অন্যরকম । বোঝা যায় । এরা আছেন বলেই টিকে থাকে সমাজ । ফুলের মাঝেই থাকে কাঁটা, পোকা, পচন, দহন, গলিত শব । পন্ডিতের পাশেই বাস আকাট মুর্খের ।

তাদের দিকে যারা মায়াবী নয়নে চায় তারাই তো অনন্য ।

ফাইনাইট ইনফাইনাইটকে ভয় পায় । নতুন তত্ত্ব দেওয়া সহজ সব তত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে মহাশুন্যের দিকে অমৃত কুম্ভের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে শক্ত বলেছিলেন এক বড় সাধক ।

অ্যান লি কিছুটা হয়ত পারেন । ওর কর্মের ধারা ভিন্ন । ভিন্নপথ, ভিন্নমত ।

অ্যান লি সত্যি ভিন্ন । স্বল্প পরিচয়ে আমাকে বাড়িতে খেতে ডাকলো । এখানে কেউ এটা করেনা । আমাকে, নেপোলিকেও । এক উইক এন্ডে । ও তো শুক্রবার রাতে ভগবান শুক্রের কবলে পড়ে । লাভ গড ভিনাস । সারারাত চলে তান্ডব । সেক্স আর সেক্স । ইরোটিক সব পোজ । আমি ক্লান্ত হয়ে যাই । তবুও পরের দিন যেতে হল নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে ।

অ্যান লি অনেক কিছু রান্না করেছিলো । বেশির ভাগই ওদের দেশের মতন । বিফের চাউমিন । চিকেনের রাইস । লোটাসের ডাঁটি দেওয়া স্যুপ । আর অপূর্ব এক কেক । এরকম কেক আগে খাইনি । ও এক দ্বীপ থেকে এসেছে, ফার ইস্টের । ওখানে এখন কমিউনিস্ট শাসন । আগে রাজতন্ত্র ছিলো । বংশ পরম্পরায় ছিলেন অনেক রাজা । তাদেরই একজনের খাদ্য পরীক্ষা করার জন্য অন্যসব রাজার মতন ছিলেন অনেক মানব মানবী । সেইরকম এক মানবী হলেন অ্যান লির মাতা । উনি রাজার খাবার আগে খেয়ে দেখতেন । যদি কেউ বিষপ্রয়োগ করে হত্যার চেষ্টা করে তাহলে রাজা মারা যাবেন না । মারা যাবেন এইসব মানুষ । এরা একধরণের বডিগার্ড । এতে নানান সুস্বাদু খানা খেতে পেলেও প্রতিবারই ভয়ে থাকতেন ওর মা বুঝি এই খানাই শেষ খানা ! দা লাস্ট সাপার ।

সেই রাজাই শেষমেষ গর্ভ রঞ্জিত করেন ওর মায়ের এক বর্ষণমুখর রাত্রে । জন্ম নেয় অ্যান লি । রাজা বলেন : কেটে পড়ো । লোক জানাজানি করলে শূলে চড়াবো।

ওর মা চুই চুই লিওং এইদেশে পালিয়ে আসেন । রাজবাড়ি থেকে ব্যবস্থা করে দেয় সব । গোপনে । পরে ওখানে সমাজতন্ত্র আসে । ওর মা ফিরে গেলেও ও আর যায়না । এখানেই থেকে যায় ।

হাতায় করে আরো বিফের ডিশ দিলো । বেশ হয়েছে খেতে ।

বললো : কেমন লাগলো আমার জীবন কাহিনি ? একটা সময় আমি এখানে রেল স্টেশানে রাত কাটাতাম আর তোমাদের ভারতীয় গুরুদ্বয়ারায় গিয়ে লঙ্গরখানায় খেয়ে আসতাম ফ্রিতে কারণ পয়সা ছিলনা । এইভাবেই কাটিয়েছি কয়েক বছর যেমন বিজনেস টাইকুন স্টিভ জবস্ খেতেন ইস্কন মন্দিরে ।

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বলি : রাজকুমারীর সাথে লাঞ্চ করবো স্বপ্নেও ভাবিনি ।

নেপোলি একটু রসিক : হেসে বলে – রাজকুমারী এই জনমে ভিখারিনী !

অ্যান লি ও হাসে । হাসলে ওর মুখটা, ক্ষুদে চোখ দুটি বড় উজ্জ্বল লাগে ।

বলে : আমার বাবার ছবি দেখেছি বইতে, পেপারে । মিউজিয়ামে । ঐদেশে গিয়েছি কয়েকবার । বড় বড় হোর্ডিং-এ বাবাকে দেখেছি । কিন্তু তাঁকে নিজ পিতা বলে স্বীকৃতি দেবার উপায় নেই এই অভাগিনীর । মা গ্রামের বাড়িতে আছেন । ওখানে এখন ক্ষেত খামার দেখেন । আমার দিদিমার কিছু সম্পত্তি ছিলো সেগুলো দেখেন । একাই আছেন । আমি যাই তবে খুবই কম । এখানে আমার পার্টনার এক সাহেব । ও বলেছিলো যে ডি এন এ টেস্ট করে মোনার্কদের সাথে আমার কানেকশান প্রুফ করে ওদের থেকে প্রপার্টির ভাগ আদায় করতে । আমি ওসব করিনি । আমার বাবাকে হত্যা করা হয় । তবে বিষ দিয়ে নয় । গুলি করে । গুলি করেন আমার কাকা । তবে পরে প্রমাণ হয়ে যায় কোর্টে যে ওটা আদতে কাকার

মুখোশ পরে কেউ এসেছিলো। কাকা সেদিন ওখানে ছিলেনই না। ওনাকে বন্দী করে নিয়ে যায় অন্য দ্বীপে। আমাদের তো খুব বড় দেশ নয় তুমি জানই।

কোর্ট কাকাকে মুক্তি দেয়। সসম্মানে। আমার কাকা কিন্তু অন্যধরণের মানুষ। উনি যখন জানতে পেরেছিলেন যে আমি জন্মাতে চলেছি ও ওদের বাড়ির একজন –উনি আমাকে দত্তকে নিতে চান কিন্তু বাদ সাধেন আমার বাবা। সেটা অবশ্যই আমি শুনেছি মায়ের কাছে। পরে ওঁকেই তো খুনের দায়ে ধরা হয়। এই তো রাজনীতি। রাজ অনুশাসন। রাজ বংশের নিয়ম কানুন। আভিজাত্য। নরেশের পদস্খলন –তারপর একটি নিষ্পাপ ফুলকে পিষে ফেলা। তাকে সারাজীবন পিতৃ পরিচয় থেকে বঞ্চিত করা। এই তো সমাজের আসল রূপ।

সুপার পাওয়ারফুল রাজাদের চমৎকার সব প্রজাবৎসল কাজকারবার।

অ্যান লির মুখে চোখে স্পষ্ট বিদ্রুপের আভাস। টেবিলে হালকা বাদামী ক্লথ। কেমন উল ধরণের। ওর নিজ হাতে বোনা। তারওপরে পরিপাটি করে সাজানো সব রেকাবি। গেলাস। জলের জগ। চামচ,হাতা, প্লেট। ন্যাপকিন।

ওর বাড়িতে ও হাঁস পুষেছে। কারণ ও হাঁসের ডিম খায়। এখানে বাজারে সহজ লভ্য নয়। মাংস অবশ্যই মেলে। সেটাও খায়। হাঁসগুলি প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে বার হচ্ছে ওদের নিচু চাল ওয়ালা ঘর থেকে। বাগানে ঘুরছে।

অ্যান চোখজোড়া যতটা সম্ভব বড় করে বলে ওঠে : তুমি হাঁসের ডিম খাও ?

আমার খুবই প্রিয় কাজেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ি।

বলে : যাবার সময় দেবোখন। টাটকা কিছু আছে আমার কাছে।

লোকে দুইহাত ভরে শুধু ফুল দেয় আমি দিই হাঁসের ডিম। বলে আবার হেসে ওঠে। দিলখোলা হাসি।

আমি মজা করে বলি : হাঁসটি কি সোনার ?

ও আরো জোরে জোরে হেসে ওঠে। বলে : না না। কি যে বলো তুমি ! না না না না–

ওর এই নেগেটিভ উত্তর যেন আমাকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে যায়। এক অচিন দ্বীপে। যেখানে ও একদা ভ্রূণ হয়ে এসেছিলো কোনো এক অসতর্ক মুহুর্তে ওর মায়ের গর্ভে। হিরণ্যগর্ভ বলা যায়না যাকে। জারজ শব্দটি মানায় বেশ। তবে এটি খুব শক্ত শব্দ। খুব রূঢ়। শব্দের ছায়ায় মমত্ব নেই। শ্যাডো অফ ওয়ার্ড খুব রুড।

অ্যানের সাথে মানায় না। কারো সঙ্গেই কি মানায় ?

নিষ্পাপ সন্তান, ভালোবাসা, কিছু দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল কিংবা সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলার ভয় ----নষ্ট করে দেয় কিছু মানুষের জীবন। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এরা সুযোগ পায়, সম্মান পায়। তাই নীল বিষ দেহ থেকে নেমে যায়। কিন্তু যারা প্রাচ্যেই থেকে যায় তারা ?

হেমলক পান করেই অতিবাহিত করে ক্লেদাক্ত জীবন। এক কুয়াশাচ্ছন্ন অস্তিত্বের ন্যায়।

যাদের নাম সূর্যকিরণ হলেও তাদের সূর্যের প্রথম আলোটুকু দেখার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছে নিঠুর সমাজ।

শ্রমণ

কল্পিত কাহিনী এটি। কোনো দেশ বা জাতির সাথে কোনোভাবেই যুক্ত নয়।

লা ট্রোবে (লা ট্রোব দ্বীপ নয় এটা লা ট্রোবে দেশ, কাল্পনিক) দেশে আসার পরে খুব টানাপোড়েন চলায় একটি ঠিকুজি করতে গিয়েছিলাম এক পুরোহিতের কাছে। কারণ আজকাল সো কলড্ জ্যোতিষীর কাছে কুষ্ঠি করতে দিলেই তেনারা সফটওয়্যারে ডেটা ভরে একটি তৈরি করে দেন যা আমার পছন্দ হয়না কারণ ইন্টারপ্রিটেশানগুলি বিভিন্ন মানুষের আলাদা হয় কিন্তু এই সফটওয়্যারের কল্যাণে তা দেখা যায় যে সবারই প্রায় এক। এই পুরোহিতের ঠিকুজি করায় বেশ নাম আছে, সব মিলে যায় এবং উনি হাতে করেন। মন্দিরটা দক্ষিণ ভারতীয়। আসলে শ্রীলঙ্কার মন্দির। নানান ঠাকুর। আমাদের বাঙালী ঠাকুর বলতে বিষ্ণু ও দূর্গা। আর গনেশ। বাকি সব ওদের। কার্তিক আছেন তবে তার নাম ভিন্ন। আমরা তো নটরাজ, রাম লক্ষ্মণ, হনুমান, পার্বতী, নবগ্রহ, ভাল্লি, দেবসেনা, শ্রীদেবী, ভূদেবী, লক্ষ্মী নরসিংহ (নৃসিংহ অবতার), দক্ষিণামূর্তি, লিঙ্গাবতার, হরিহরপুত্রণ, ভূতনাথ, মহালক্ষ্মী, নক্ষত্র মন্ডলী এঁদের পূজা করিনা। কিন্তু এই মন্দিরে এঁরা সবাই পূজিত। সবার বিগ্রহ আছে। কালো পাথরের। স্নান হয়। যজ্ঞ হয়। চন্দন চর্চিত মুরতি।

সিল্কের পোশাক, শাড়ি, ধুতি। গহনা। যেন মানুষ। ফুলের আভরণ। বেশ লাগে। মন্দির প্রাঙ্গন পরিচ্ছন। পুরোহিতের ছুটি নেই।

মধ্য বয়স্ক। নির্দিষ্ট দিনে দিলেন ঠিকুজি। অর্থ দিতে গেলে নিলেন না। বললেন : যদি কিছু দিতে চান মন্দির ফান্ডে দিয়ে দিন। এটা আমার নেশা, পেশা নয়।

- কোথায় শিখলেন ?

- শৈশবে বাবার কাছে হাতেখড়ি । প্রখ্যাত জ্যোতিষি বরাহের সাথে আমার বংশের একটি যোগ আছে বলে বরাবর শুনে আসছি । শোনাকথা । ছক দেখে ভাগ্যগননা হয় না, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের পরশ লাগে ।
- সিংহলে রাজকুমারি খনার সাথে নয় ? আমার চোখে কৌতুক ।

উনি হাসেন । তারপর বলেন : নাহ্ ! আমি হিন্দু নই । আর রাজ বংশেরও নই ।

আমি আদতে বৌদ্ধ্য ।

ঠিকুজি করার সময় অনেকবার কথা হয়েছে । আলাপ প্রলাপও হয়েছে । মন্দিরের পাশেই আছে ছোট ক্যান্টিন । ওদেরই তৈরি । সেখানে সেল্ফ হেল্প । খেয়ে দেয়ে বাসন মেজে দিয়ে আসতে হয় । দক্ষিণ ভারতীয় খানা মেলে । ইডলি, দোসা, ইমলি বাত, কার্ড রাইস, দহি বড়া । ফিল্টার কফি ।

ওখানে বসে আমাকে উনি অনেক গুঢ় তত্ত্ব বুঝিয়েছেন জ্যোতিষের । কালসর্প যোগ কি । কেন হয়, এটি বিতর্কিত যোগ । আজকাল অনেকে বলেন এটি নবযুগের আমদানি । মন্ত্রী সান্ত্রীদের এই যোগ থাকা ভালো । কেতুর মহাদশা সব সময় মন্দ নয়। মানুষকে এই মহাদশা স্পিরিচুয়াল করে । বোঝায় যে পার্থিব জগতের বাইরেও ভুবন ও জীবন আছে । রাহু যাকে ধরে তার পৌনে একটা বাজিয়ে ছেড়ে দেয় –কেন । শনির ক্ষেত্রে এইটথ শনি কি, শনি সেকেন্ড হাউজে থাকলে কি বিপদ হয় ও তার দৃষ্টি কি । কেতু এইটথ হাউজে থাকলে কেন সমাজে মাথা কাটা যায় । যাদের বুধাদিত্য যোগ থাকে অথচ কমবাসচান হয়ে যায় (পুড়ে) তাদের কোনো তেমন লাভ হয়না সেটা কেন, রাজযোগ কি ইত্যাদি । মন্ত্রেশ্বর তাঁর সেলিব্রেটেড ওয়ার্ক ফলদীপিকাতে বলেছেন যে ভিনাস যাদের টেনথ হাউজে তাঁরা নামী হন । বুধ লেখকদের গ্রহ । ভিনাস কবি ও ফিল্মমেকারদের । আমার ভিনাসের মহাদশা শুরু হবে । আমার ক্ষেত্রে খুব পজিটিভ মহাদশা । আমার মালব্য যোগ আছে তাই সুবিধে হবে । এই অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে আলোচনা করি, তাতে করেই উনি আমার অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছেন । তাই বুঝি বললেন যে উনি আদতে বৌদ্ধ্য । হিন্দু নন । তাহলে হিন্দু মন্দিরে কী করছেন ? তাও অর্থোডক্স দক্ষিণী ব্রাহ্মণ মন্দিরে যাঁরা অব্রাহ্মণ কেন নিজেদের হাজারও কূল শীল দেখে তবে মন্দিরে

পূজারী করে নেয় তাদের এখানে এক অ- হিন্দু পুরোহিত হয়ে আছেন ? আর পূজার রীতিনীতি শিখলেন কি করে ? কৌতুহল বেয়ে পড়ছে আমার দুচোখ বেয়ে ।

ওনার চোখ এড়ায় না । ওঁকে দেখতে অবশ্য হিন্দুদের মতনই । পাকা দাঁড়ি । লম্বা কেশ । কাঁধ অবধি । বেণী করা । কানে মাকড়ি । হাতে চুড়ি । হীরের আংটি ।

বাইরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি । শীত । হিম হাওয়া ।

আজ ভগবান লক্ষ্মী নরসিংহের যজ্ঞ হচ্ছে । সচরাচর নরসিংহ অবতারের পুজো খুব কঠোর তপস্বী ব্রাহ্মণ কিংবা ব্রহ্মচর্য যাঁরা পালন করেন তাঁরা ব্যাতীত করতে পারেন না । নিয়ম নেই । অত পাওয়ারফুল একটি এনার্জিকে ডেকে অর্চণা করার জন্য পূজারির পিওর হওয়া চাই । শুদ্ধ হৃদয় । কিন্তু নিজ কনসর্ট লক্ষ্মী মাতাসহ নরসিংহের ক্ষেত্রে কিংবা যেখানে নরসিংহ অবতার যোগীর আসনে বসে আছেন সেই ক্ষেত্রে এই নিয়ম ভঙ্গ করা যেতে পারে । কাজেই এই মন্দিরে উনি পুজো করেন । আজকে অবশ্য অন্য এক পুরোহিত পুজো করছেন যিনি এর নিচে থেকে এই কাজ শিখেছেন।

ভদ্রলোক এখানে একা থাকেন । অন্য পুরোহিতরা পরিবার নিয়ে আছেন ।

গাড়ি চালান । অন্যদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় । কোয়াটারে থাকে মন্দির সংলগ্ন । বৌয়েরা ফুল সাজায়, মালা বানায় । প্রসাদ গোছায় । কেউ বিশেষ পুজো দিলে দক্ষিণী স্টাইলে পাঁচালি পড়ে দলবেঁধে বসে ও গান গায় ওদের ভাষায় । তামিল গান । ভক্তি মূলক সংগীতের মূর্চ্ছণায় মন্দির চত্ত্বর ভাবাবেগে ভরে যায় । ওরা অনেক সিস্টেমেটিক । ও পরিষ্কার । এখানে একটি বাঙালি পুরুৎ আছে মহা ধান্দাবাজ । বেছে বেছে মারোয়ারি ক্লায়েন্ট ধরে বেশি অর্থের লোভে । মোটা দাঁও মারে । আর পুজো-ও করে ঘন্টা । ঐ অং বং চং । ওর বৌটি হ্যাংলা । পরের পুজো বুক করার জন্যে পিছনে পড়ে যায় । লোকটি ডাক্তার । রুগী ছেড়ে ভক্ত খোঁজে । কারণ পুজোতে টাকা বেশি ।

এখানে রীতিমতন একটি আবাসন। বড় গাছপালা নিয়ে বিরাট এলাকা। মন্দির, ক্যান্টিন, দোকান, ফুলের দোকান, কোয়াটার, ওষুধের দোকান, ক্ষেত খামার যেখানে চাষ হয়। এগুলো ওরাই করেন। কিছু লোক আছে লাগানো। তারা লোকাল লোক। সাহেব ও কালো মানুষ। মন্দিরের খাবারে ঐসব জিনিস ব্যবহার করা হয়। ফুলেরও চাষ হয়। হিন্দু ফুল। করবী, গাঁদা, বেল, জুঁই, নয়নতারা, জবা।

এক ভাঁড় উষ্ণ চা নিয়ে বসলাম। সাথে পাপ্পাডাম। পাপড় ভাজা সোজা বাংলায়।

- শ্রমণ থেকে হিন্দু পুরোহিত কেন? শ্রীলঙ্কা থেকে লা ট্রোবেই বা কেন?
- হা হা হা, হো হো হো, দিলখোলা হাসি।

ভদ্রলোক জানেন তো আমি লিখি। বললেন : আমার আবরণ বা আভরণ কোনটাই যেন উন্মোচন করা না হয়।

কথা দিলাম। হবেনা।

- গল্পকার ও সাংবাদিকদের আমি বিশ্বাস করিনা। উনি হেসে ওঠেন আবার।
- না না আমরাও কখনো কখনো সত্যি কথা বলি, আর আমি অবিশ্বাসী নই।
- প্রমাণ দিতে পারো?
- জ্যোতিষী প্রমাণ চাইছেন? এবার আমার হাসবার পালা।

উনি স্বল্পবাক তবুও যেন কলকলিয়ে বলে ওঠেন : আচ্ছা মানছি তুমি কথা রাখবে মেয়ে, বিদেশী মেয়ে। তোমার লেখার একটি অনুবাদ আমাকে পড়তে দেবে তো।

- দেবো। আমি কথা দিলাম।
- আচ্ছা শোনো তাহলে।

বেশ গুছিয়ে বসলেন।

একটু দূরে হনুমানজীর মুরতি। ধুপের সুবাস বাতাসে। মন্দিরে চত্বরে লক্ষ্মী নরসিংহ অবতারের স্তব। ঘন্টার আওয়াজ।

শ্রমণ শুরু করলেন :

সালটা বোধহয় ১৯৯২। শ্রীলঙ্কা জ্বলছে। উগ্রহানার কবলে গোটা দেশ। জাগুয়ারের কবলে পড়ে পুরো দেশে বিশৃঙ্খলা। একের পর এক মনাস্ট্রি ওরা ভেঙে দিচ্ছে। ওরা হিন্দু। আমরা বৌদ্ধ্য। আমাদের দেখলেই গুলি করে মারতো। আমাদের সম্প্রদায়ের মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করতো। একের পর এক গুম্ফা ভেঙে দিলো। ধর্ম গ্রন্থ, পুঁথি, ভগবান বুদ্ধের মূর্তি বিনষ্ট করে দিলো। শিশুদের মেরে, মহিলাদের রেপ করে শেষ করে দিতে লাগলো সব। দিনের বেলায় জাগুয়ারদের ভয়ে সবাই লুকিয়ে থাকতো বনে। লোকালয়ে কেউ থাকতো না। ব্যবসা পত্র মাথায় উঠলো। এক এক করে মানুষ পালাতে লাগলো। শহর শুনশান। শ্রীরাধাপুরাম শহর হাহাকার করছে। টুরিস্টরা আটকা পড়ে গেছে। সে এক কেলেঙ্কারি।

সেই সময় বিশেষ ব্যবস্থা নিলো সরকার, সারা দেশে সেনা বাহিনী নামালো। আর্মি এসে সব হাল ধরলো। হলে কি হয় ?

বনে গিয়ে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলি যারা পালাতে পারেনি বা সামর্থ্য ছিলো না কিংবা গ্রামে ছিলো সেখান থেকে সন্তান সম্ভবাদের তুলে গর্ভনাশ করে ওদের ভ্রূণগুলি নিয়ে খেতে লাগলো জঙ্গিরা। তাতে নাকি অসুখ নির্মূল হয়, শরীর চাঙা হয়, কিডনি ভালো থাকে। চীনারা নাকি এরকম ওষুধ খায়, হংকং এর হাসপাতালে বিক্রি হয় গোপনে। এদিকে ওরা মানে এই উগ্রবাদীরা নিরামিশাষী ব্রাহ্মণদের হয়ে লড়ে। কিছু কিছু জঙ্গী আবার বৌদ্ধ্য মঠের ভেতরে গরু মোষ জবাইও করেছিলো। এই শ্রমণেরা তো অহিংসা পন্থী। কীট পতঙ্গও মারেনা তাঁরা। সেখানে এত বড় বড় পশু জবাই ? এরপরে না মানুষ জবাই করে !

উনি আরো বললেন যে ওখানে এক ইউরোপিয়ান মহিলা শ্রমণ ছিলেন। আগে তো মেয়েদের মনাস্ট্রিতে প্রবেশাধিকার ছিলোনা। পরে ঢুকতে দিতো

। লামাদের মধ্যে ছিলেন । পরে একটি গুহায় ৮ বছর ছিলেন পাহাড়ের গায়ে, প্রথম বিশ্বের সব সুবিধে ছেড়ে ওখানে থাকতেন উনি, এত ভক্তি । লম্বা, সোনালী চুল । নীল নয়না । সেই মহিলাকে অনেকদিন পরে মনাস্ট্রিতে ঢুকতে দিয়েছিলো । কারণ আগে কিছু সংখ্যক বিদেশী এসে লামাদের থেকে গুহ্যবিদ্যা আরোহণ করে নিয়ে গিয়ে পাশ্চাত্য দেশে সেগুলি প্রচার করতে শুরু করে বাণিজ্যিক কারণে । ভগবান বুদ্ধকে হেয় করে সেক্সের সাথে নানান ধ্যানের ভঙ্গিমা জুড়ে কিম্ভুতকিমাকার সিডি বানায় ।

লাস্ট অ্যান্ড সায়লেন্স নাম দিয়ে । তাই এদেরকে ঢুকতে দিতো না । পরে এই ভদ্রমহিলা নিজের কৃতিত্ব, ভক্তি এসবের পরীক্ষা দিয়ে তবেই অন্দরে যাবার অনুমতি পান । খুবই ভক্তিমতী ও লামারা ওঁর সম্পর্কে খুব উচ্চধারণা পোষণ করেন ও শ্রদ্ধাভক্তি দেখান । উনি মস্তক মুন্ডন করেন– এত ভক্তি ওঁর ।

এঁকেও ঐ উগ্রবাদীরা একদিন মেরে ফেলে । অতি জঘন্যভাবে । শিরচ্ছেদ করে ।

তখনই প্রাণের ভয়ে আমরা বৌদ্ধ্য থেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়ে যাই । হিন্দু মন্দিরে যাওয়া আসা শুরু করি । পুজোপাঠ রীতিনীতি ওখানে শিখি । ওদের দেখাদেখি কিছু কিছু শিখি । ভক্তি ভরে পুজো করি । আমি তো জ্যোতিষটা জানতাম ওটা আমার অ্যাডেড সুবিধে ছিলো । আর সব গডই তো এক কি বলো ?

শ্রমণের মুখে দুর্বোধ্য হাসি । আমি মৃদু হাসি । যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল ।

- ভ্রূণ ভক্ষণ ? জীবনে প্রথম শুনলাম ।

তা এইদেশে কি মনে করে ? বেশ তো ছিলেন হিন্দু সেজে ? জানতে চাই ।

- বেশি দিন ঐভাবে থাকা গেলো না । ওরা ধরে ফেললো । ধরে ফেললো যে আমি বৌদ্ধ্য । এক হিন্দু প্রিস্ট আমার মন্ত্রোচ্চারণে অশুদ্ধতা লক্ষ্য করে । সে গিয়ে বলে হেড প্রিস্টকে । উনি এসে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন । তারপরে বেরোয় যে আমি আদতে বৌদ্ধ্য । এরপরেই কিছু মানুষের সাথে আমি পালিয়ে আসি এখানে ।

ওরা আমাকে নাহলে মেরে ফেলতো । একটি বোটে করে সাত সমুদ্র পেরিয়ে পাড়ি দিই প্রাণ হাতে নিয়ে এখানে । বোটে অনেক মানুষ । প্রায় শখানেক । বসার স্থান কম । বোটটি স্টিমারের মতন । খুবই ছোট সমুদ্রের তুলনায় । সেই বোটে করে রওনা দিই। প্রাণের ভয়ে । গভীর সাগরে যাবার উপযুক্ত নয় সেই নৌকো । ওটা মাছের নাও ।

বলে থামলেন ।

বাইরে একটি লোক আসছে । দ্রুত পদচারণায় এসে কিছু কথা বলে গেলো । হয়ত পুজোর ব্যাপারে কিছু । অথবা কুষ্ঠি বিচার । কিংবা মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি নিয়ে আলোচনা । শুভ মূহুর্ত ।

ভদ্রলোক পুরুৎ মহাশয়কে খুবই শ্রদ্ধা করেন বোঝা গেলো । এক কাঁদি কলা ও অনেক আপেল এনেছেন । আপেল গুলি সবুজ । পুষ্টিকর । গ্রিন অ্যাপেল ।

বাগানের আপেল ওর নিজের ।

ও চলে যেতেই উনি আবার শুরু করলেন :

বোটে করে আসবার সময় বোটটি ডুবে যায় । ভাগ্য সহায় হওয়ায় মাঝ সমুদ্রে না ডুবে পাড়ের কাছাকাছি এসে ডোবে । আমরা সাঁতরে পাড়ে উঠি । তার মধ্যেই যারা সাঁতার জানতো না তারা ডুবে যায় । অনেককে আশেপাশের চলমান যান তুলে নেয়।

সেই সমুদ্র কিনারা থেকে বালুচর ধরে হাঁটতে শুরু করি । ধু ধু বালুচর । লোকজন নেই । শুনশান । মাইলের পর মাইল । গরম । প্রখর রোদ । নেই জল, খাবার । হাঁটতে হাঁটতে অনেকেই প্রাণ রাখলো । আমরা চারজন বেঁচে লোকালয় অবধি পৌছালাম । সেই ভাগ্যবানেদের মধ্য আমি একজন । ঐভাবেই এইদেশটায় ঢুকি । তারপর হিউমানিটির গ্রাউন্ডে এইদেশের সরকার আমাদের ভিসা দিয়েছেন । নাগরিকত্ব দিয়েছেন । কোথায় যাবো বলো তো ?

মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে এসেছি কতবার ওঁর কৃপায় । তাই এখন পরমেশ্বরের পুজোতেই জীবন অতিবাহিত করছি । ওঁর কৃপা নাহলে আজ জীবিত থাকতাম কি ?

অনেক মৃত্যুকে জীবন্ত হতে দেখেছি এই জীবনে । সরল মানুষগুলি গুলির আঘাতে পড়ে গেছে পর পর । ডুবে গেছে সমুদ্রের সুগভীর নীল জলে । হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে ধূ ধূ রৌদ্র্য তপ্ত বালুচরায়- চিরঘুমে । নিজ চোখে দেখা । এইসব বেদনা বুকে নিয়ে বেঁচে আছি । এ যে কি দু:সহ সুদর্শনা ! এখানে এসে এই মন্দিরে পুজারি হয়ে আছি । বৌদ্ধ মঠ কোথায় জানিনা । জানবার প্রয়োজনও মনে করিনি ।

এই প্রথম পুরোহিতের মুখে নিজের নাম শুনলাম । সর্বধর্ম সম্বনয়ের আহবান।

পবিত্র ঘন্টা ধ্বনির মতন শোনালো । যাঁর হৃদয়ে এত ক্ষত তিনি যখন গমগমে গলায় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন মনে হয় পুরো মন্দির চত্বর ভরে উঠেছে এক অদ্ভুত সুষমায় । স্বয়ং পদ্ভনাভ নেমে এসেছেন ধরায় । শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী বিষ্ণু---

তার মুখে নিজের নামটা শুনে আজ খুব ভালো লাগলো ।

আমার ক্ষুদ্র জীবনে এক আলোড়ন তুললো এই ধ্বনি ।

মনে হল এই জীবন আলেখ্য ; আজ যা শুনলাম আর এই নাদই আমার পরবর্তী দিনের সম্বল ----আমাকে এগিয়ে দেবে সমস্ত বাধার মধ্যেও ।

কবিগুরুর গানের মতন :

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ---যদি কেউ কথা না কয় !

ওরে ও অভাগা, সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় !

তাই তো আজও কবিগুরু অনন্য । তিনি সমস্ত ব্যাথা বেদনা একাকীত্বে আমাদের সাথেই আছেন যদিও তাঁর নশ্বর দেহ ধূলায় বিলীন হয়ে গেছে লক্ষ কোটি অযুত কোটি যুগ আগেই । কবিগুরুরা থেকেই যান । তাঁদের

ওপরেই ভাসমান মানব সভ্যতা নাহলে আমাদের মতন মানুষেরা বাঁচবে কাঁদের হাত ধরে ?

আমার ঠিকুজির আর কি বা প্রয়োজন !!

ওর অলক্ষ্যে, মনে মনে ঠিকুজিটি ছিঁড়ে ফেলে দিলাম মহাকালের শাশ্বত হাওয়ায় ।

ক্লাউন

সবুজ পাহাড় পার হয়ে যেতে হবে অনেক দূরে। আমাদের গন্তব্য স্থল বড় শহর হর্সডেল।

চড়াই উৎরাই পার হতে হবে। বড় গাড়ি। গাড়ি ঠিক নয় অনেকটা লরি গোছের। পেছনে সবাই বসে। মোট ছ -জন। সামনে ড্রাইভার ও দুই সাথি। একজন খালাসী ও অন্যজন তার ছেলে। সে কিশোর। আমরা এই গাড়ি ভাড়া নিয়েছি। একটি সার্কাস দলের কাছে যাবো। আমি গবেষক, এই দল নিয়ে গবেষণা করি। সাথে এক ক্লাউন ও ওদের দলে যোগ দেবে। এখান থেকে আমাদের সাথে জুটেছে। আর অন্যরা আমাদের সাথী। একজন অন্তঃসত্ত্বা।

আমরা সবাই আসলে ওদিকেই যাবো তাই একটি গাড়ি ভাড়া করে শেয়ার করলাম।

পথ ভারি সুন্দর। কিছুটা মেঠো। কিছুটা পাহাড়। বাড়িগুলি ইটের ও কাঠের, ওপরে চুলহা। ফায়ার প্লেসের নিশান। সাহেব ও কোথাও কোথাও কালো চামড়ার আভাস। অসংখ্য বিনুনি করা অ্যাফ্রিকান মেয়ে দেখা যাচ্ছে। পথে চলমান কিংবা দন্ডায়মান। এইদিকে অনেক পরিত্যক্ত খনি আছে। ক্রমশ লোকালয় কমে আসছে, পাহাড় গাঢ় হচ্ছে। এরপরে একটি নদী আমাদের পিছু নিলো, শেষে ও হল সাথী। নুড়ি পাথর ছড়ানো নদীটি কোথাও ক্রিকের আকারে কোথাও বিশালাকৃতি এইভাবে চলতে চলতে একসময়ে এলো ঘন পাইন বন। নদী আর নেই। দুই দিকে পাইনের সারি। উঁচু উঁচু পাহাড়। আমরা গাড়িতে গান গাইছি। বাইরে খুব ঠান্ডা। শীত আসন্ন। একটি জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে আমরা সবাই সঙ্গে আনা ফ্লাস্কে চা খেলাম।

কিছু বিস্কুট ও স্ন্যাক্স। বাদাম। কাজু।

খুব গল্প হল।

ক্লাউন তো পোশাক পরে। মাথায় ওর টুপি। মুখ চোখ ঢাকা। অন্যরা যে যার মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসছে। কথা বলছে কল কল করে। হাত নাড়ছে। পায়ের চাপে মুচ মুচ করছে শুকনো পাতা। অচেনা পাখি ডাকছে। তাদের সুমিষ্ট সুর শুনে ভুলে যাওয়া যায় সব। দুঃখ, কষ্ট, বেদনা।

কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে ঢলা ঢলি করছে। যেমন লরেন্স ও মলি। ওরা কাপেল। জড়াজড়ি করে ঘুরছে।

তারপর একটা সময় কোথায় চলে গেলো।

বড় বড় নাম না জানা গাছের সারি।

আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে দেখি একটি গাছের আড়ালে ওরা মৈথুন রত। এই শীতলতায়,মলির একটি স্তন অভিমানী আঁখি মেলে চেয়ে আছে অন্য স্তনের সহজলভ্য উষ্ণতার দিকে।

লরেন্স সাহসী। ওর পৌরুষ ঢেলে দিচ্ছে ক্রমশ, বনজ বিকিরণের তেজে।

মানব জাতির মন রহস্যাবৃত। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই তো এমন! যেমন বাইরে দেখা যায় অন্তরে তা নয়। খোলস ও শাঁস পৃথক। তাই প্রতিনিয়ত অভিনীত হয় নাটক। প্রতিটি রঙ্গমঞ্চে। আরেক নাটক অন্যদিকে। হোরা। ও আমাদের খালাসীর সেই কিশোর ছেলে। সে একটি ছোট প্যাকেট খুলে সাদা পাউডার নিচ্ছে। হয়ত ড্রাগস।

ওর বাবা দেখতে পায়নি।

সে অন্যদিকে গল্পে মশগুল।

আমরা একটু পরেই চলা আরম্ভ করবো। পথে খাবার আয়োজনও করা হবে। অনেকটা পথ। প্রায় নয় দশ ঘন্টার রাস্তা। এদিকে সেরকম হোটেল নেই। তাই খাবার আমাদের নিজেদেরই জোগাড় করতে হবে। স্বপাক আহারের ব্যবস্থা করা হবে। সেই মতন জিনিস আনা হয়েছে।

জ্বালানি, উনুন, বাসন কোসন, পাউরুটি, মাংস, স্যালাদ, টমেটো, পেঁয়াজ, জুকিনি, সস, আলু সেদ্ধ সব রেডি। শুধু জায়গা মতন বসে পাক করতে হবে। এখন চা হল। খানিকটা পথ পাড়ি দিয়ে রান্না হবে। তারপরে গোছগাছ করে আবার যাত্রা।

গাড়িতে সবাই এক এক করে উঠলো। অন্ত:সত্ত্বা মেয়েটির নাম দহমিনিকা।

সে যাচ্ছে ওর দয়িতের কাছে। আসন্ন প্রসবা। একা থাকে। বিদেশে এই তো অসুবিধে, দেখার লোক কম। বাবা মায়ের অভাব পূরণ করার লোক কম। এর কেউ নেই সেরকম, তাই। প্রেমিক অন্য শহরে কাজ করে। গার্বেজ কালেক্টর হিসেবে। ছুটি খুব কম। তাই ও সেখানে যাবে। ওখানকার হাসপাতালেই ডেলিভারি হবে।

ক্লাউনের নাম রবিন। রবিন গিভিং।

বহুদিন ধরে এই লাইনে। তা বছর দশেক মনে হয়। দারুণ হাসায় বলে শুনেছি। গাড়িতেও খুব মজা করছিলো। অন্যরা বলছিলো:বেশি মজা দেখিওনা, দহমিনিকার পেট ফেটে কেলেঙ্কারি

না ঘটে!

ক্লাউন হেসে ওঠে দিলখোলা হাসি : হা হা হা হো হো হো!

-এদের কাজ খালি হাসা, জীবনে কোনো সিরিয়াস নেস নেই এদের। জীবনের যে একটি সিরিয়াস দিকও আছে সেটা এই কমিউনিটিটি জানে না, মুখে একটু বিরক্তি এনে চাপা স্বরে বলে ওঠে মিশা। কালো মেয়ে মিশা। জাম্বিয়ার মেয়ে। কুচকুচে কালো। মাথয় অজস্র বেণী।

ও একটি সংস্থায় কাউন্সিলার। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার মেয়েদের কাউন্সেলিং করে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনে। সদা সিরিয়াস।

মৃদু হেসে বলি : তুমিও বাপু একটু হাসো না, এত গম্ভীর থাকো কেন সব সময় ??

ও চোখ তুলে ভ্রূ পল্লবে ঝিলিক এনে বলে : যারা থাকে দুধে ভাতে তারা হাসতে পারে। যারা জীবনের আদার সাইড দেখেনি তারা মস্করা করতে পারে, ও নয়। ও নাকি অনেক জীবন দেখেছে। আদার সাইড দেখেছে। সম্ভব হলে এই ক্লাউনটির ঘাড়ে ধাক্কা মেরে ও বার করে দিতো গাড়ির বাইরে। কেবল বসে বসে বোকা বোকা কথা বলে হা হা করে হাসছে!

আমার আর গুরুগম্ভীর তথ্য আদান প্রদানের ইচ্ছে আদৌ ছিলো না। তাই আমি অন্য কথায় গেলাম। এ কথা সে কথার পরে জানা গেলো ও চাইল্ড সেক্সের ভিকটিম। ওকে মলেস্ট করেছিলো ওর আপন কাকা। তাই ও স্থির করে নিজে কাউন্সসিলার হবে। হাসতে ভুলে গেছে এই কারণে।

ইতিমধ্যে আমাদের রান্নার জায়গা চলে এলো। একটি পরিচ্ছন্ন উপত্যকা গোছের স্থান। পাশেই কুলকুল করছে ছোট ঝোরা। ড্রাইভার এই পথে যাতায়াত করে প্রায়ই। তাই সব জানে কোথায় কি আছে।

পরিষ্কার এই চাতালে আমরা নেমে বাসন কোসন নিয়ে বসলাম। উনুন পেতে, মাংস বার করে স্যালাদ কেটে, পেঁয়াজ কেটে সব গোছ গাছ করে সাজিয়ে সবাই মিলে বসা হল। মাংস সেঁকে নেওয়া হল উনুনে।

আদতে সসেজ।

তারপরে রুটি দিয়ে সব খাওয়া হল। শেষ পাতে কেক। ভালই জমলো। তারপরে সব ময়লা গার্বেজ বিনে ফেলে দিয়ে আমরা সবাই মিলে উঠলাম পুনরায় গাড়িতে।

দহমিনিকার একটু হাঁসফাঁস করছিলো।

বোধহয় বেশি খেয়ে ফেলেছিলো।

ওকে ধরে গাড়িতে তুলতে হল আমায়।

আমি ওকে আমার পাশে বসালাম। ভালই করলাম। কারণ তার একটু পরেই শুরু হল নাটক। হঠাৎ ওর পেটে ব্যাথা। প্রথমটায় বোঝেনি। ভেবেছে বেশি খেয়ে ফেলাতে বিপত্তি। শেষে মলত্যাগের আভাস পেলো। পরে বুঝলো যে এটা প্রসব বেদনা।

পেট চেপে গাড়িতে লুটিয়ে পড়লো সে।

আমি হতবাক। কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। অন্যরাও বিস্মিত। গাড়ি এখানে থামবে না কারণ পথ খুব সরু। থামার জায়গাই নেই। মোটামুটি চওড়া জায়গা নাহলে থামতে পারবে না। ও ভূমিতে লুটাচ্ছে। পেট চেপে। আমি অসহায়।

ক্লাউন এগিয়ে এলো। ও সবাইকে হাসাচ্ছিলো যথারীতি। মিশা বেশ বিরক্ত ওর কান্ড কারখানা দেখে। আর এখন দহমিনিকার প্রসব বেদনা ওঠায় তো ও প্রায় ক্লাউন রবিনকে গাড়ি থেকে ফেলে দেয় আর কি ! যেন ওর হাসানোর জন্যেই এই বিপত্তি ঘটেছে !

- টেক ইট ইজি টেক ইট ইজি ! রবিনের কোমল গলা।

এক টানে খুলে ফেললো মুখোশ সে। এই প্রথম দেখলাম ওর মুখ। অসম্ভব রূপবতী। এত রূপ ওর ?

ক্লাউন আদতে এক নারী !

রবিন নাম থেকে বোঝার উপায় নেই ! গাড়ি ততক্ষণে একটি উপত্যকায় এসে গেছে।

ঘাসে ঢাকা। বিকেল এসে পড়েছে প্রায়। দুপুর আর নেই। আমরা সবাই গাড়ি থেকে নামলাম। দহমিনিকাকে ধরা ধরি করে নামানো হল।

নরম ঘাসের ওপরে ওকে শোয়ানো হল একটি চাদর পেতে। চাদর মানে মোটা কার্পেটের মতন। দহমিনিকা ব্যাথায় কোঁকাচ্ছে। ক্লাউন এলো। অর্থাৎ সুন্দরী রবিন। এসেই বললো একটু গরম জল লাগবে। আর জায়গাটি ঘিরে ফেলো, পুরুষেরা তফাৎ যাও। তাই হল। তাঁবু মতন করে ঘিরে ফেলা হল। কাপড় দিয়ে। ছেলেরা সরে গেলো। মিশা বড় বড় চোখে চেয়ে আছে। ক্লাউনের কান্ড দেখে।

এতক্ষণ হাসি মস্করায় মাতিয়েছে যে বাফুন সে হঠাৎ এত সিরিয়াস ? জীবনের সিরিয়াস বিষয়ের পাঠ তাহলে তারও কিছু নেওয়া আছে ??

শুইয়ে দিলো ওকে মোটা গালিচায়। বেচারি ছটফট করছে। আমি অসহায়। চেয়ে আছি ওর দিকে। রবিন এসে গরম জল নিয়ে তারপরে লেগে গেলো কাজে।

নিপুন হাতে ডেলিভারি করলো। নাড়ি কাটলো। জন্ম নিলো একটি সুস্থ সন্তান।

ক্লাউনের কর্ম কান্ডে মুগ্ধ মিশা, জীবনের সিরিয়াস কারিগর।

এখন বিশ্রাম নেবে দহমিনিকা ও তার সন্তান। একটি ফুটফুটে মেয়ে। আমরা সবাই মিলে ওর নাম দিলাম ডাস্ক। কারণ ও গোধূলি বেলায় জন্মেছিলো। ফর্সা, লাল টুকটুকে একটি মেয়ে। যেন পরীর দেশ থেকে এসেছে। আপেল আপেল গাল। আইসক্রিম শরীর।

ক্লাউন রবিনকে নিয়ে পড়লো এবার মিশা।

- তুমি এত সিরিয়াস কাজও পারো তাহলে ?
- হ্যাঁ। মৃদু জবাব রবিনের একটু হেসে।
- কোথায় শিখলে ?
- কেন ? কেন জানতে চাইছো ?
- এমনি কৌতুহল।
- সে অনেক লম্বা গল্প। মুখে কৌতক এনে বলে রবিন।

হাত সাফ করে, মুছে একটি বিস্কুটে মুখ ডুবায়। আমিও একটি নিলাম। মুচমুচে বিস্কুট। আবহাওয়া শীতল। জিনিস গুছিয়ে একটু পরে রওনা দিতে হবে। অরণ্য বলে কথা। জংলী জানোয়ার আছে কিনা কে জানে !

সারথী অবশ্য বললেন যে এদিকে বেশি হিংস্র কিছু দেখা যায় না তবে বলা যায়না। জঙ্গল তো।

একটু বিশ্রাম হলেই আবার চলা শুরু হবে। রবিন বিস্কুটে মুখ ডুবিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বললো, একটু চা হবে ?

মিশা ফ্লাস থেকে গরম চা ঢেলে দিলো। নিজেও নিলো। আমাদের দিলো যারা খাবে। যেখানে রান্না করা হয়েছিলো সেখানে ফ্লাস্কে চা ভরে নেওয়া হয়েছিলো।

ক্লাউনকে মিশা এখন বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে ও শ্রদ্ধার চোখে দেখছে।

রবিন মুখ খুললো : বিস্কুট ঝেড়ে ও গলা ঝেড়ে বললো :

ও আসলে এক ট্রেন্ড গাইনোকোলজিস্ট। ইংল্যান্ডে ট্রেনিং নেয়। তারপরে অর্থের নেশায় চলে যায় মরুশহরে। সেটা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে।

মুসলিম দেশে। বোরখা পরা। আলখাল্লা পরা সব। পেট্রো ডলার আছে তবে অনেক বাঁধনও আছে।

ওরা মনে করে ওদের এই বোরখা ও আলখাল্লাকে পশ্চিম দেশের শ্রদ্ধা করা উচিৎ। ওদের কালচার ও শালীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

ওরা ওদের মতন। তাই নিয়ে হাসি মস্করা করা কিংবা টিটকারি দেওয়া অশোভন। এসব ঠিকই ছিলো।

কিন্তু রবিন যখন গাইনোকলজিক্যাল ক্যান্সারের কাজের জন্যে বিশেষ কারণে জরায়ু, গর্ভাশয়, ডিম্বাশয়, যোনি ইত্যাদির ছোট ছোট মডেল তৈরি করে ওর হাসপাতালে ব্যবহার করতে লাগলো তখন একদিন ওকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হল তারপরে আরেক দিন সব তচনচ করে ওকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল ও পর্ণোগ্রাফি করছে বলে। এবং শুধু তাই নয় ওদেশে মেয়ে গাইনি একটিও নেই। সব পুরুষ। মেয়েরা পুরুষ চিকিৎসকের কাছে নর্মালি যায়না বলে বহু নারী ক্যান্সারে মারা যায়, চিকিৎসা করে না। ওর সম্পর্কে বলা হল যে ও বিকৃত কাম তাই মডেল বানিয়ে ঐসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কে ব্যবহারিক জীবনে আনার প্ল্যান করেছে। ও কিছুতেই বোঝাতে পারলো না যে ও ডাক্তার, এটা ওর কাজ। এটা পর্ণোগ্রাফি নয়।

মুসলিম দেশ থেকে বিতারিত হয়ে এখানে আসে। আর ডাক্তারি করেনা। আসলে মনটা ভেঙে যায়।

ওর বাবা ছিলেন ক্লাউন। পেশাদার নন। নেশায়। তাই শৈশব থেকেই ও নানান মুখ ভঙ্গিমা করতে পারতো। মানুষকে হাসাতে ও নিজে হাসতে পারতো। সেই স্বভাবটাই একটু ঘষে মেজে নিয়ে হল পেশাদার ক্লাউন। কিন্তু ছিলো তো তুখোড় এম আর সি ও জি। (গাইনি)

তাই আজ বেঁচে গেলো দহমিনিকা। নাহলে এই পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কে ওকে প্রসব বেদনার হাত থেকে বাঁচাতো ?

কেসটি যদিও জটিল হয়নি। নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে। তবুও।

রবিনের একটি মেয়ে ছিলো।

ওর বন্ধুর সাথে।

সে অবশ্য ওকে বিয়ে করেনি । ভারতীয় ছেলে । পাঞ্জাবী । ওরা রিলেশানশিপটি কুইট করে । তখন ও সন্তান সম্ভবা ।

জন্ম দেয় মেয়ের ।

হোস্টেলে বড় হয়েছে । ওর অনিশ্চিতের জীবন তো, আজ এখানে সার্কাস কাল ওখানে তাই ।

ও এখন স্ট্যানফোর্ডে পড়ে । বিজনেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে । বেশ বড় হয়ে গেছে । রবিনের বয়স বোঝার উপায় নেই । এত রূপসী ও মুখে বলিরেখা নেই একটুও ।

ও অবশ্যি বললো : মেয়ের জন্ম দিই যখন আমি মাত্র ১৫ ।

আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে রোজ সেক্স করতাম । তখন মেডিক্যাল পড়িনা । হাই স্কুলের শেষ । আমার মা আমাদের প্যাশন দেখে বাড়িতেই থাকতে দিলেন । মায়ের বেডরুমের পাশেই আমরা থাকতাম । জোরে জোরে আওয়াজ করে সেক্স করতাম এত প্যাশন ছিলো তাই তো এত্তো কম বয়সে মেয়ে হয়ে গেলো !

জানতে চাই : মেয়ে বাবার কাছে যায় ? বাবা কোথায় ?

বলে : ওর বাবা তো ডাক্তার । পাঞ্জাবের গ্রামে থাকে এখন । আগে ইংল্যান্ডেই ছিলো । এখন দেশে চলে গেছে । আমাকেও ওখানে যেতে বলে, আমি যাইনি তাই বিয়ে হলনা । আমি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যাবোনা । ও ওখানে থাকে, ক্ষেতি বাড়ি করে । ওর আর ওর ওয়াইফের নাম এক । দুজনেই নভজ্যোতঃ । ফানি, তাই না ? ও এখন ভিলেজে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কাজ করে ।

গর্ভিনীদের দেখে, জটিল কেস সারায়, সম্মান পায় । ভারত সরকার কিছু পুরস্কারও দিয়েছে ওকে । আমার মেয়ে তো ওর কাছে যায় । তবে মেয়ে ডাক্তার হয়নি বলে ও বিরক্ত ।

আমাকে বলেছে : দেখো ওকে আবার তোমার মতন ক্লাউন বানিও না যেন । জীবনে সিরিয়াস কিছু ও করুক আমি চাই । ক্লাউন গিরি নয় ।

শেষের কথাগুলি নিয়ে এলো একরাশ কষ্টনুড়ি, বিষণ্ন বাতাস ওর ভুবনে।

অস্ফুটে শুধু বলতে পারলো : সবাই কি হাসাতে পারে বলো দেখি ? ওরা তো বেদম হাসে, তবুও ক্লাউনের কৃতিত্বকে ওরা খাটো করে কেন ??

শ্যাওলা

উত্তরপূর্ব ভারতের শৈল শহর সিংলা । এখানে ভালই বৃষ্টি হয় । চেরাপুঞ্জির মতনই প্রায় । তবে এটি মিজোরাম, মণিপুর এইসব দিকে, মেঘালয়ের দিকে নয় । গল্পে কি না হয় !

কবি বলেছিলেন না :

চেরাপুঞ্জি থেকে এক খানি মেঘ ধার করে এনো গোবি সাহারার বুকে---

ঠিক এই লাইন না হলেও একটু এদিক ওদিক হবে।

ভাবে রণি। অরণি দেবসেন । বাবা ও মা দুজনের পদবীই ব্যবহার করে । দুজনের কেউ আর জীবিত নেই । বাবা শৈশবেই গাড়ি দূর্ঘটনায় গত হয়েছিলেন চেন্নাই শহরে। মা ও বাবা দুজনে ওখানে আই আই টি তে অধ্যাপনা করতেন । পরে মা বিদেশ চলে যান । একা ।

রণি ওর দাদু ও দিদিমার কাছে রয়ে যায় কলকাতায় । সেখানেই ও মানুষ বরাবর । কারণ ওর মা আমেরিকায় গিয়ে ড্যাস কাকুকে বিয়ে করেন । পরে অবশ্য রণি ওকে ড্যাসবাবা বলতো । উনি খুবই ভালোবাসতেন রণিকে । একটা সময় উনি বেশ উচ্চপদে আসীন হন ফাইনান্স বিশেষজ্ঞ রূপে । মনিটারি পলিসি, ফিসকাল পলিসি এইসব নিয়ে মধ্যরাতে নাকি ঘুমের মধ্যে চীৎকার করতেন ।

এহেন পরিবারের এক ছেলে আজ কর্মসুত্রে সামাজিকভাবে ঘৃণিত । তার পরিচয় সে এক পিম্প । মেয়েদের দালাল । কর্পোরেট দুনিয়ায় মেয়ে সাপ্লাই দেয় । রণি খুব শার্প, উইটি, নম্র । বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ ওর । ছোট করে কাটা চুল, মুখটা অনেকটা আমীর খানের ধাঁচের । মাঝারি হাইট । রং মাজা । মার্জিত মানুষ সে। হলই বা মেয়েদের দালাল । তবে সে যেসব মেয়ের দালালি করে তারা বেশির ভাগই হাই ফাই, রূপসী ।

রূপ-সী নদীর বধূয়া, হাওয়ায় দোলা মহুয়া, মনেতে আগুন জ্বালায় ---------

এরা ডিগনিফায়েড স্লাট । অভিজাত দেহপসারিনী । না বলে দিলে মনে হবে রাজকন্যে।

কেউ কেউ স্বেচ্ছায় কেউ বা অ্যাডভেঞ্চারের আশায় কেউ একটু ফ্রি টাইম পাস । হয়ত কলেজ গার্ল ।

পেয়ার মাঙা হ্যায় তুম হি সে, না ইনকার করো----

এই পেয়ার এক রাতের, নেশা ধরায়, সমুদ্র নীলে ডোবায় না ।

রণি প্রেম সাগরের নাবিক ।

মোটা টাকা কামায় । মার্সিডিজ বেঞ্জ চড়ে ।

কলকাতায় থাকেনা । থাকে নিউ দিল্লীর কাছে দ্বরকা বলে একটি জায়গায় ।

নিজে বিয়ে করেনি । ভালোবেসেছিলো পাঞ্জাবী মেয়ে মৌলি সিং কে । সে এক পাঞ্জাবী যুবককে শাদী করে চলে গেছে লন্ডন । তারপর থেকে রণি একা । কামিনী ফুলেদের মাঝেই তার জীবন কিন্তু মনে মনে একা । জুঁই ফুলের সুবাস নেবার আর স্বাদ জাগেনি মনে ।

মৌলি সিং মাঝে মাঝে ওকে মেসেজ করে মোবাইলে । অরণি দেবসেন বলে : এগুলি করো না । আমি তোমার সাথে বেশি ইন্টার‍্যাক্ট করলে তুমি তোমার হাবির প্রতি লয়াল থাকতে পারবে না !

মৌলির হাবি ওখানে দুই পুরুষের ব্যবসাদার । হোটেল চালায় । ভালই ধনবান । মৌলি ফ্যাশান ডিজাইনার । নিজস্ব দোকান চালায় । তার নামও দিয়েছে রণির পছন্দ অনুসারে ।

সিন্দুর -----

সিন্দুর পরানোর ইচ্ছে ছিলো ওকে রণির, তাই হয়ত । লাল রঙ ওর প্রিয় খুব ।

লাল রঙে একটা দীপ্ত ভাব আছে, তেজ আছে ।

মৌলি জানে যে ও পিম্প । তবুও ওকে ভালোবেসেছে ।

ও বলে : ওটা তোমার পেশা। আমি মানুষটাকে ভালোবাসি। তোমার দেহ, নারী ফেরি করে। চেতনাকে কি কালিমা লিপ্ত করা যায় ? তুমি ভাগ্যের পরিহাসে এই লাইনে এসেছো। তুমি তো ওদের রক্ষাও করো। তাতেই বোঝা যায় যে আদতে তুমি ওদের রক্ষকই, ভক্ষক নও।

তা রক্ষা করে বটে। পার্ভার্ট, লম্পট, মদ্যপ মানুষের হাত থেকে। অনেকে ওদের মারধোর করে। তারা সোসাইটিতে ভদ্র মানুষ। সি ই ও, সি এফ ও, সি ও ও এইসব পদাধিকারি।

কেউ ভাইস প্রেসিডেন্ট। একবার ও মজা করে একটি মেয়েকে বলেছিলো যে এরা ভাইস এর প্রেসিডেন্ট। ভার্চুর নয়। মেয়েটির সাথে এক ভাইস প্রেসিডেন্ট অন্য বন্ধুকে নিয়ে সঙ্গম করেন। যাকে বলে থ্রি –সাম। টেকনিক্যাল ভাষায়। Paul Avril, ছিলেন erotic literature এর এক নামী illustrator---

তাঁর বহু চিত্র ঘরে সাজিয়ে এই ভাইস প্রেসিডেন্ট সঙ্গম করতেন সেইভাবে। মেয়েটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালিয়ে আসে শেষমেষ। ওকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বাঁচায় এই রণি। মৌলির এক্স ফ্লেম। ফার্স্ট ফ্লেম। মৌলি যাকে বিয়ে করতে অক্ষম ছিলো ওর ঠাকুমার জন্য। উনি এক পাত্রের পরিবারকে কথা দিয়েছিলেন আগেই। তার সাথেই বিয়ে হয় উনি মৃত্যুশয্যায় থাকাকালীন। অমৃতা লুধিয়ানভি –ওর ঠাম্মা।

অমৃতা প্রীতম আর শাহির লুধিয়ানভির ফ্যান ছিলেন উনি তাই ওরা ঐ নামে ক্ষ্যাপাতো। বেচারা রণি। পিম্প হয়েও দোসর জোটেনি যার।

চাঁদনি রাতে একাকী হেঁটে যায় নিরুদ্দেশে। ইচ্ছে করেই মোবাইলে কল করেনা মৌলিকে। কে জানে সে হয়ত এখন ওর পতি দলবীরের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে।

ইরোটিক কথাটির অর্থ সে বুঝেছে এই লাইনে এসে। মেয়েদের মাংস বা ফ্লেস ট্রেড কি বস্তু তা খাতায় কলমে এক আর বাস্তব জীবনে আরেক। মানুষ যে কত নিচে নামতে পারে তা নিজ চোখে তার দেখা। রক্ত মাংসের

দেহ গুলির প্রতি একটু মায়ায় জাগে না ওদের । যারা উচ্চশিক্ষিত, সদ্বংশজাত, রুচিবান ।

অনেক মেয়ে আবার কিছু এক্সট্রা কামিয়ে নেবার আছিলায় আসে । হয়ত পেশায় তারাও কেউকেটা । ফেলনা নন । তবুও । মোবাইলে কল আসে রণির কাছে । কাল রাতের শিফটে একটা হবে কিনা কিছু । পিম্প নয় সে তখন, মিস্টার রণি কিংবা রণিদা ।

সিংলায় রণির আসা নিজ ভাগ্য জানতে । এখানে এক বুড়ি আছেন । বর্মি । কাছেই বর্মা বর্ডার । এখন তো নাম মায়নমার । উনি পুঁথির কাজ ও সুতির জিনিস সেলাই করে রকমারি বাহারি বস্তু তৈরি করেন ।

আন্তর্জালে পড়ে এসেছে রণি । অবসরে জ্যোতিষ করেন । নির্ভুল গণনা । রণি জানতে চায় কেন তার জীবন এমন হল । সে তো এরকম একটা ঘৃণ্য জীবন আশা করেনি । ড্যাসবাবা তো ওকে দেখতেন । মা আত্মহত্যা করেন । ঝামেলা হত ওঁর সাথে প্রায়ই । শেষে মা কোকেন নিতেন । মা চিরকালই ডেসপারেট । কিছুদিন কমিউনিজম করেন। শেষে সুইসাইড । ড্যাসবাবা ; মা মারা যাবার পরে রণিকে নিয়মিত মায়ের শেয়ার দিতেন । যা অর্থ ওর নামে ছিলো ।

সেসব ঠিকই ছিলো কিন্তু রণির ঐ বাড়ি যেতে ঘৃণা হত কারণ ড্যাসবাবা কাজের মাসী শিলাদিদিকে নিয়ে থাকতেন । শিলাদিদি ওর মায়ের শয্যায় শুতো । ওগুলো রণির ভালোলাগতো না । তাই ও যাওয়া বন্ধ করে দেয় । একসময় আর টাকা নিতেও যায়না কারণ ততদিনে ড্যাসবাবার ঘরজোড়া সন্তান, সব শিলার সাথে । ঘুটিয়াশরিফের মেয়ে শিলা আজ রাজরাণী । ওর মায়ের শাড়ি পরে, চপ্পল পরে, সিন্দুর পরে, গয়না পরে--

রণি মেয়ে ফেরি করতে নামে ।

একদিন দুই চোখে ওর স্বপ্ন ছিলো ও বড় বিজ্ঞানী হবে । ওর বাবার মতন । বাবা তো ফার্স্ট ।

ও ছোটবেলায় ক্লাসে ফার্স্ট হত । দুই হাত ভরে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি আসতো । ওকে প্রাইজ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যেতেন টিচার, হেড মিস্ট্রেস । প্রায় সব বিভাগেই ও ফার্স্ট।

সবচেয়ে ভালোলাগতো জ্যোতির্বিজ্ঞান। আকাশে কত তারা, গ্রহ নক্ষত্র। তাদের জানা, চেনা। উল্কাপাত, শনির বলয়, বৃহস্পতির এত্তো বড় সাইজ তুলনায় বুধ গ্রহটা এত্তো ছোট্ট –এইসব খুব আকর্ষণ করতো ওকে। কলকাতায় প্ল্যানেটোরিয়ামে গেছে কয়েকবার। দারুণ মজা হত। হ্যালিজ কমেট দেখেছিলো। দূর্দান্ত। কত কি ভেবেছিলো এসব নিয়ে।

সেই অ্যাস্ট্রোনমি কেন হলনা জীবনে তাই জানতে অ্যাস্ট্রোলজির দোরগোড়ায়।

এই বৃদ্ধা থাকেন ছোট বাসায়। আন্তর্জালে ওর নাম শুনেছে। লোকাল পত্রিকা কভার করেছে খবর। ঠিকানা নিয়ে এসেছে। অবসরে উনি ঘাসের টুপি বানান। এখানে লোকে ঘাসের টুপি ও কোট পরে বার হয় কারণ খুব বরিষন হয় যখন তখন। বছরের অনেকটা সময় লোকে ঘরের বাইরে বেরোতে পারেনা। খাবার দাবার আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখে। প্রচুর বৃষ্টি হয়।

ঘরের ভেতরে মেঘ ঢুকে যায়। বেশির ভাগই গরীব গুর্বো। ধনবান কম। মধ্যবিত্ত আছে কিছু। চার্চ দুটি। পাদ্রীরা সব চালনা করেন। সোসাল ওয়ার্ক ওরাই করেন। কাছেই বর্মা। মানুষ বর্ডার পার হয়ে ওদেশে ঢুকে পরে। লোকাল ভাষা মারোমি। আদিবাসী প্রচুর। ভিনদেশীও দেখা যায়। ইংলিশেও কাজ চলে। কেউ কেউ বর্মি বলে। বর্মিদের নানা ভাষা তা কোনটা এরা বলে তা রণি জানেনা। সীমানা পার হয়ে লোকে যায় আবার সেনাবাহিনীর ভয়ে ফিরে আসে এখানে। ওদিকটা কেমন গিয়ে দেখলে হয়।

এদিকে পাইনের বন, আঁকা বাঁকা পথ, সোনালি আলো। পাহাড়ের ছায়া মাখা পাথুরে পথ।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি প্রায় সর্বদা। মেঘের আনাগোনা। মেঘের চাদরে ঢাকা এক আজব দেশ।

বুড়ির নাম মেহ্তাই। অনেক বয়স। চোখে তার রূপালি আলো। ছেলেপুলেরা আইজলে থাকে। একজন আবার নাগাল্যান্ডে কাজ করে। সে খুব নাকি বড়লোক। কি না জিপের ব্যবসা করে। টুরিস্ট জিপ।

মেহ্‌তাই সব শুনে টুনে বলেন : দেখ বাছা মানুষের কর্মের বোঝা কেউ বয় না। আমরা যখন কুকর্ম করি তা রাগে হোক ঈর্ষায় হোক বা ভয়ে তখন ভাবিনা তো কে এর দায় নেবে ! সেই বোঝা নিজের ঘাড়েই চাপে। শরীর চলে যায়, কর্ম থেকে যায়। আবার দেহ ধারণ করে নেমে আসে ধরার সেই কর্মের ফল ভোগ করতে। তুই ও সেরকম কোনো কারণে এই জীবন যন্ত্রণা ভোগ করছিস। তবে জীবনটাই একটা বই। সবাই ইস্কুল কলেজে যায়না রে। সুযোগ হয়না। কিন্তু তাদেরও জীবন দিব্বি কাটে। কে শেখায় ? কোন বইতে লেখা সেসব ? কর্ম বইতে। যা করে এসেছো আগের জনমে।

তুমি তা বদলাতে পারবে না। যা করতে পারো তা হল এই জন্মে শুভ কর্ম। সৎ কর্ম।

যেমন তুমি। ঐ পথ ছেড়ে দাও। এখানে চলে এসো, আমার কাছে। আমার ছেলেরা তো কেউ কাছে নেই। আমার কাছে শিখতে পারো তো জ্যোতিষ। জ্যোর্তিবিজ্ঞান হলনা হয়ত কিন্তু জ্যোতিষও তো সেই গ্রহ নক্ষত্রের খেলাই।

মুগ্ধ হয়ে শোনে পিম্প। রণি। অরণি। বাবা বড় সাধ করে নাম রেখেছিলেন। অরণি মানে যজ্ঞের কাঠ।

বুড়িকে বলে তার নামের মানে ও বাবার সাধের কথা।

বুড়ি শুনে উল্লসিত। বলেন : তাহলে তাই হোক : যজ্ঞের পবিত্র আগুনে পুড়ে যাক তোমার পুরাতন পরিচয়। আমি কারো মুখ দেখিনা, ছক দেখি। তোমার মধ্যে অপার্থিব আলো আছে। নব জন্ম হোক তোমার। এখানে। আজই। আমি তোমায় দীক্ষিত করবো জ্যোতিষে। তুমি হবে আমার প্রথম শিষ্য। আমি আজ অবধি কোনো পুরুষকে দীক্ষা দিইনি। আমার সব শিষ্য নারী। তুমি হবে প্রথম পুরুষ। তোমার প্রথম পাঠ হবে কেন শুক্রের মহাদশা ও শনির অন্তর্দশা কারো কারো ক্ষেত্রে আনে ড্রামা কারো কারো ট্রমা। আজ বোঝাবো না, ওটা কাল হবে।

রণি বাকরুদ্ধ। সম্মতি দেবার শক্তিও ওর হারিয়ে গেছে।

ও যে আবার সভ্য সমাজে গৃহীত হবে, হতে পারে এ যেন অবিশ্বাস্য। বুড়ি ওকে বলছে : এখানে কে তোমায় চেনে ? চিনলেই বা কি ? তুমি আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়েছো। দস্যু রত্নাকর যেমন হয়েছিলেন ঋষি বাল্মিকী। বৈদিক মতে এসব তো শুনেছি আমি। ভগবান বুদ্ধ যেমন রাজকুমার থেকে হন অতবড় তপস্বী। তুমিও পাপের বোঝা খন্ডন করে পুণ্যের আলোয় নিজেকে ধুয়ে নেবে। ছক বানাবে, এও এক তপস্যা। ভালো গণৎকার হতে পারা ভগবানের আশীর্বাদ। এরজন্যে পরাব্রহ্মের পরশ চাই। শুধু গণনা শিখলেই হয়না। তোমার মধ্যে আছে, আমি দেখেছি তোমার গভীর চোখে। তোমার হবে। এই অরূপ রতন সবার থাকেনা। একে বিসর্জন দিও না। এতদিন জেনেছো আকাশে থাকে গ্রহ তারা নক্ষত্র পুঞ্জ। আজ থেকে জানবে কী করে তারা মানব জীবনকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি মহাদশার সাথে সাথে মানুষের আচার ব্যবহার বদলাতে থাকে খেয়াল করে দেখবে। আমি বৈদিক মতে ঠিক করিনা আমাদের প্রাচীন একটি পন্থা আছে। বার্মিজ মহবৌ পন্থা। ওটা ব্যবহার করি। তোমাকে আমি শেখাবো। আরো জানি। চৈনিকও জানি কিছুটা। সবই কার্যকরি। তোমার হবে। লেগে পরো। তবে হিন্দুদের মানে বাঙালীদের যোগিনী দশা তোমায় শেখাবো। কলিকালে ওটিই সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক, স্বয়ং শিবশম্ভু বলেছিলেন পার্বতীকে। আমার কোনো মেয়ে নেই। থাকলে তোমাকে জামাই করে নিতাম।

অবাক চোখে চেয়ে দেখছে রণি যে ওর অতীত, কর্মজীবন, আর্বান সোসাইটির কর্দমাক্ত দেহলতা কোনো কিছুতেই বুড়ির কোনো উৎসাহ নেই, নেই সঙ্কোচ এরকম এক মানুষকে নিজগৃহে আশ্রয় দিতে বা শিষ্যত্বে গ্রহণ করতে।

শহরে, অভিজাত ভুবনে ও পরিত্যক্ত, ঘৃণ্য, মেঘে ঢাকা এক তারা কিন্তু এই মেঘের আলয়ে ?

এখানে ও উজ্জ্বল এক পায়রা। যার উৎস সন্ধানে কারো আগ্রহ নেই। সবাই শুধু ওকে উড়তে দেখতেই ভালোবাসে, নীল গগনে।।।

মেঘ মল্লারে বাজে জয়ের বাঁশরী।

ঘরের ভেতরে মেঘ ঢুকে গিয়ে যতই জল ঝরুক ও শ্যাওলা শ্যাওলা হয়ে উঠুক –অন্তর তার মায়ায় মোড়া । সে এক স্বর্গীয় পারিজাত ফুলের সৌরভে ভরে আছে দিন রাতি ।

নিছক কল্পনা । কোনো ধর্ম বিশ্বাস, জাতি, মানুষ বা দেশের সাথে জড়িত নয় ।

ওঝা

দোয়েল রথসচাইল্ড লেখে। বিদেশে থাকে। একটি ওয়েবপত্রিকা চালায়। বেশ চলছিলো। নাম রূপশালি। খুব জনপ্রিয় ছিলো। লোকে ওকে ফলো করতো। একা একা কীভাবে একটি মেয়ে একটি পত্রিকাকে লোকপ্রিয় করে তুললো তাই নিয়ে মানুষ আলোচনা করতো ও ওকে শ্রদ্ধা করতো। হঠাৎ একদিন পত্রিকায় খুব গোলমাল শুরু হল ও সেটি বন্ধ হয়ে গেলো।

দোয়েলের ব্লাড সুগারের অসুখ ধরা পড়েছিলো ওর বিয়ের পরে। মাত্র ২৬ বছর বয়সে। যখন ও বিবাহিত জীবনে খুব সুখে আছে। ইউরোপ ট্যুর করে এসেছে। ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানির সেরা শহরে বসে মৃদুমন্দ বাতাসে দুলেছে, গাঢ় কফি পান করেছে, স্ক্রাম্বেল্ড্ এগে মুখ ডুবিয়ে ডুবে গেছে স্বামী সোহাগে। ওর স্বামীরও একই সাথে সুগার ধরা পড়েছিলো, আজব কেস –বলেছিলেন পারিবারিক চিকিৎসক অজয় কাকু। সন্তান এসেছিলো। অদ্ভুত ভাবে ওর অ্যাবর্শন হয়ে গেছে। খুবই সাবধানে ছিলো। হাইলি ডায়বেটিক বলে। অনেক স্পেশালিস্ট ওকে দেখছিলো। হঠাৎ একদিন! ও তখন ব্যাঙ্গালোরে। স্বামী ফ্র্যাংক অফিসে।

কমোডে বয়ে গেলো ওর সন্তান। যে হতে পারতো লেখক, কম্পিউটার বিজ্ঞানী, পরিবেশ বিজ্ঞানী, ফিজিসিস্ট কিংবা ভলকানোলজিস্ট, অ্যাঞ্জেলিনা জলির জ্যাঠার মতন। দোয়েল নিজে যা হতে চেয়েছিলো! কিংবা শিল্পি বা গায়ক। ও চেয়েছিলো ওর সন্তান খুব বড় সাধক হোক। স্বামী বিবেকানন্দর মতন কিংবা পরমহংস যোগানন্দ।

ওর গর্ভে কি এত জোরে আছে? তাই হয়ত বয়ে গেলো চাপ চাপ রক্ত, কমোডে!

এরকমই ভেবেছিলো। ওর কাছের মানুষ, ওর মাকে বলেছিলো। মা দু:খ পাননি। স্বস্তি পেয়েছিলেন। নানান ছোট ছোট শান্তির কথা শুনিয়েছিলেন। যে বাচ্চা দিয়ে কী হবে ইত্যাদি – ডায়বেটিস আছে যেখানে। অথচ যখন ভাইদের বাচ্চা হল –সি ওয়াজ সো হ্যাপি অ্যান্ড বিফোর দ্যাট সি ওয়াজ সো

মাচ ইন্টু ডিটেলস্ ! ভাইয়ের বৌদের জন্যে মন কেমন করা । নাতি নাতনিদের নিয়ে আদর যত্ন ।

ওকে কোনোদিন বলেও নি একটি বাচ্চা করতে, ভাইদের বলেছে বারবার । বংশ রক্ষা হবে । ওদের বৌদের ভালো লাগবে । ঘরে আলো ফুটে উঠবে ।

আজ ও জানে কেন বলেনি । জানে কেন এতসব আজব ঘটনা ওর জীবনে । সব কো ইনসিডেন্স নয় । বিকজ সি ওয়াজ জেলাস অফ হার । হার ম্যারেজ । হার হাজবেন্ড, সাকসেসফুল হাজবেন্ড । চিফ আর্কিটেক্ট অনলি অ্যাট দা এজ অফ ৩২ । ব্লাডি বিচ, দ্যাট সাইকো বিচ ! দোয়েল তো কোনদিন ক্লাসে ফার্স্ট হয়নি, বোর্ড, ইউনি তে তো নয়ই । সে টেক্কা দেবে ওর মাকে ??

তাই মায়ের জন্যে তার অ্যাবর্শান হয়ে গেছে । ব্ল্যাক ম্যাজিক । বিচটা ট্যালেন্টেড মিডিয়ামও ছিলো । ভাগবান জিসকো দেতা হ্যায়, ছাপ-পার ফার কে দেতা হ্যায়- খুব সহজেই ডার্ক স্পিরিট ওর ডাকে আসতো । তারপর ও সেগুলি লেলিয়ে দিতো ওর অপছন্দের লোকেদের পেছনে । আগে হিসেব করেনি । আজ দোয়েল দেখতে পায় ওদের পরিবারে অনেক অদ্ভুত অঘটন ঘটেছে এবং তার সবকটার পেছনে ঐ সাইকো বিচটার হাত আছে । অস্বাভাবিক কিছু নয় ।

কাকা মেরিন অফিসার ছিলেন । যেই বিয়ে করে সুখের জীবন শুরু হল, কাকির সাথে বিচের ঝামেলা হল, কাকা নিখোজ হলেন জাহাজ থেকে । কাকি নি:স্ব হয়ে গেলো ।

ছোট পিসি টুলুর অঙ্কে খুব প্রতিভা ছিলো । অনেকটা শকুন্তলা দেবীর মতন সে ক্যালকুলেশান করতে পারতো । বিচের সাবজেক্টও অংক । বিচ ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট । বোর্ড, ইউনিতেও । নোবেল লরিয়েটের সাথে কাজ করেছে । কেউ যেন ওকে টেক্কা না দিতে পারে । তাই পিসির যে কি করলো, পিসি অত ব্রিলিয়ান্ট, সেইকালে ফুটবলের সব স্কোর, ক্রিকেট এর স্কোর যার নখদর্পণে, অঙ্কে এত মেধা, জি -কে তে প্রচুর দখল সে সব পরীক্ষায় ফেল করতো নয়ত থার্ড ডিভিশান পেতো ।

বাবা খুব ব্রিলিয়ান্ট স্কলার। বিজ্ঞানী জগদীশ বোসের ছাত্র। তার হঠাৎ কী হল ! সব ছেড়ে সোসাল ওয়ার্ক করতেন। একটিও রিসার্চ পেপার পাবলিশ করতেন না। পুরো গোল্লায় গেলো সব। ছোট মাসীর অত বড় ব্যবসা, কারখানা। ওদের যে সব মেশন ছিলো তা কলকাতায় কোনো কারখানায় ছিলো না। হঠাৎ মেসোর পরম বিশ্বাসভাজন ওকে ঠকিয়ে সব টাকা নিয়ে চম্পট, এমন অবস্থা যে ওরা প্রায় পথে বসে। মাসীর খুব সুখের জীবন ছিলো। মেসো মাকে কয়েকবার কটু কথা বলেছেন, হয়ত তাই। ছোট মাইমার সন্তান হলনা। বাপের বিশাল সম্পত্তি। কলকাতায় সাত সাতটা প্রাসাদোপম বাড়ি। ডুয়ার্সের কাঠের ব্যবসায়ীর মেয়ে। সম্পত্তি পেলেন না। মায়ের সাথে ওর-ও ঝামেলা হয়। ওকে টর্চার করতো। ওদের বাড়িতে থাকতে খেতে দিতো না। রাতের পর রাত সস দিয়ে রুটি খেতো। মামা আমেরিকায়। মামি ভিসার জন্য অপেক্ষারত। আসলে দোয়েল জানে ওদের সুখের বিবাহিত জীবন ছিলো বিচের চক্ষু:শূল।

মায়ের মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী তো বিবাহিত জীবনের প্রায় ৪৫ বছর পরে একদিন ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। যিনি কোনোদিন একলা ঘরের বাইরে যান নি। মায়ের ওর ওপর তো বেশ রাগ ছিলো। কেন অত বড় অঙ্ক পন্ডিতের বৌ এরকম মূর্খ হবে !

দ্যাট সাইকো বিচ !

যার জীবনের ওপর নাম লাস্ট, মানি ও পাওয়ার ---

দোয়েল যেন স্পষ্ট শুনতে পায় :

ফাক মি ডক্টর রিচার্ড ফাক মি ---আই ওয়ান্ট ব্যাকডোর এন্ট্রি নাও !!

আর তিন্নি দিদি ? বিভাস দা ?? ওরা থাকতো আবু ধাবিতে। বিভাস দা ওখানে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ার। একদিন হেড অন কলিশানে মরে গেলেন। কারণ তিন্নি দির সাথেও মায়ের ঝামেলা হয়েছিলো।

--ব্ল্যাক ম্যাজিক ইজ ভেরি পাওয়ার ফুল। ইট ক্যান ডু এনি থিং। বলেছিলো ইরাকি বন্ধু হামিদা। জানো আজকাল দুনিয়ায় কত বড় বড় কোর্ট কেস ও পলিটিক্সে জিততে ব্ল্যাক ম্যাজিকের সাহায্য নেয় মানুষ ! বাণ মারে। সেজন্যেই অনেক পলিটিশিয়ান প্রটেকশান নেন আগে থেকে।

দেখবে অনেকে লাল সুতো, কবজ পরে থাকেন । গলায় কালো মোটা মালা ।

সে তো নিজের জীবনে দেখতেই পাচ্ছে দোয়েল । রাতে শুতে পারেনা । সারা শরীর জ্বলে যায় । সাপ কিল বিল করে দেহে । কে যেন ওর সাথে চাদরে শুয়ে থাকে । ওকে মলেস্ট করার চেষ্টা করে ।

সাইকিকরা বলে : তোমার মা তোমাকে ডার্ক স্পিরিট পাঠিয়েছেন । ডেমন । এরা নানান ধরণের । আজকাল খুব কমন হল ইনকিউবাস যেটা তোমায় ধরেছে । এরা সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করে মেয়েদের । এদের কাউন্টার পার্ট হল সুকুবাস । ওরা ছেলেদের ধরে । আদতে এরা বদমাইশ পুরুষ ও নারীদের সোল । আসে ডার্ক ওয়ার্ল্ড থেকে । মিডিয়ামরা ওদের ডেকে কারো দেহের সাথে জুড়ে দেয় । না তাড়ালে ধীরে ধীরে জীবনী শক্তি খেয়ে নেয়, মেরে ফেলে, অ্যাক্সিডেন্ট, এনার্জি ব্লক করে কাজে কর্মে বাধা দেওয়া, নোংরা স্বপ্ন দেখানো এসব করে ।

উইকিপিডিয়াতে পাবে এদের নাম দিয়ে সার্চ করলে ।

তবে ওর মানে দোয়েলের কিন্তু এই ডার্ক সোলদের জন্য দু:খ হয় । যীশু যেমন বলেছিলেন : এদের ক্ষমা করো, এরা জানেনা এরা কি করছে । ওর মনে হয় এই বেচারা ইনকিউবাস ও সুকুবাসদের কাজে লাগিয়ে মিডিয়ামরা নিজেদের কাজ হাসিল করছে, ওদের যেতে দিচ্ছে না আলোতে । দোষী মিডিয়ামরা, ডার্ক সোলেরা নয়, তারা কেবলই কলের পুতুল ।

হ্যাঁ দোয়েলের তো হয়েছিলো বীভৎস দূর্ঘটনা । পর পর চারখানা গাড়ি রাইট অফ হয়ে যায় । ওদের গাড়ি সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সেই গাড়িতে বিচও ছিলো ঈশ্বরের এমনই লীলা । আর তূর্কি সাইকিক ফাহিম তো ওকে লেড পোরিং করে ফিজিক্যালি প্রমাণ দিয়ে দিলো । ছোট কালোজামের সাইজের লেডের বল গরম করে ওর মাথার ওপরে ধরে গরম জলে ফেলে দিতেই ওটা ফেটে গেলো । নিলে একটি আকৃতি । তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে একটি মহিলা ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ছুরি জাতীয় কিছু নিয়ে ওকে ক্রমাগত আঘাত করার চেষ্টা করছে ।

এই দুরাত্মারা-যারা ডেমন, তাদের মিডিয়াম পুরো কন্ট্রোল করে। অন্যত্র বসে। মিডিয়ামকে ফিজিক্যাল প্লেনে থাকতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। তোমার মা মারা গিয়ে এখন এসব নোংরামো করছেন। বললো ফাহিম।

খুব অসুবিধে হচ্ছিলো দোয়েলের। ওর স্বামী ফ্র্যাঙ্কের সাতমাস যাবৎ চাকরি নেই। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। আরো নানান অসুবিধে। তাই স্থির করলো হামিদার পরামর্শে এক বুড়ির কাছে যাবে যে এইধরণের স্পিরিটের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করেন। নাম মরিয়ম। মুসলিম। এসেছেন সুদূর দেশ দিলহাম থেকে।

বয়স ৮২। থাকেন উত্তর অস্ট্রেলিয়ায়। ও হ্যাঁ বলা হয়নি দোয়েল অস্ট্রেলিয়ায় থাকে।

ভদ্রমহিলা থাকেন ডারউইনে। জুলাই মাসে ঐ শহর অপরূপা। বল্লেন মরিয়ম।

বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে খুব বোমাবাজি হয়েছিলো এখন পড়ে অসম্ভব বাজ। আর আছে আমার স্পিরিটেরা। বলে হেসে ওঠেন। দেখতে খুব সুন্দর। এই বয়সেও।

- বসন্ত এখানে ক্ষণস্থায়ী। তখন ডারউইন ফুলে ফলে সেজে ওঠে। ঐ সময় আসবে।
- আসবো খন। মিষ্টি হাসে প্রাণবন্ত কিন্তু এখন মৃতপ্রায় মেয়েটি।
- হ্যাঁ এসো। এখন এক রূপ তখন অন্য। ভুবন রূপ বদলায়। যেমন তোমার মা। জন্মের সময় একরকম ছিলেন আজ অন্য রূপ। নৃশংস। পন্ডিতেরাই বুঝি সব থেকে বেশি নিষ্ঠুর হন- টেগোর বলেছিলেন না ? আমি টেগোরের বই পড়েছি।

বুড়ি দুর্দান্ত বিরিয়ানি রাঁধে। আগে সেটাই খাওয়া হল। প্রতি শুক্রবার করে প্রার্থনা শুরু করেন ২১ দিনের জন্য। স্পিরিটকে ডেকে কড়া ভাবে জানান যে এরকমভাবে ওর ক্লায়েন্টকে বিরক্ত করা চলবে না। তার সাথে বোঝাপড়া করেন। অনেক সময় স্পিরিট আঘাত করে। আহত হন। আবার সোজা হয়ে দাঁড়ান। এই ৮২ তেও প্রচুর জীবনী শক্তি। সাহস। এই

স্পিরিট তাড়ানোর জন্য মোটা টাকা নেন যার সিংহভাগ দান করে দেন ওদের দেশের পথশিশুদের জন্য কয়েকটি সংস্থায়।

থাকেন নিজের যমজ বোনের পরিবারের সাথে। তার বেশ কটি মেয়ে। সবাই কী সুন্দরী। যেমন রং, সেরকম মুখের গড়ন, ফিগার। বিশ্ব সুন্দরী ওদের কাছে কিছুই না।

নিজের স্বামীর তিন বিয়ে ছিলো। ওদের দেশে পুরুষেরা যা ইচ্ছে করতে পারেন। মহিলারা নন। তারা বোরখা বন্দিনী। শুধু আঁখিপল্লব মুক্ত। আর সব ঢাকা। এই বন্দী দশায় থাকতে থাকতে মরিয়ম হাঁফিয়ে ওঠেন। উনিই ছিলেন প্রথমা স্ত্রী। রূপসী হওয়া সত্ত্বেও ওর স্বামী পর পর আরো দুজনকে বিবাহ করেন ওর অনুমতি ব্যতীত। ওর কাউকে নিজের রূপ দেখাবার উপায় নেই, নাহ্ কোনো মহিলাকেও নয় অথচ ঐ লোকটি ! মরিয়ম অত্যন্ত বিরক্ত !

নিজের চার ছেলে হল। তবুও -তবুও আরো গন্ডা খানেক ছেলেপুলে ওদের সাথে। দুটো রূপসী মেয়ে হল, আবারও ওদের সাথে, শুধু শুতে আসতো শেষদিকে।

কয়েক ঘন্টা পায়জামার দড়ি খুলে মৈথুন শেষ করেই যেভাবে লোকে ট্রেন ধরতে ছোটে সেভাবে !

মরিয়ম এরকম জীবন মানবে না ! বেছে নিলো অগ্নি গর্ভ পথ। ভূত প্রেত আত্মার পথ।

ওদের কালচারে বলে মৃত মানুষকে জাগানো পাপ। ওদের ডেকো না। যারা ওদের ডাকে তারা ডাকিনী। খারাপ লোক। মন্দ মানুষ। মরিয়ম বিদ্রোহি হবে। তাই ওর পতিদেবের তোয়াক্কা না করে এই পথে পা বাড়ালো। শিখলো ওদের ধর্মের মত অনুসারে তন্ত্র মন্ত্রের পথ। স্পিরিট রিচুয়াল। পুজো করে ভূত ভাগানো আর কি। অনেকে এগুলো বিশ্বাস করেনা তাতে সত্য বদলায় না। কারো বিলিফের ওপরে সত্য দাঁড়িয়ে নেই। মরিয়ম মানুষের উপকার করে। তবে আগে সাইকোলজিস্টদের দেখিয়ে আসতে হয় যে মেন্টাল কেস নয়। তবেই উনি কাজ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই সফল হতে সময়ও লাগে।

স্বামী ওকে এই নিয়ে অনেক যাতনা দিয়েছেন। উনি শোনেন নি। কেয়ার করেন নি। উনি খুব স্ট্রং পার্সোনালিটি। ওঁকে দেখলেই ভালোলাগে। একটি নির্ভরতার কথা মনে হয়। ছাদ, ভরসা। এগুলো ভেসে ওঠে মনের ক্যানভাসে।

ওর বিরাট ইটের ঘরটার চারপাশে অতিকার কাঠের ব্যালকনি। সেখানে চাল শুকাচ্ছে। সেই চাল পুজোয় ব্যবহার করা হয়। রোজ সকালে তিনটি করে চাল ওষুধের মতন করে খেতে হয় ২১ দিন। মানুষ প্রেত মুক্ত হয়। বাড়িটা খুব বড়, পুরাতন বাড়ি। চারদিকে গাছপালা। বাগান। ভুতের আস্তানা হবার কমতি নেই।

ওঝা, আমাদের দেশে তাই বলে। মরিয়ম ওঝা শুনে হাসলেন।

বললেন : আমাকে বলো বিদ্রোহি মরিয়ম। আমি পুরুষের ডোরম্যাট নই।

ওরা যা ইচ্ছে করবে আমি ঘরের কোণায় পচে মরবো, না না ভায়া সেটি হচ্ছে না।

আমি স্পিরিট নিয়ে খেলবো, বেশি বাড়াবাড়ি করলে দু চারটে লেলিয়ে দেবো!

হা হা হা করে দিলখোলা হাসি হেসে ওঠে বুড়ি। বুড়ি বিরিয়ানি রাঁধে দূর্দান্ত।

ওর বোন ভূতেদের ভয় পায় বলে মাঝে খুব গোলমাল করতো। এখন সয়ে গেছে তারও।

যমজ বোন, ছেড়ে থাকতে পারে না। গালি দিলেও পরে আবার জড়িয়ে ধরে ভাব করে নেয়। তারও স্বামী গেছে।

মরিয়মের স্বামী গত হয়েছেন অন্য স্ত্রীর গৃহে বহুদিন আগেই। সেটা ইরাকে, ঐ বৌ সেখানেই ছিলেন। আরেক স্ত্রী থাকেন সৌদি আরবে। সে নাকি কোন শেখের মেয়ে। খাসা দেখতে। বয়সেও স্বামীর প্রথমা কন্যার সমান। অর্থাৎ মরিয়মের মেয়ের সমান প্রায় আর কি, একদম এক নয় – কাছাকাছি। বয়সের হিসেব আর কে নেয়!

মুখ ফুটে বলেই ফেললো দোয়েল : তিনটেতেই থেমে গেলেন ? আরো কয়েকটি করলেন না কেন ?

বুড়ি হেসে বলেন, রেজিস্টার্ড তিনটে। নাম গোত্রহীন আরো কত আছে কে জানে।

ওয়ান্স সাম ওয়ান কিক্‌ড হিম অন হিজ গ্রয়্‌ন অ্যাট মিড নাইট। অ্যান্ড হিজ আদার ওয়াইভ্‌স আর অল ইন আদার কান্ট্রীজ ইউ নো। আই ইউজ্‌ড টু লাভ হিম বিফোর বাট নট আফটার অল দোজ ম্যারেজেস। দেয়ার আর সো মেনি পিওপেল টু লাভ হিম। আই হ্যাভ মাই ওন স্পিরিটস্। একটু ভিন্ন ইংলিশ বলেন।

বুড়ির চোখের কোণা কি ভিজে গেলো ?? দেখা গেলো না কারণ ডারউইনের আকাশ ততক্ষণে গাঢ় নীল। টিমোর সাগরের সমুদ্রনীলে। আকাশে লেগেছে সাগরের নীল।

দোয়েলের মায়ের পাঠানো ইনকিউবাস বা ডার্ক স্পিরিট বিতরণ হল কিনা সদ্য সদ্য জানা যাবে না।

–ইট্‌স নো ম্যাজিক। ইট উইল টেক টাইম। ইভেনচুয়ালি ইট উইল ডেফিনেটলি গো। বলেছিলেন মরিয়ম। অ্যান্ড সি উই মুসলিমস্ উই হেল্প পিওপেল। অল অফ আস আর নট টেররিস্টস্।

––ডিড ইউ ? দুষ্টু হেসে চোখ বড় বড় করে দোয়েল বলে ওঠে।

হামিদাকে জিজ্ঞেস করলো : তোমাদের দেশের এরকম ক্লস্ট্রোফোবিক আবহাওয়া, তোমরা মেয়েরা নিঃশ্বাস নাও কীভাবে ?

ও বলে ওঠে : সবই অভ্যাস। যুগ যুগ ধরে আমরা এরকমই দেখে অভ্যস্থ। মরিয়ম আম্মি এক দুজনই হন। বেশির ভাগই অভ্যাসের দাস। কেউ বিদ্রোহ করেনা। পুরুষেরাও আছে সুখে। রূপসী মেয়ে, কড়ি দিয়ে কিনলাম, পারস্যের গোলাপ, বসরার গোলাপ কী বলবে ? আমাদের দেশের প্রতিটা মেয়েই রূপবতী সেটা মানো তো? এত সুন্দর মেয়ে যেই দেশে সেখানে একটাই বৌ ? কারই বা ভালোলাগে? তুমি পুরুষ হলে

ভালোলাগতো ? জাস্ট চেঞ্জ দা ওয়ে অফ ইওর থিংকিং । অ্যান্ড এনজয় লাইফ !!

তুতুরী

--তুতুরীর মানে হল সাপুড়িয়া অর্থাৎ বেদে কিংবা বাজিগরদের বাঁশি।

পরিষ্কার বাংলায় বললেন জিল ডি কোস্টা। গোয়ানিজ। থাকেন অস্ট্রেলিয়ার রেড হিলস্ এলাকায়। লাল পাহাড়ের দেশ। লাল লাল পাহাড়, সবুজ বনভূম, মিঠেল সুবাস। চাপা নাক ছোট চোখের ইন্দোনেশিয়া কিংবা চীনা মানুষ। জিলের একটি গ্যারেজ আছে ওখানে। গাড়ি ধোবার। নাম ম্যাজিক ব্রাশ। কয়েক ঘন্টায় গাড়ি ধুয়ে দেন। বয়স বেশ ভালই। চুল পেকে গেছে। রং একটু চাপা। সুন্দর গড়ন। কথা বলেন খুব ভালো।

আমার গাড়ি ধুয়ে দিলেন। আমি সুহানা মিত্র। পেশায় ইন্সুরেন্স এজেন্ট। আমার একটি ছোট সংস্থা আছে। সেখানে বাড়ি, জীবন, ভ্রমণ ইত্যাদির বীমা করানো হয়।

রেড হিলসে কাজেই গিয়েছিলাম। গাড়িটা বহুদিন যাবৎই ময়লা ছিলো। প্রতি রবিবার করে গাড়ি ধুই। কয়েকদিন কাজের চাপে ধোয়া হয়নি। এই গ্যারেজটি দেখে ঢুকে পড়েছিলাম। পরে দেখলাম কয়েকটি চেলা নিয়ে বুড়ি মোহময়ী। ফটাফট ধুয়ে দিলো।

কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। মুঙ্গেরিলাল কি হাসিন স্বপ্নের মতন আমি মানুষে মজি। তাই নিয়মিত যাতায়াত করতে শুরু করি।

- এই নাও চিকেন পিৎজা খাও। ক্যাঙ্গারুর সসেজ খাবে?

তাও খেলাম। তারপরে চা আনলো একটি ছোকরা গোছের কেউ। নাম টম।

সেই চায়ে আছে জুঁই ফুলের সুবাস। আহা মন মাতলো। বাইরে অপূর্ব একটি পাহাড়িয়া গন্ধ। কেঠো গন্ধও আছে। হিমেল হাওয়া। হুস হুস করে গাড়ি যাচ্ছে।

বুড়ি গল্প ফেঁদে বসলেন। ওর বাড়িতে কেউ নেই। একটি কুকুর ব্যাতীত।

ওর নাকি প্রচুর গনেশের কালেকশান আছে। আমাকে দেখাবেন।

আমি মনে মনে ভাবলাম : মন্দ কি ? যদি একটি কি দুটি পলিসি করানো যায় !

বাজার এখন মন্দা, চাকরির। তাই পলিসি কেউ করছে না চট করে। ৪ বছর চাকরি নেই এক ইঞ্জিনীয়ারের এরকম মানুষও এখানে আছেন, আছেন জেনেরাল ম্যানেজার যিনি বেকার ৬ মাস ধরে, সরকারের অনুগ্রহে চলছে। টাকা পান নিয়মিত। তাই আমারও হাতে কাজ কম। একদিন দুপুরে পেট পুরে মাংস ভাত খেয়ে গেলাম ওর বাসায়। সেই রেড হিলসে। একাই থাকেন। আমার অবশ্যই পার্টনার আছে। সে আমার চেয়ে পাক্কা ২২ বছরের বড়। আমি ২৮ আর সে ৫০। খুব এনজয় করি আমরা। ও খুব রোমান্টিক। যখন চুমু খায় দারুণ লাগে। আসলে আমার কৈশোর থেকেই একটু ম্যাচিওর্ড লোক পছন্দ। বাবা আর বরের মাঝামাঝি। বাবার মতন গার্ড করবে আর বরের মতন ভালোবাসবে। ওর নাম ভেঙ্কি। আজ ও নেই। গেছে ওর দেশওয়ালা কিছু মানুষের সাথে দেখা করতে অন্যত্র। আমি মুক্ত বিহঙ্গ। তাই রেড হিলসে। বান্ধবী জিলের বাড়ি। ওর বাড়িটির নাম উডকাটার্স কটেজ।

কেন এরকম নাম ? শুধাই। বলেন – আমার ভালোলাগে।

তবে ভেতরে প্রবেশ করে মনে হল নামটি যদি দেওয়া হত : গনেশাস কটেজ তাহলেই বেশি খুলতো। কারণ ভদ্রমহিলার কালেকশানে যা গনেশ আছে তা দেখবার মতন।

প্রায় হাজার ৫ বা তার ওপরে গনেশ। বাড়ির একটি অংশ মিউজিয়ামের মতন। সেখানে থরে থরে গনেশ। নানান আকৃতির নানান রঙের। সেখানেই এই তুতুরীটি ছিলো। জিল বাংলা জানেন কারণ ছোট বেলায় ওখানেই ছিলেন। খড়গপুরে। বাবা স্টেশান মাস্টার ছিলেন ওরই কাছে কোথাও। মা হিন্দু। বাবা অ্যাংলো, গোয়ানিজ।

কৈশোরে মাকে হারানো। বাবাই বড় করেন। পরে এক মাদ্রাজি খ্রীস্টানকে বিয়ে করেন ও এইদেশে পাড়ি। তখন যে কেউ এখানে আসতে পারতো।

ভিসার এত কড়াকড়ি ছিলো না। গনেশের মূর্তি ও ছবি কালেকশান তখন থেকেই শুরু।

- খুব শৈল্পিক লাগতো তাই শুরু করি। এলিফ্যান্ট গড। মাউস। আলতো করে মুখের ওপর এসে পড়া চুল গুলি সরিয়ে নেন।
- আমি বলি যে ওটা র‍্যাট, মাউস নয়।
- বলেন : ঐ হল। একই। মনে মনে ভাবি কেন যে গরু ও বাঘ এক নয় !

সত্যি এক একটি দেখার মতন। এত অপরূপ তার রং ও গড়ন যে মনে হয় চেয়ে চেয়ে দেখি। সাজিয়ে রেখেছেন সুন্দর করে। জানা গেলো পেতলের ও সোনারও আছে। সেগুলিকে উনি নিয়মিত স্নান করান। পাথরেরগুলিও জলে ধোন।

কিছু কিছুকে পোশাক পরানো। গহনা আছে মানান সই। জানেনও অনেক। বলেন : গনেশ মন্দিরে ওকে একবারই প্রদক্ষিণ করতে হয়। অন্যসব মন্দিরে তিনবার করে ও মা দুর্গাকে চারবার।

Lord Ganesha has only 1 tusk, the other tusk is broken off because Ganesha represents the One God and One Spirit concept instead of duality which is always a source of confusion…E.K.Dhilip Kumar

এই ই কে দিলীপ কুমার হলেন এক গণৎকার। যাঁর সাথে জিল দেখা করেছেন। উনি গনেশ সম্পর্কে জেনেছেন ওঁর কাছেও বহু কিছু। মাদ্রাজে আছেন এই ভদ্রলোক। দেখতে দারুণ লাগে। কয়েকটি আবার পেল্লাই সাইজের। মাটিতে বসানো। আমি ছুঁতে গেলে ভদ্রমহিলা আমাকে প্রায় মেরে ফেলেন আর কি !

ছুঁতে দেবেন না। শুধু দেখো ও এনজয়।

বুঝলাম গনেশ ওঁর অবসেশান।

- গানেশা, ফানেশা, গানি, ফানি ভেরি ভেরি ফানি – দে আর সো কিউট ! কিউটি সুইটি।

এই লাইনগুলি প্রায়ই আওড়াতেন।

গনেশ নিয়ে স্নান, নকল খাওয়ানো। দেখো কিন্তু ছুঁয়ো না।

ওদের জন্য বাজার হত। ওরা কেউ কেউ গাড়ি করে ঘুরতে যেতো উইক এন্ডে।

কিন্তু তুমি ছুঁলে খাবে বেতের বাড়ি।

- গানেশা, ফানেশা, গানি, ফানি ভেরি ভেরি ফানি – দে আর সো কিউট! কিউটি সুইটি।

বুড়ির ধরা বাঁধা গান। বুলি। ছড়া।

কোন কাগজে পড়ে ওদের মাঝে দুধ খাওয়াতেন। খাঁটি অস্ট্রেলিয়ান জার্সি গরুর দুধ।

ভারত থেকে ঘুরে ঘুরে নিয়ে এসেছিলেন নানাবিধ গনেশের স্ট্যাচু ও মূর্তি।

নেপাল, মহারাষ্ট্র গেছেন। শুদ্ধু এই কারণে। জৈন ও বৌদ্ধ্য ধর্মের মানুষও গনেশ আরাধনা করেন তাই উনি জাপান, চীন, ভিয়েতনাম, বর্মা, কাম্বোডিয়া থেকে নানান গনেশ নিয়ে এসেছেন। আফগানিস্তানের এক গুহা থেকে নিয়ে এসেছেন শ্বেতপাথরের গনেশ, গায়ে বাঘের ছাল পরানো ও মাথার দিকটায় কিছুটা টেরাকোটার কাজ। আজব দেখতে। ফ্রান্স থেকেও এনেছেন। সারা দুনিয়া ঘুরেছেন এই গনেশের ভালোবাসার জন্য। যেখানে এই সম্পর্কে পড়েছেন, ছুটে গেছেন। ঐ গনেশ ওঁর চাই। প্রত্নবিদের সাহায্য নিয়েছে অনেক সময় কিন্তু কাউকে ছুঁতে দেননা।

সকাল। সুপ্রভাত। আমার পার্টনার সেদিন একটু বেশি রোমান্টিক। মদ্যপান জমেছে ভালই। বাইরে বরিষণ। শ্রাবণ এখানে আসেনা। আসে একলা বৃষ্টি।

কদম গাছ নেই। অচেনা ফুলের মৌতাত।

বড় বড় কাচের জানালা। এখন মধ্য সকাল। ও কেন যে এখন মদ খেলো!

তারপর ব্রেফ ফাস্ট টেবিল থেকে আমাকে তুলে নিয়ে প্রায় জোর করে ড্রয়িং রুমের সোফায় শুইয়ে আদর। আমাকে বিবসনা করে ঘাড়ে ও গলায় মুখ ঘষতে ঘষতে চুমু খেতে খেতে তলিয়ে গেলো আমার জঙ্ঘায়!

নারীর নরম নিভৃত নাভীমূলে পৌরুষের অহংকার ডুবে গেলো।

বাইরে অঝোর ধারা।

তারপরে মৈথুন শেষে এক অপরূপ আলোতে ঘর মাতাল। আলো আসছে একটি বারান্দা দিয়ে। উত্তরের বারান্দা।

ও বললে : চল কোথাও ঘুরে আসি আজ। ভীষণ মন কেমন করছে।

আমি চটজলদি জবাব দিলাম : রেড হিলস।

গাড়ি বার করল। পুরনো বুইক। আকাশি রং।

আমি আকাশি পোশাক পরলাম। মোবাইল থেকে জিলকে একটি কল করলাম : তোমাকে পাওয়া যাবে এখন? ভেঙ্কিকে গনেশ দেখাবো।

অনেকবার নিয়ে যেতে বলেছেন। যাওয়া হয়নি।

- হ্যাঁ হ্যাঁ চলে এসো। এখানেই লাঞ্চ করে যেও।

কাছেই আছে ২ মিলিয়ন বছরের পুরাতন একটি পাথরের খন্ড। খুব ভীড় হয়। সেদিন ছিলো ব্রুস স্প্রিংটিনের কনসার্ট। লোকে লোকারন্য। ১০০০০ লোক এসেছে। রেড হিলস মাতোয়ারা। অনেক মানুষ টপকে গেলাম জিলের কাছে।

গনেশ গনেশ আর গনেশ এর পাহাড় এবার। মানুষ পেরিয়ে গনেশে।

- গানেশা, ফানেশা, গানি, ফানি ভেরি ভেরি ফানি – দে আর সো কিউট! কিউটি সুইটি।

গেয়ে উঠলেন। ভেঙ্কি হাসলো। ছুঁতে গেলে বকা খেলো বুড়ির।

ওর বাড়ি যাবার পথটি মোহময়। ঘন পাহাড়ি কুয়াশায় ঢাকা পথ। পাইনের বন। বিপজ্জনক বাঁক। সফেদ কুয়াশা, সবুজ বন। দারুণ রঙের মিলন। কালো পথ।

- জায়গাটিও বুড়ির মতনই রহস্যময়। বললো ভেঙ্কি।
- হ্যাঁ, আমার সংক্ষিপ্ত জবাব। বুড়ি শুধু রহস্যময়ী নন অবসেশড্ও। মৃদু হাসি।

হাসলে আমার গালে টোল পড়ে। ভেঙ্কি আমাকে ড্রাইভ করতে করতেই চুমু খেলো।

বকলাম – কি করছো ? গাড়ি স্কিড করতে পারে ! খাদ, এত জল রাস্তায় !

ও হেসে বলে আমাকে প্রটেকশান দেবে আমার প্রেম !

সেদিন খাওয়া হল দুর্দান্ত। জিলের হাতের রান্না দারুণ। কেন জানিনা ওর বাড়ি বড় একটা লোক হতনা। কিছু রিপোর্টার আসতো। আর কাজের মানুষ। আত্মীয় দেখিনি বা বন্ধু সেরকম। হয়ত বুড়ি বলে। তবে সেরকম বুড়ো নন। এই ৫০ হবে হয়ত।

খাওয়ালেন : টার্কির রোস্ট, ঘরে তৈরি কেক ও বেকড্ আলু। বেশ ভালো। আর দামী ওয়াইন। রেড ওয়াইন।

ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। গাড়িতে আবার রোমান্স, আদর। পাহাড়ি পথ বিপজ্জনক জেনেও। ঘরে ফিরে নিপুন মৈথুন। ভালোবাসার পারদ বাড়ছে ক্রমশ।

পরেরদিনই খবরটা পেলাম। আসলে উনি একটি পলিসির জন্য আমাকে ডেকেছিলেন। ফোন করতেই ভয়েস মেসেজে চলে গেলো। পরে জানতে পারলাম যে হঠাৎ হৃদ যন্ত্রের বিকলতার কারণে মারা গেছেন। ওঁর নাকি হাই সুগার ছিলো।

ভেঙ্কি ও আমি পাথর। আগের দিনই তো খেয়ে, ফূর্তি করে এলাম।

কি এমন হল ! কার যে কখন কি হয় !

ফিউনেরাল কিছুদিন পরেই। আমি হতাশ। পলিসি হয়নি বলে নয়। একজন ভালো সহচরীকে হারানোর বেদনায়। বুড়ি একটু অবসেশড–হলেও পরামর্শ ভালই দিতো, যত্ন করতো। দিলটা সাচ্চা ছিলো।

গেলাম রেড হিলসে। হয়ত শেষবারের মতনই। ওদিকে বিশেষ কাজ পড়েনা আমার আর। বুড়ির আজ শেষ কাজ। ফিউনেরাল ডাইরেক্টর বুঝিয়ে দিচ্ছেন কি করতে হবে আমাদের কোথায় গিয়ে বসতে হবে। ফুল এনেছি কিনা। কখন প্রেগ্রাম শুরু হবে, শব আনা হবে ইত্যাদি। একটি জায়গায় বসলাম।

লোক আসছেন। অনেক লোক এলেন। এত লোক ওঁকে চিনতো ? আগে কোনদিন দেখিনি। হয়ত গ্যারেজের কাস্টমার সব।

লোকগুলি সার দিয়ে বসলো। একজন উঠে স্পিচ পড়লেন। জানা গেলো ওর সহোদর। নাম জোসেফ। ভারত থেকে এসেছিলেন উনিও। একমাত্র ভাই। এখানে ট্রেন চালকের কাজ করতেন কোথাও। বেশ ভদ্র সভ্য। স্পিচে যা পড়ে শোনালেন তাতে আমি হতভম্ব।

জিল ছিলেন দেহপসারিনি। সি ওয়াজ আ ব্লাডি হোর !

ওর স্বামী ওকে ছেড়ে দেয় এখানে এসে। নানান চক্রে ফেঁসে উনি ঐ লাইনে চলে যান। ওর ভাই বলছেন : আমার দিদিকে ঘৃণা করোনা আর তোমরা। কারণ ও স্লাট হিসেবে সমাজে পরিচিত হলেও ওর সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিয়ে গেছে একটি মহৎ কাজের জন্য। ওর ১০ মিলিয়ন ডলারের প্রপার্টি। সর্বমোট ছিলো। ও চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণার জন্যে এই অর্থ দিয়ে গেছে। ওর সমস্ত গনেশও ও বিক্রি করে দিতে অনুমতি দিয়ে গেছে। সেই টাকাও যাবে ঐ রিসার্চ ফান্ডে।

এটা কোনো বিশেষ ব্যাপার তো নয় যে রিসার্চে কেউ দান করছেন কিন্তু আমার দিদির ক্ষেত্রে এটা বিশেষ কারণ ও যেই ফিল্ডে অর্থ দিয়েছে তা খুবই দরকারি একটি ফিল্ড ও কেউ ওদিকে টাকা ঢালে না। ইদানিং দেখা যাচ্ছে নানান ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। নতুন অ্যান্টি বায়োটিক না বেরোলে কাজ হবেনা। সিম্পেল সার্জারি করতে গিয়ে মানুষ মারা যাবেন। কোনো ওষুধ কোম্পানি এই খাতে টাকা ঢালতে রাজি নয়। মাইক্রো বায়োলজিস্টরা উদ্বিগ্ন।

অথচ এটি এত দরকারি একটি ফিল্ড।

আমার দিদির এই সামান্য দান যদি কিছুমাত্র পরিবর্তন আনতে পারে-------

বাকি কথাগুলো কানে ঢুকলো না।

জিল কে ? পাপী না মহিয়সী ? নিজের মধ্যে শুরু হয়েছে এক দ্বন্দ।

রেড হিল্‌স থেকে আমি বাড়ি অভিমুখে, হৃদয় মাঝারে অবিরাম বেজে চলেছে যুদ্ধের দামামা। যেই জিলকে আমি চিনতাম --------সে তাহলে কে !!!!!

আমাকে উপহার দেওয়া ওর তুতুরীটি হাতে নিয়ে এই কথাটিই বারবার মনে আসছিলো।। বাজিগরের বাঁশি। বাজিগর এক রহস্যময় প্রজাতি। আর জিল !!

শ্রম,অনুশাসন, সম্পদ, সংকল্প, শস্যদানা, শৈবালগুচ্ছ, দায়বদ্ধতা, তুচ্ছ তরে মোম জ্বালানো এইকথাগুলি একই সাথে মনের আনাচে কানাচে ঘুরছিলো।

দহন

ফাইলটা হাত থেকে একরকম ছুঁড়েই ফেলে দিলো সাঁঝ বসু । ক্রিমিন্যাল লয়্যার ।

কলকাতার নামী উকিল । ডাকসাইটে উকিল । কোনো কেস হারেনি আজ অবধি । গুন্ডা বদমাইশকে জেল থেকে বার করা ওর কাজ । জানে তারা দুরাত্মা তবুও টাকা নেয় যে তাই তো ছাড়িয়ে নিয়ে যায় কোর্ট থেকে । পুলিশরাও ওর ওপরে খাপ্পা – আমরা এত কষ্ট করে এগুলোকে ধরি আর আপনারা !

হা হা হা,হাসে গায়ে জ্বালা ধরানো হাসি সাঁঝ – দিস ইজ আওয়ার প্রফেশান অফিসার মন্ডল ।

বহু ক্রিমিন্যালকে কোর্ট থেকে বার করেছে সাঁঝ । মেয়ে বলে খুব জনপ্রিয় । মেয়েরা সচরাচর এরকম প্রফেশানে আসেনা তো । ঐ ইস্কুল মাস্টারি নয়ত কলেজ খুব জোর হলে ইঞ্জিনীয়ারিং ড্রয়িং বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার ও চিকিৎসক এইসব । উকিল তাও অপরাধী খালাসের । বিশাল ব্যাপার ।

--এক একটার চোখ কি রে ভাই ! লাল কটকটে ! তাকায় কীভাবে শালা যেন গিলে খাবে । লকলকে জিভ ! পুরো বডি চেটে খাচ্ছে মহিলা উকিলের – বলে ওঠে পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহা ।

--আরে ভায়া এই লাইনে আসার দরকার কি ! যা না ঐসব ইস্কুল টুলে পড়া গে ! মুখে পান পুড়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ওঠে আরেক পুলিশ নন্দী ।

--নারীবাদ, বুইলি । মাইরি কেউ শালা কম নয় । ঢ্যামনা মাগি বুকে দুটো দুদু এঁটে শালি আমাদের সমান হবে । দুদুগুলো ধরে এয়্সা এই এয়সা করে টিপে দোবো !

মুখে একটি কুৎসিত হাসি এনে বলে ওঠে সাহা ।

হাসিতে তাল মেলালেও মনে মনে সায় দেয়না নন্দী। ভাবে শালা সাহা – ছোটলোকের ঘর থেকে এসেছে, এগুলো এরকমই। নারী জাতিকে সম্মান দেয়না। মেয়েরা মায়ের জাত। এসব কথা মুখে আনতে নেই। নিজের মা মেয়ের মুখটা মনে পড়ে ওর।

সাঁঝের নামটা নিয়েও ব্যঙ্গ করে কেউ কেউ। বলে নামেই মেলে কাজের সন্ধান। সন্ধ্যার অন্ধকারের মতন কয়েদী খালাস করেন আপনি। তারপর নেমে আসে আঁধার ধরিত্রীর বুকে।

ও এড়িয়ে যায়। এটা ওর প্রফেশান। ও নিজেই বেছেছে। ছোট থেকে অন্য কিছু করার বাসনা ছিলো। অন্য মেয়েরা যা করে সেরকম কিছু নয়।

বাবা ছিলেন জজ। বাধা দেননি। সুপ্রিম কোর্ট নাহলেও কলকাতা হাই কোর্ট। তাই বা কম কি ? মোটা মোটা আইনের বইতে ডুবে থাকতেন বাবা। ও পড়তো সেই বই। বুঝতো তেমন না। সেকশান মুখস্থ করতো বসে বসে। বাবা চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলতেন : দূর পাগলি!

বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। সেইসময় আত্মীয়রা এলে ওকে খুঁজে পেতোনা। অনেকে খুঁজে দেখতো ও স্টাডিতে আইনের বইতে ডুবে আছে।

সেই নেশা, পেশায় পরিণত হল। আজ সে সফল ক্রিমিন্যাল লয়ার। সাঁঝ।

বিয়ে করেনি। সময় নেই। প্রেম হয়েছিলো এক সাহেবের সাথে। অস্ট্রেলিয়ান অ্যাম্বাসেডার। ভারতের। ব্যারি কনরয়। টল, ট্যান্ড, হ্যান্ডসাম। থুঁতনিতে দুই ভাগ। খুব ম্যাচো। খুব আকর্ষক। আলাপ দিল্লীতে, ঘরোয়া পার্টিতে। এক সুপ্রিম কোর্টের ডাকসাইটে উকিলের বাড়ি। মজুমদার কাকু। ওঁর দাদা পার্লিয়ামেন্টে বসেন। সোনিয়া গান্ধীর চেলা।

বিয়ের কথাও হয়। কিন্তু কপাল মন্দ। বেচারা হঠাৎ প্লেন ক্র্যাশে মারা গেলো।

অনেকে বললো গুপ্তঘাতকের কাজ। চীনের কাজ। চীনেই মারা গেছেন। তবে এসবই রটনা। আসল সত্য কেউ জানেনা।

ভেঙে পড়ে সাঁঝ। আর বিয়ে করেনি। করা যায়না। হৃদয় তার মতে একজনকেই দেওয়া চলে। ওটা বার বার হাত বদল করার জিনিস না।

এখন একাই থাকে । সফল তো তাই কাজের কমতি নেই । কিন্তু আজ থেকে সে বেকার হয়ে গেলো । ক্রিমিন্যাল কেস আর লড়বে না ।

তার কারণ সহোদরার মতন যাকে ভালোবসেছিলো সেই সোনালি মেয়ে মিয়া । ওর খুড়তুতো ভাইয়ের বৌ । আন্তর্জালের মাধ্যমে আলাপ করে বিয়ে করেছিলো ওর খুড়তুতো ভাই রণিকে । অরণি । পেশায় নিউরোলজিস্ট । ডাক্তার হলেও সে কাজ ভালো পারতো না । বুকিশ ছিলো ওর নলেজ । তাই বেশি রুগি হতনা । বেশির ভাগ সময় সরকারি হাসপাতালে বসতো, মাস মাইনে পেতো আর চ্যাট করে সময় কাটাতো । কাকা সি পি এমের হর্তাকর্তা হওয়াতে এম ডি তে চান্স পাওয়াতে অসুবিধে হয়নি সাধারণ ছাত্র রণির । ওর কাকিমার জন্ম খুবই অদ্ভুত । লাক্ষ্ণৌ শহরের মেয়ে । মা মরা মেয়ে । ক্লাস এইটে পড়তে মা মারা যান । এরকমই ওরা শুনেছে ।

কাকা ওদিকে বেড়াতে গিয়ে একেবারে বিয়ে করে আনেন । কাকিমা খুবই রূপসী । একেবারে রূপকথা থেকে ডাইরেক্ট নেমে এসেছেন । বিদুষীও ছিলেন । কলেজে পড়াতেন । কাকিমার বাবাও কলেজে পড়াতেন লাক্ষ্ণৌতে । কিন্তু পরে ওরা জানতে পারে যে ওর মা আসলে ফৈজাবাদের বিখ্যাত বাঈজি হীরাবাঈ । সেখানেই ওর জন্ম । ওর বাবা বাঈজী বাড়ি থেকে ওকে নিয়ে আসেন ও মানুষ করেন অন্য শহরে গিয়ে । তাই মা মৃতা সবাই জানতো । মা বলে সবাই যাকে জানতো সে আসলে ওর দাইমা । কেয়ার গিভার ।

কাকিমা অবশ্যই খুবই ধীর স্থির ও ডিগনিফায়েড ছিলেন । বাঈজির কন্যা হলেও ।

ওরাও সম্মান করতো । কলেজে মাস্টারি করতেন । জিনের খেলা কিনা কে জানে নাকি ভবিতব্য ---------

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সেই দিনটা : মিয়াকে যেদিন প্রথম দেখে ।

একমাথা সোনালি চুল, লম্বা মুখ, সরু চোখ– তোমাকে একেবারে রাজকুমারী ডায়ানার মতন দেখতে গো ।।। হাসে মিয়া । মিয়া স্প্যারো নাম ।

বাবা ক্যাথলিক প্রিস্ট। মা দর্জি। খুব হাসিখুশি মেয়ে মিয়া। ভারতে এসে হাত দিয়ে ভাত খেতো। মাছের ঝোল। ঝাল ঝাল মাংস। পুজোর প্রসাদ। কালীঘাট। দক্ষিণেশ্বর।

দার্জিলিং। সিকিম। অন্যভুবন। মিয়া ভারতীয়। মিয়া মিশে যেতে চায়। ভারি ভালো মেয়েটি। বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। ব্যাথায় ভরে ওঠে সারা মন।

কেমন টনটন করে আপাত দৃষ্টিতে নির্দয় এই উকিলের দেহ।

জ্বালা বিষের জ্বালা সারা দেহে। নীল বিষ। কত অপরাধীকে সে বার করেছে কোর্ট থেকে। আজ সাঁঝকে তাদের অপরাধের কোপে পড়া আত্মারা সাজা দিচ্ছে নাকি ?

মিয়া মিয়া ? হোয়্যার আর ইউ ? বেবি ? হাউ আর ইউ ? আফটার অল দিস নুইসেন্স?

মিয়া, লিটিল সিস্টার ? আমায় বলো, খুব কষ্ট হচ্ছে মিয়া ?

গলা শুকিয়ে ওঠে। উঠে জল খায়।

একফালি চাঁদের আলো আসছে বারান্দা দিয়ে। পাশে একটা বিশাল গাছ। অন্যদিকে বিরাট লোহার গেট। দরোয়ান। হিংস্র কুকুর। সদা পাহারায়। মিয়া, কোথায় তুমি ? শান্তি তে আছ কি ? মিয়া খুব কষ্ট দিয়েছে ওরা তোমায় ? খুব লেগেছে বোন আমার? ৭ জন মিলে ! ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ! তোমার নরম শরীর !

মিয়া লুকিয়ে ওরা ওহ্ তোমাকে নিয়ে না না না ! মিয়া ! ও বেবি ! কাম অন।

রণি মিয়াকে মধুচন্দ্রিমার নাম করে নিয়ে যায় মন্দারমণি। সাথে কয়েকজন ধনীর দুলাল যার ভেতরে আছে কিছু কলকাতার গুজ্জু ও মারোয়ারি বেওসায়ির বেকার তনয়। যাদের টাকায় চলে বেসরকারি হাসপাতল যেখানে অর্গ্যান পাচার চক্র আছে। আছে আরো কুকর্মে লিপ্ত মানুষের ঠিকানার হদিস। খাতায় কলমে।

গ্যাং রেপ। কেন ? মিয়ার ওপরে রেগে যায় রগচটা রণি। রণি কি সাইকো ? নিউরাল সিগন্যাল নিয়ে যার কাজকাম সে নিজেই সাইকো – কোয়াইট পসিবেল, এভরি থিং ইজ পসিবেল ইন দিস ড্যাম চিপ ওয়ার্ল্ড।

হতে পারে। মিয়া সাদামেয়ে। রণি চেয়েছিলো ওকে নানান ভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত করে নিজের ক্ষুধা মেটাতে, কিছু মোবাইল ক্যামে তুলে পর্ণো সাইটে উঠিয়ে দেবে পাবে ভালো টাকা। যা দেখে সে আন্তর্জালের নানা সাইটে। মিয়া পারেনি। বাবা গোড়া ক্যাথলিক প্রিস্ট। মা নিরীহ দর্জি। হলই বা সাদা তাঁরা। মিয়া ওসব কিছু জানে না। ফোরসাম, ডগিস্টাইল, ৬৯ পোজ। মিয়া ভালোমেয়ে। মিয়া ভালোবেসেছিলো এক ভারতীয় যুবককে। তাই এসেছিলো। রণি রেগে যায়। মেম বিয়ে করেছিলো তো এইজন্যেই।

সেক্স লাইফ এনজয় করবে বলে। তাও হলনা। ব্যাটাকে জব্দ করতে হবে।

মন্দারমণি নিয়ে গিয়ে গ্যাং রেপ।

বুক ভেঙে যায় সাঁঝের। প্রিয় মিয়া বড় ভালোবাসতো ওকে। কাডেল করতো। ডীড্স বলে ডাকতো।

আজ কাকিমা সকালে ফোন করেছিলেন। মিয়ার কেস কোর্টে তুলবে পুলিস। মন্দারমণি হোটেলে সে আত্মহত্যা করেছে। রিস্টের শিরা কেটে ছুরি দিয়ে। মাখন মাখানোর ছুরি।

কেস সিরিয়াস কারণ সে বিদেশী সিটিজেন। এম্ব্যাসিতে জানিয়ে এসেছিলো।

মিয়ার এক দাদা আছেন এখানে উনি মিডিয়াতে আছেন। স্পোর্টস্ জার্নালিস্ট। ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট কভার করতে এসেছেন। তাই কেস আরো জটিলতার দিকে যাচ্ছে।

এইতো কদিন আগেই কথা হল। মোবাইলে এস এম এস এলো। ওকে নতুন কেসের আগে হুইশ করলো। মিয়া দা লিটিল সিস্টার। বেবি মিয়া। মিয়া মিয়া হোয়ার আর ইউ !

কাকিমা বলছেন ওকে এই কেস নিতে হবে। ঐ পারবে ওর কাজিনদের বাঁচাতে। নিজের লোকের হয়ে কেস লড়া যায় কিনা সেই ব্যাপারে উনি

খোঁজ নেবেন । আসলে কাকা তো ওর ব্লাড রিলেশান নন ওদের বাসায় ছোট থেকে থাকতেন বাংলাদেশ ভাগ হবার পরে । তবুও যেহেতু একই বাড়ির মানুষ তাই খোঁজ নেবেন কাকিমা । কত সহজে কথাগুলো বলছেন উনি !

সাঁঝ লড়লে ওরা জিতবেই । কাকিমা বলেছেন মিয়া বিদেশিনী বলে বলা হবে যে ও নষ্ট মেয়ে । তাই নগ্ন হয়ে ছেলেদের সিডিউস করে মন্দারমণি নিয়ে যায় ও ছেলেরা বাঁধনহারা হয়ে ওকে রেপ করে, মলেস্ট করে । কাকিমা আরও বলছেন যে বড় বড় ক্রিমিন্যালকে যে ছাড়ায় তার তো বিবেক বলে কিছু নেই কাজেই এই কাজ ও অনায়াসে করতে পারবে ।

ফাইলটা যেন ও পড়ে যেটা উনি পাঠাচ্ছেন ড্রাইভারের হাত দিয়ে । ফাইলটা ও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে । ও আর কেস লড়বে না । লাইসেন্স ফেলে দিয়ে এসেছে রাস্তার ধারে ডাস্টবিনে । কেউ আর খুঁজে পাবেনা । ও চলে যাবে একটু পরে, প্লেনে করে ডুবাই । ওর বান্ধবী তনুজার কাছে । সে ওখানে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনীয়ার ।

রেস্ট নেবে । তারপর দেখবে নতুন ভাবে কিছু শুরু করা যায় কিনা । যদি দহনের জ্বালা থেকে বেঁচে ফিরতে পারে ।

--পাপের পয়সা বেশিদিন থাকবে না, এই যে এত মানুষের চোখের জল দিয়ে গড়া অপরাধীগুলোকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিস কোর্ট থেকে স্রেফ পয়সার লোভে, দেখিস এইসব একদিন না নিজের দিকেই বাউন্স ব্যাক করে । বলেছিলো তনুজা একবার ।

হেসেছিলো সাঁঝ ।

-স্টপ দিস ননসেন্স, পেটি মিডিল ক্লাস বুলশিট সেন্টিমেন্ট । আই ডোন্ট বিলিভ । প্রফেশান ইস প্রফেশান । যে পয়সা দেবে তার হয়ে লড়বো । ওরা আমার ক্লায়েন্ট । ওদের রেস্পেক্ট দিয়ে কথা বল ।

- মিয়া হোয়ার আর ইউ মিয়া ! খুব কষ্ট হয়েছে বেবি ? চোখ থেকে জলের ধারা বেয়ে পড়ছে সাঁঝের। খুব কাঁদছে কঠোর, নির্মম ক্রিমিন্যাল উকিল । যাকে দেখলে বাঘা বাঘা ক্রিমিন্যাল ভয় পায় । রায়বাঘিনী, সাঁঝ দিদিমণি ।

ফোনটা তুলে নেয় । উল্টোদিকে তনুজা । মিয়ার কথা নিয়ে আলোচনা করে ।

বলে : ও খুব কষ্ট পেয়েছে রে । একটা যন্ত্রণার গুঁড়ো ওর আত্মায় বিঁধে আছে । আমি এইদিকে । রেপিস্টের দিকে । শুনেছি বিদেশে সাইকিক হয় যারা আত্মার সাথে যোগাযোগ করাতে পারে । ডুবাইতে এরকম সাইকিক আছে নাকি রে ? মিয়ার সাথে একটু কথা বলা যাবে ?? খোঁজ নিবি ?

তনুজা বলে ওঠে : হ্যাঁ এখানে এরকম সাইকিক আছে । মেয়ের কাছে যাবি না ছেলে?

জানাস । অ্যাডভান্সে বুকিং করতে হয় ।

ঘরের পর্দাটা আলতো করে সরে যায় । একটি সোনালি অবয়ব যেন এসে ঢোকে । মনের ভুল নাকি চোখের ?

মিয়া, মিয়া কোথায় তুমি -- ওরা খুব কষ্ট দিয়েছে তোমাকে ? মিয়া ?

বেবি----!!!!!!!!!!

ধূম্রাবতী

মেয়েটি ধূলা মলিন। ঈষৎ ছেঁড়া জামা। নিচে ঘাগরা। আধ ময়লা। খুব ছোট করে কাটা চুল। কানে পেতলের ছোট রিং। হাত খালি। গলা খালি। পা খালি। একটি ছোট বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে মহর্ষি বেদব্রতস্বামীর আশ্রমে। এখানে দুপুরে ও সন্ধ্যায় ভিখারিদের বিনাপয়সায় খাদ্য বিতরণ করা হয়। ভাত ডাল তরকারি অথবা খিচুরি লাবড়া কিংবা কোনো কোনো শুভদিনে পায়েস, ভোগ, রসগোল্লা।

এই আশ্রমটি আদতে এক তান্ত্রিকের সৃষ্টি। পাগলাবাবা। ওড়িষ্যার লাগোয়া এক গ্রামে, বাংলার প্রায় শেষপ্রান্তে। মহর্ষি বেদব্রতস্বামী কৃষ্ণভক্ত সাধু ছিলেন। উনি পুরাতন আশ্রমটি সংস্কার করে এখানে পুজোপাঠ চালু করেন। আগে জংলা ছিলো। এখন এখানে পুজো হয় নিয়মিত। দূর দূরান্ত থেকে যেমন ভক্ত আসেন সেরকম বিনাখরচে লোকের উপকারে তাদের ওপর থেকে তন্ত্র মন্ত্র ভূত প্রেতের উপদ্রব সরানো হয়। তান্ত্রিকেরা করেন সেসব। বাঘা বাঘা সব সাধক আছেন এখানে। একটি পাহাড়ের গায়ে আশ্রম। পাহাড়টি ধূমাবতী মায়ের রূপ বলে ধরা হয়। ধূমাবতী শক্তির এক ভয়ানক রূপ। বয়স্ক, কুশ্রী, ভয়ানক, এই মুরতি দেখলে সাধারণের ভয় হয়। শ্মশান, কবর, কুষ্ঠ রুগী, মড়া, কঙ্কাল এই রূপের প্রিয়। যতসব অশুভ বস্তু এই মায়ের প্রিয়। উনি বিধবা। নিজ মুখে ভক্ষণ করেছেন নিজ স্বামী শিবকে। দশ মহাবিদ্যার একমাত্র কুশ্রী রূপ। মলিন বেশবাস, ময়লা বস্ত্র ও পক্ষী কাক তাঁর সঙ্গী। ভক্তদের বোঝাচ্ছেন যে বাহিরে নয় বাহিরে নয় অন্তরে শুধু ভাসতে বলো!

প্রলয়ের পরেও উনি থেকে যান। ধোঁয়া ওঁর রূপ। তাই ধূমাবতী।

তার মধ্যেই উনি একটি হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন ভক্তদের। যারা ওর এই ভয়ংকর রূপকে ছাপিয়ে স্নিগ্ধতা স্পর্শ করতে পারেন তারা হন সর্ব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। এইসব নিয়েই ঐ আশ্রম। তান্ত্রিক আশ্রম। একইভাবে নিরাদরে ছিলো। অনেকদিন। পরে বাবাজি এসে আবার পুজো শুরু

করেন । এই মেয়েটিকে ওখানেই দেখছেন আমেরিকার মালটি মিলিওনেয়ার বব রয় ।

বব কনভার্টেড খ্রীস্টান । কলকাতার মানুষ । সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়তে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন । সেইসময় পাড়ি দেন খুব সহজেই আমেরিকা ঐ ধর্মের টিকিট এর কল্যাণে ।

ওখানে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে ফেঁদে বসেন ব্যবসা । তখন ইলেক্ট্রনিক্সের উঠতি বাজার । পরে আই টির দিকে ডাইভার্সিফাই করেন । হয়ে ওঠেন কোটিপতি ।

একমাত্র মেয়ে দোদোর নাম দিয়েছিলেন ধূমাবতী । এই অদ্ভুত নাম কেন জানতে চাওয়ায় উনি বলেন যে কানা ছেলের নামই তো পদ্মলোচন হয় । আমার মেয়ে কোনদিনই ধূমাবতী হবেনা । আসলে আমি লিখতাম । তাই এই শব্দটার একটি স্ট্রং এফেক্ট যে আছে সেটা বুঝতে পারতাম । আমার ভালোলাগতো ওয়ার্ডটা । আর অ্যামেরিকানরাও জানুক কিছু ইন্ডিয়ান ওয়ার্ড । অথেন্টিক ওয়ার্ড । বলে হাসতেন ।

লাইন এগিয়ে আসছে । মেয়েটি বেঁকানো থালা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে -আজ খিচুরি হয়েছে । নিতে গিয়ে কিছুটা পড়েও গেলো । মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলো বেগুনি ।

- এমা ছি ছি ! আহা রে ! বলে উঠলেন গিন্নি মিসেস বব রয় । মাল্টি মিলিওনেয়ারের স্ত্রী ।

ওরা এই আশ্রমে এসেছেন পাহাড়টির নাম জেনে । ধূমাবতী পাহাড় । মেয়ে তো অনেক বছর হল হারিয়ে গেছে । হয়ত তারই কথা মনে করে ।

অনেক খুঁজেছিলেন ওকে । পান নি । প্রাইভেট গোয়েন্দা, পুলিশ, থার্ড আই, স্পাই কিছুই বাদ যায়নি । যাবার কথাও নয় । মালটি মিলিওনেয়ার । বিলিওনেয়ার নাই বা হলেন !

প্রতিটা দিন মনে হত বসন্ত । কনকনে ঠান্ডায়, ঘন আঁধারেও যেতো ডেটিংএ । ধূমাবতী । দোদো যার ডাকনাম । সবাই ঐ নামেই ডাকতো । ধূমাবতী পোশাকি নাম ।

অনেকে অবশ্য বলতো ধূমস্। ধূম মাচিয়ে দেবে ! যেখানেই যাবে।

শুধু সেজোকাকা মানে সেজকা বলতেন : কোনোদিন মোটা হসনা, আমি তোকে ধূমসি বলবো !

ছেলেটির নাম তূর্য। শর্টে তুর। আজব পেশা। ভূতের বাড়ি কিনে রেনোভেট করে বিক্রি করতো। অনেক পয়সা করে ফেলেছিলো। হন্টেড হাউজ কিনে সাইকিক দিয়ে কিংবা প্রিস্ট দিয়ে ভুত তাড়িয়ে সংস্কার করতো। তারপরে তা বিক্রি করে লাভবান হত কারণ কিনতো সস্তায়।

উই বাই এনি হাউজ ইন এনি কন্ডিশান।

এই ছিলো ওদের স্লোগান। খুব বড়লোক হবার পরে দেশে ফিরে এলো তুর।

কলকাতায়। বাঙালী তো আদতে। ছেলেবেলা কেটেছে এখানেই। তারপর সুদূরে। আমেরিকায়। আগেও একটি বিয়ে ছিলো। কালো মেয়ে। একমাত্র মেয়ে। ধনীর দুলালী। হলই বা কালো ! কুচকুচে। পয়সার জৌলুস সব ঢেকে দেয়।

বিয়ে হল। মেয়েটির সন্তান হলনা। অনেক চিকিৎসা হল। মন ভেঙে গেলো তুরের বাবা মায়ের। একমাত্র ছেলে। বংশ রক্ষা হবেনা ?

এদিকে পুত্রবধূর মাসিকে অসুস্থ অবস্থায় আমেরিকায় পৌঁছাতে যেতে লোক লাগবে। বিশেষ ভিসায় গেলো তুর। আর ফিরলো না। কোনদিন। ওখানে এক রোমানিয়ার মেয়ের সাথে বিয়ে করে (নকল বিয়ে, শুধু ভিসা পাওয়ার জন্য করা সই করা বিয়ে) থেকে গেলো। পরে বিচ্ছেদ; যেমন হয় নিয়ম মাফিক। শেষে প্লাবনের মতন ধেয়ে এলো প্রেম। মাল্টি মিলিওনেয়ারের মেয়ে দোদো। দোদোবুড়ি। আদুরে বুড়ি।

তুরও তো ধনী। বিয়ের পরে সস্ত্রীক কলকাতা। ববের একটু আপত্তি ছিলো।

স্টেটসে বড় হওয়া মেয়ে কি পারবে ঐ ধূলোবালির শহরে মানিয়ে নিতে ?

মিছিল নগরী, অসভ্য নগরী, কুকুর নগরী – পথেঘাটে কুকুর কিল বিল করছে !

চিকিৎসার নামে কিডনি কেটে পাচার করা হয়, বেবী ফুড়ে দেওয়া হয় বিষ, হাসপাতালের বেডের পাশে থাকে বিপজ্জনক লিক হওয়া গ্যাস সিলিন্ডার।

তুর হেসে ওঠে - ওহ্ ! কাম অন বব ! ইউ আর অলসো ফ্রম কোলকাতা, ডোন্ট ফরগেট।

মেয়েও খুব হাসে ---- ও বলে ববি, তাই বলে ওঠে, ববি তুমি ভুলে যেও না রুটকে ভোলা মানে গাছকে উপড়ে ফেলা। ওখানেও মানুষ আছে। আমি ভালই থাকবো। আমার কোনো অসুবিধে হবেনা।

কত লোক পাবো কথা বলার।

মেয়েটি খুব হাসিখুশি, উচ্ছ্বল। প্রাণবন্ত।

বব ও তাঁর পত্নী ইন্দিরা কোনদিনই বাধা দেননি মেয়ের সাধ আহলাদে। তাই এবারেও আপত্তি করলেন না।

মেয়ে চলে গেলো বিয়ের পরেই। ওখানে বাইপাসের ধারে বিরাট ফ্ল্যাট নিলো। ওখানে পরে ওদের চার পাঁচখানা ফ্ল্যাট হল। সব বড় বড়। দু একটি বাংলা সিনেমায় টাকা ঢাললো ওর স্বামী তুর।

নামগুলো খুব আজব। তোমাকে এয়সা দেবোনা, কিংবা চাকর কেন বাবা অথবা মাকে যত পারো বুড়ো বয়সে কেলাও---

- তুর হোয়াট বুলশিট মুভিজ আর ইউ মেকিং ? কি সব নাম এগুলো ?
- আরে নামে কি আসে যায় ডার্লিং ? বাজারে এগুলোই খাচ্ছে। আমার কাছে টাকা আসছে। নাম টাম নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা মানি বুঝি।

সুন্দর সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু দক্ষিণি নায়িকা ভাগ্যলেখার সাথে ঘনিষ্ঠার খবর পড়লো উইকিপিডিয়ায় ওর বায়োডেটায়। সেখানে সে লিখেছে যে প্রযোজক তূর্যর সাথে ওর অনেকদিন ধরেই প্যাশনেট লাভ অ্যাফেয়ার ও গভীর যৌন সম্পর্ক আছে যা গোপন নয় ও তারা দুজনেই চেরিশ করে।

ঘর ভাঙলো। দোদো ঝগড়া করেনি। করতে চায়নি। তবুও চড়া গলায় কথা তো হল। হবেই। এরকম মন ভাঙা খবর। বুক ভাঙা ব্যাথা। যার জন্য আমেরিকার সুখ ছেড়ে পচা ধচা কলকাতায়, কুকুর নগরী। মুখে যাই বলুক। লোকে তো সবই জানে!

খুব মেরেছিলো তুর ওকে। খুব। অনেকবার। অনেক অনেক বার। শেষে মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিলো। মুখ চোখ ফুলে গেছিলো আদরের দুলালীর। রক্ত বার হচ্ছিলো। মাল্টি মিলিওনেয়ারের মেয়ের। রাস্তায় ঘুরছিলো মধ্যরাতে। কলকাতার অপরিচ্ছন্ন, আনসেফ রাস্তায়। যেখানে ধর্ষণ ছেলেখেলা। বাবা আমেরিকায় মাল্টিমিলিও নেয়ার। ধূমাবতী ধোঁয়ায় ঢাকা। চেতনা ধূলাবতী।

মলিন শহর কলকাতার মলিন মেয়ে।

পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোঁজ নেয়নি একবারও তুর। কেউ না। বন্ধুরা খুঁজে পায়নি। পাবে কী করে? হারিয়ে গেলো কোন সে অজানায়া একটি জলজ্যান্ত মেয়ে।

পুলিশে, গোয়েন্দায়, থার্ড আই, স্পাই –বড়লোকের ক্ষমতা অসীম, টাকার জোরে চাই কি ইন্টারপোলকেও কাজে লাগানো যায় হয়ত, লাভ হলনা কিছুই। মেয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো।

–ববি, ববি। দুবার ডাকটা কানে এলো। মিঠে ডাক, বহুদিন শোনেননি। মনে হল ভুল শুনছেন। তবুও ঘুরে তাকালেন। আজকাল এরকম হয়। একমাত্র মেয়ে ছিলো তো! বাজার হাটে এরকম অনেকবার হয়েছে।

নাহ্! ভুল নয় এবার। সত্যি তো! সেই ভিখারি মেয়েটি!

ময়লা ঘাগরা! হাতে তুবড়ানো বাটি!

ববি! মাম-মা কৈ? আমি তোমাদের আগেই দেখেছিলাম, অত লোকের মাঝে বিব্রত করতে চাইনি তাই ডাকিনি!

- আবেগে দুই চোখে জল। এই নাম ধরে না ডাকলে সন্দেহ হতই! ভিখারি মেয়ে আমেরিকার মাল্টিমিলিওনেয়ারকে ডাকতেই পারে,

অস্বাভাবিক নয় । যা অবাক হবার মত তা হল এই ববি ডাকটি ও মামমা নাম জানা ।

বাবা, মা কে এই নামেই ডাকতো সে ।

নিজ সন্তানকে চিনতে পারেন নি বব । বাচ্চা বাবা মাকে চিনতে ভুল করেনি ।

মা মাটি থেকে তুলে বেগুনি খাওয়া দেখে এমা ছি ছি করেছেন । তবুও নিজ সন্তানের স্পর্শ চোখ এড়িয়ে গেছে ।

- তুমি ফিরে গেলেনা কেন ? আমাদের কল করলে না কেন ?
- কী হত কল করে ?
- আমরা আবার তোমার লাইফ তৈরি করে দিতাম । আবার বিয়ে দিতাম কিংবা পার্টনার পেতে । এইভাবে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে বেগুনি ! লাইফ ইজ স্টিল ইন অ্যামেরিকা ।
- আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে ববি ।
- তাতে কি ? ওটা বিয়ে বলছো ? যে নিজের ওয়াইফকে মেরে বাড়ি থেকে বার করে দেয়, একবারও খোঁজ নেয়না সে হাজব্যান্ড ?
- ও তো আমাদের বলেছিলো তুমি মিসিং ! মারধোরের কথা তো বলেনি ! বলে ওঠেন স্বল্প ভাষিনী ইন্দিরা ।
- ওর অ্যাফেয়ার ছিলো । তাও আমি কম্প্রোমাইজ করতাম । কিন্তু ও আমাকে চাবকাতে আরম্ভ করলো । সিঁড়ি থেকে ফেলে দিলো । আমি কনসিভ করেছিলাম । মরে গেলো । ওড়িষ্যা সরকারে বাসে করে এখানে চলে আসি ওর ভয়ে । যদি পিছু ধাওয়া করে । আরো মারে -- করেনি । এখানে থাকি । ফ্রিতে খাবার খাই । আশ্রমের লাগোয়া ঘরে থাকি । বদলে অনাথ বাচ্চাদের পড়াই । স্পিরিচুয়ালিটি আমার লাইফ বদলে দিয়েছে । ঘর খুব ছোট ঘর । দেখবে ?

এসো এসো !

নিয়ে গেলো ওদের। খুবই ছোট ঘরটি। একটি সরু বেঞ্চি পাতা। তোষক দিয়ে একটু চওড়া করা হয়েছে, তাতে শোয়। একফালি বারান্দা। সেখানে বসে। টালির চাল। ছোট জানালা।

অপরিষ্কার কিছু পোশাক রাখা একদিকে। একটি পেতলের গেলাস। আর কলসী। আশ্রম থেকে নাকি দিয়েছে। চায়ের। জলের। মেয়েটি ওখানেই থাকে এখন।

আমি ভালো আছি মামমা, ববি।

নাম দিয়েছিলে ধূমাবতী। ধূমাবতী তো এরকমই। এই পরিবেশেই বাস করেন আর লোকের উপকার করেন। আমিও মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। খালি পায়ে আমি হাঁটতে পারি মাইলের পর মাইল। উঠতে পারি পাহাড়ের চূড়ায়। রোদ, বৃষ্টি কিছুতেই আমি কাহিল হইনা। কুষ্ঠাশ্রমে কাজ করি। রাতে শান্তিতে ঘুমাই। আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে মামমা একবার। এবার আমার কাজ সমাজসেবা।

জীবন একটা নাটক। কারো ভোগটা বেশি হয় কারো ত্যাগটা। আমার ত্যাগটা একটু আগে এসেছে। তুমি এত কেঁদো না মামমা। শুধু পার্সপেক্টিভ টা চেঞ্জ করে নাও। দেখবে সব একই আছে। মেন্টাল ব্লকে আমরা বন্দী। সবাই। তাই এত কষ্ট। আমাদের। আমাদের মুক্ত করতে হবে। নিজেদের। তবেই আসবে আনন্দ। পরমানন্দ। আনন্দ আমেরিকায় নেই। অস্ট্রেলিয়াতেও না। আনন্দ আছে মানুষের অন্তরের। শুধু খুঁজে নিতে হবে।

মেয়ের হাতেটা ধরে অঝোরে কাঁদছেন মাল্টি মিলিওনেয়ারের স্ত্রী ইন্দিরা।

ভেবেছিলেন মেয়ে নেই। এইভাবে যে আছে ভেবে বুকের ভেতরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছে! কত স্বপ্ন দেখতেন ওকে নিয়ে। কত আশা। ভালোবাসা।

আজ এক রাশ হতাশা।

- আমি খুব ভালো আছি মা। মানুষের মাঝে খুঁজে পেয়েছি বিশ্ব সংসার। ছোট ছোট জিনিস আমাকে আর স্পর্শ করেনা। কি লাগে মানুষের বলো? এক হাত শোবার জায়গা আর এক টুকরো কাপড়

। তাই নিয়েই এত হানাহানি, মারামারি, হিংসা দেখি চারপাশে, আমি এর থেকে অনেক দূরে এসে ভালো আছি । আমাকে তোমরা আর ওসবের মধ্যে টেনো না । সভ্যতা ছেড়ে এসে আমি ভালো আছি মা । তোমরাও ভালো থেকো । আলোয় আছি এই আশ্রমে । আমি মলিন বেশেও স্বপ্ন দেখি । মানুষের ভালো করার স্বপ্ন । সবুজ জগতের স্বপ্ন ।

ববি ভাবছিলেন তার কলেজের বন্ধু নৃপেনের কথা :

একবার ধর্মভীরু নৃপেন বলেছিলো : নামটা ভালো চুজ করিস নি । এইসব তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে খেলা নাই বা করলি । শুনেছি ধূমাবতীর পুজো সধবাদেরও করার নিয়ম নেই মন এমন বৈরাগী হয়ে যায় । মানুষ সন্ন্যাসী, একাকী হয়ে যায় এইসব পুজো করলে।

সংসারি থাকে না আর । ওঁর মন্ত্র ধূম ধূম ধূমাবতী স্বাহা এতই পাওয়ারফুল যে জপ করে শত্রুকে ধ্বংস করে ফেলা যায় । কাক কর্ম বলে একটি প্রথা আছে তন্ত্রে এই রকম । ধূমাবতী অলক্ষ্মী । অন্য লক্ষ্মী মন্ত নাম দিতিস । শব্দের এফেক্ট তো কত আছে, কত সুন্দর সুন্দর গভীর শব্দ আছে ভারতে । ঐন্দ্রিলা, রঞ্জাবতী, মন্দ্রিতা, স্বাগতালক্ষ্মী –মন্দ কি ??

জিঘাংসা

চশমাটা খুলে টেবিলের ওপরে রাখলেন জুঁই। পাশের ধানক্ষেত থেকে মৃদু বাতাস ভেসে আসছে। ওর বাড়িটি একটু দূরে। আল বেয়ে আসতে হয়। টিভিতে একটু আগেই খবরটা শুনলেন। আজকাল রোজই শুনছেন।

ডুয়ার্সের কদমপাইগুঁড়ি এলাকায় কেউ যেন একের পর এক আঘাত করে চলেছে কিশোরী ও তরুনীদের। আজব পন্থায়। ওরা অবশ্যই কেউ মারা যাচ্ছে না। শুধু ক্লিটরিস কেটে, যৌনাঙ্গটি তুবড়ে বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে। ছোট শহর কদমপাইগুঁড়ি। এখানে এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। এগুলি সাধারণত ইংলিশ সাইকো থ্রিলারে দেখা যায়। আজকাল অবশ্য হিন্দি সিনেমাতেও দেখাচ্ছে।

জুঁই চিন্তিত। কারণ যেরকম সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে তাতে করে কতদিন আর এই জগৎ টিঁকবে তাই নিয়ে উনি ভাবেন। স্কুলে পড়ান। তাই একটু আদর্শবাদী।

ছাত্ররা মজা করে বলে : দিদিমণি আপনে আপনের রীতি নীতি পাল্টান। আজইকাল সব পাইল্টাইয়া জাইতাসে।

ওরা বাঙাল ঘেঁষা কথা বলে।

গ্রামের ছেলেপুলে সব। জুঁই তো বিবাহ বিচ্ছিন্না। কলকাতা থেকে এসেছেন।

খুব বনেদী পরিবারের বৌ ছিলেন। স্বামী ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। রূপবাণ। ধনবাণ।

খড়গপুর আই আই টি থেকে ন্যাভাল আর্কিটেকচার নিয়ে পাশ করেন। ফার্স্ট হন। পরে সাবমেরিন ডিজাইনের কোম্পানি খোলেন। জুইকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। জুই কিন্তু সুন্দরী নন। মেধাবী। একই পাড়ার মেয়ে। কৈশোরের প্রেম। পরে মতের মিল না হওয়ায় বিচ্ছেদ। ভদ্রলোক আবার বিয়ে করেন। করবেনই। অনেক পয়সা যে। অনেক মেয়েই

ঘুরঘুর করে আশে পাশে। বুকের ব্যাথাটা আজকাল বড্ড কষ্ট দেয় এসব মনে হলে।

এক কাপ চা খেলেন।

কাল হোলি। আজ দেব দোল হয় ওদের পাড়ায়। আসলে এখানে এই নিয়ম চালু করেছেন এলাকার মাতব্বর কানাই পাল। লোকটির বহু ব্যবসা। ধনবান। ওর কথাই এখানে আইন।

ও বলেছে আগের দিন দেব দোল হবে পরের দিন লোকে দোল বা হোলি খেলবে।

দেব দোল মানে দেবতারা দোল খেলবে সেদিন তাই মানুষ খেলবে না। যেদিন সারা দেশে দোল সেদিন ওদের দেব দোল।

জুই দোল খেলে না। রঙ এ এলার্জি হয়। তবুও ছাত্ররা পরের দিন এলো।

জোর করে রং দিলো।

- দিদিমণি এদিকে আসেন না, আইসা দেখেন না কেমুন রং আনসি !

মিঠুর ডাকে গেলো অবশেষে। কমবয়সী মেয়ে। দারুণ দেখতে। কানাই পালের মেজ মেয়ে। বড়লোকের মেয়ে বলে পয়সার বিভায় রূপ ঝলমল করছে। আরো।

অনেক রং মাখালো সে।

জুই মাখলেন। সচরাচর মাখেন না।

তারপরে মন্ডামিঠাই খেলো মিঠু। রাখাই ছিলো।

টেবিলে। জুঁই বানিয়েছেন। নিজ হাতে। এসব করেই সময় কাটান। বিয়ের তত্ত্ব সাজিয়ে দেন কারো কারো। ছবি আঁকেন। আলপনা দিয়ে দেন।

লোকের বাড়ি গিয়ে।

একা থাকেন তো। এইভাবে সময় কাটান।

আক্রান্ত মিঠু হঠাৎই । সেই একই ভাবে । যৌনাঙ্গ বিকৃত । ধানক্ষেতের ওপাশে পড়ে ছিলো অজ্ঞান হয়ে । ওদিকে সর্ষে ক্ষেত । বড় একটি আম গাছ আছে । দূর থেকে কাঞ্চন জঙ্ঘা দেখা যায় ।

মিঠুর জঙ্ঘায় আঘাত । ছুরির ।

পুলিশ কোনো কিনারায় করতে পারছে না এখনো অবধি ।

এবার হয়ত কেস জটিল হবে । কানাই পাল রাঘব বোয়াল ।

আগের সবাই ছিলো চুনোপুঁটি ।

জুঁই বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো আর্শিতে নিজের মুখটা দেখছিলেন ।

রঙের ভরে গেছে । উনি ফুল দিয়ে হোলি খেলেন । মানুষকে ফুল ছুঁড়ে দেন । তাতেই হোলি খেলা হয় ।

বলেন : রং তো ফুলেও আছে । শুধু আবীর মাখো কেন ? সৌন্দর্য্য আবীরের বাইরেও দেখতে শেখো !

আয়নায় মুখটা দেখছেন ।

ওরই মুখ । সেই একই রকম আছে, বিয়ের সময় যেমন ছিলো । একটু ভাঁজ পড়েছে।

আলোর ভাঁজে গাঢ় পাপড়ির মতন কিছু বলিরেখা । মুখটা সুন্দর নয় ।

তাই তো বিপত্তি । অসংখ্য নারীতে গেলো সে । সেরকম তো কথা ছিলো না !

বকুল তলায় দাঁড়িয়ে কতগুলি প্রতিশ্রুতি, কথা -সব ভুলে গেলো ?

সমুদ্রের গভীরে ডুব দিতে দিতে ভুলে গেলো জীবনের গভীর কথাগুলি ?

রূপের হাটের ফেরিওয়ালার ভুলের মাশুল দিচ্ছে আজ শত শত মিঠুরা ।

আবীর মাখা অবয়বের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে সেই ভয়ানক মুখ !

যতই লুকাবার চেষ্টা করুন জুঁই ! আজ সে আসবেই লোকসমক্ষে ! এ কোনো দ্বৈত সত্ত্বার খেলা নয় । নয় মাল্টিপেল পার্সোনালিটি ডিজ-অর্ডার ।

প্রতিফলন স্বচ্ছ। রূপ দেখলেই কাঁদে হিয়া। ছিন্নভিন্ন করে দাও যৌনাঙ্গ। কেড়ে নিয়েছে প্রেমাস্পদকে ;যার মাধ্যমে ওরা --জুঁই ফুলের কাছ থেকে !

: দে আর গর্জাস ইন বেড। হ্যাভেন্ট ইউ সিন ইওর ফেস ডিউরিং অর্গাজম ইউ ব্লাডি বিচ ! তোকে যা কুৎসিত দেখতে সহ্য করাই মুস্কিল।

ছেড়ে যাবার সময় বলেছে সে !

ক্রোধ ! এক অদ্ভুত ক্রোধে জ্বলেছে অন্তর, পুড়েছে হিয়া !

জিঘাংসা !

বীভৎস এক প্ল্যান, প্রতিহিংসা নেবার পরিকল্পনা --------

সব তছনছ করে দিতে চায় জুঁই নামের ফুল।

ফুল কখনও কুৎসিত হয় ? তোমরাই বলো ? বলো বলো বলো !

জুঁই কি করবে ?

আজ সে লুকাতে চায়, সমাজ সংসারের কাছ থেকে কিন্তু আর্শিতে ঐ মুখ !

সে আজ ধরা দেবে সবার কাছে।

তাই তো ধেয়ে আসছে এদিকে, প্রবল বেগে !

জুঁই পড়ে যাবে ! পড়ে যাবে !

ওহ্ ! লাগছে ! ভীষণ লাগছে। কদাকার মুখটি ক্রমশ এগিয়ে আসছে। কী ভীষণ ভারী ও ওজনদার ! যেন বিশাল কোনো পর্বত ! পাপের বোঝা এত বেশি ? বইবার ক্ষমতা কার আছে ? বিরাট একটি শিলা যেন। খন্ড যুদ্ধ সম্ভব নয় এখন। কোনো প্রতিরোধও নয়। দেহে বলও নেই। নিষাদের বিষাক্ত তীরের ফলা বিঁধলো অন্তরে।

মুখের ধাক্কায় কুপোকাৎ ! চরাচর রক্তাক্ত। প্লাবিত। ভয়ার্ত -আঁধারের যাত্রীরাও।

জুঁই ফুল পিষে গেলো !

একটি মৃত্যু একই দিনে। এও মহিলা। শুধু অসুন্দর ও বয়স্ক। তবে যৌনাঙ্গটি অটুট।

পুলিশ আবারও ক্লু -হীন।

লিচ্ছবি

নর্মদা নদীর তীরে এক দলিত গ্রামে বাস করে লিচ্ছবি লামা। এই নামেই সমাজে পরিচিতা সে। বড় হয়েছে হিমালয়ের এক অর্ফানেজে। খ্রীস্টান পাদ্রীর কাছে। কিন্তু খ্রীস্ট ধর্ম নেয় নি। কোনো ধর্মই তার ছিলো না। নেপালের দিকে মানে উত্তর হিমালয়ের ঐসব দিকে কোনো এক স্কুলে পড়াতো। অর্ফানেজের এক বান্ধবী কেটের সাথে ছিলো। অনেকদিন। কেট মেয়ে পাদ্রী। সেও ঐ অনাথ আশ্রমে বেড়ে উঠেছে আর খ্রীস্টান ধর্ম নিয়েছিলো।

তবে ও ক্যাথলিক না। আরো উদার এক মতের খ্রীস্টান। দুজনে থাকতো কাশ্মীর ও নেপালের দিকে মানে উত্তুরে শীতের এক গ্রামে। পাহাড়ি গ্রাম। হিমালয়ের হাতছানি। শীতকালে তুমুল বরফ। রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ওরা নিচে আসে। ওখানে ওদের স্কুলের অন্য সমাজ সেবা মূলক কাজ হত। ওরা তাতে অংশ গ্রহণ করতো।

শীত কমে গেলে ফিরে যেতো নিজ গৃহে।

এলাকায় অনেক মুসলিম। ধীরে ধীরে তারা ধর্মান্তরিতে হয়ে বৌদ্ধ্য ও খ্রীস্টান হয়ে যাচ্ছিলো। কারণ আজকাল মুসলিম হবার অনেক হ্যাপা। লোকে উগ্রপন্থী ভাবে। মিশতে চায়না। ছেলেপুলেদের মেলামেশা করতে দেয়না। যখন তখন সেনাবাহিনীর লোক গুলি করে। তুলে নিয়ে গিয়ে হ্যারাস করে। জেলে পুরে টর্চার করে, বিনাকারণে থার্ড ডিগ্রী দেয় স্রেফ মুসলিম বলে। তাই ভালো ভাবে বাঁচতে চাও তো ধর্ম বদলে ফেলো। গড তো সেই একই তাহলে কেন খামোখা আল্লা আল্লা করে চেল্লা মেল্লি করে বেঘোরে প্রাণটা খোয়ানো ?

এই গড বা আল্লা নিয়েই তো কেলেঙ্কারি ওদেরও হল !

ঐ গীর্জায় যেখানে ওরা ছিলো সেখানে একদল ব্রাদার শোরগোল তোলে যে ওরা দুই মেয়ে আদতে লেসবিয়ান। ওরা যে একসাথে থাকে তা আসলে লেসবিয়ান কাপেল বলেই। বিদেশে আজকাল এরকম খুব হচ্ছে। বিয়ের

বালাই নেই এক জেন্ডারের দুই কাপেল এক সাথে থেকে সেক্স করছে। কাজেই পুণ্যভূম থেকে এই পাপ বিদায় করো।

খুব হল্লা বোল হল। কুশপুত্তলিকা দাহ ওদের দুজনের। লেসবিয়ান কাপেল গো ব্যাক!

তোমাদের চাইনা! ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীরাও এরকম প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিলে সামিল হল। নির্মল হৃদয় যাদের। মাথা নিচু। মিসেদের চোখের দিকেও ওরা চাইছে না।

লিচ্ছবি লামা মিসকে ওরা চায়না। খুব জনপ্রিয় মিস ছিলো সে। তবুও। কারণ সে লেসবি।

বাবা মায়েরাও আপত্তি করলো। শেষে একদিন রাতে ওদের ঘরে আগুন লাগালো স্থানীয় গুন্ডারা। সব ব্রাদারদের কারসাজি। কারণ ওর বান্ধবী পালাতে চায়নি। কিন্তু বাঁচতে পারলো কি? আগুনে জ্বলে শেষ হয়ে গেলো। নাইলনের কাপড় পরে ছিলো, গা সহজেই পুড়ে গেলো।

পালালো লিচ্ছবি। তবে শহরে নয়।

এই নর্মদা তীরে। শুনেছিলো এই নদী পুণ্যতোয়া। গঙ্গার চেয়েও বেশি পতিত উদ্ধারিনী। স্বয়ং গঙ্গা তার পাপ ধুতে এখানে আসেন। আর হিন্দু ধর্মের মহত্ত্বের কথা কতনা শুনেছে।

ভারতে সর্বধর্ম সম্বনয়ের দেশ। সেকুলারিজ্‌ম। তসলিমা নাসরিনকে তো মেরে তাড়িয়েছে মুসলিমগুলো বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ভারত ওঁকে স্থান দিয়েছে। এখানে সব মানুষ মিলে মিশে আছেন। মুসলিমরাও শ্রদ্ধা পান। বরং দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওরাই আপার হ্যান্ড। হিন্দুরা ওদের প্রোটেক্ট করছে সমানে। এহেন মহান ধর্ম হিন্দু তার চেয়েও মহা নদী নর্মদার তীরে এসে বাসা বাঁধলে কেমন হয়?

যেমন ভাবা তেমন কাজ।

এক সন্ধ্যা --পোটলা পুটলি নিয়ে সোজা নর্মদা তীরে। গঞ্জের নাম লাখোটিয়া। দুই পাশে পুণ্যতোয়া নর্মদা। শিলাভূমি। গাঢ় জল। এখানে

ভেসে আসে শিবলিঙ্গ। অজানা স্থান থেকে। শত শত সাধু স্নান রত। কাছেই আছে অমরকন্টক। আরেক তীর্থস্থান।

লিচ্ছবি একটি ছোট স্কুলে কাজ নিয়ে এলো। দরখাস্ত দিয়েছিলো আগেই। স্কুলটি চালাঘরের নিচে। লোকাল ছেলেপুলে পড়ে। মাইনে বেশি না। খাওয়াপরা দেবে মহাজন। সে সুদের কারবারি। স্কুল খুলেছে আদতে নিজ সন্তানের শিক্ষার জন্য সাথে এলাকার কিছু ধনী ও মাতব্বর গোছের লোকের পুত্রকন্যারাও পড়বে। সর্বসাকুল্যে টিচার পাঁচজন। দুজন ছেলে আর তিনজন মেয়ে। একজন হেড দিদিমণি। বিহারি। বুড়ি।

ছেলেগুলি ছোকরা। অন্য মেয়েটি বিধবা। সে বাঙালী। দন্ডকারণ্য থেকে এসেছে।

লিচ্ছবি একটি ঘর পেয়েছে। এক চালা। সামনে একটু বারান্দা। ওখানে রাঁধে বাড়ে। এক বেলায় রান্না করে।

কুয়ো আছে সেখান থেকে জল নেয়।

ওকে দেখতে সুশ্রী নয়। বেশ কালো। আর একটু লম্বা বেশি। বেণী দুলিয়ে চলে। ওর বাড়ির হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তো কেউ জানে না। অর্ফানেজে মানুষ। কোন দেশ, জাত, ভাষাভাষি কেউ জানেনা। কিন্তু মানুষ তো বটেই।

রাতে রুটি খায় তরকারি দিয়ে। সকালে পেঁয়াজ দিয়ে। টিফিনে স্কুলে অন্য টিচারের আনা খাবার থেকে ভাগ নেয়। ওকে মাস গেলে কিছু টাকা দিয়ে দেয়।

ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসে। বাঙালী তো। তবে নিরামিষ। গরম কালে খুব গরম পড়ে। সারাদিন বাইরে গরম বাতাস। খুব একটা কেউ বার হয়না।

- সায়না ও সায়না, ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলো স্কুল গেটের দিকে। ওদিকে একটি নিচু পাঁচিল। তার ওপাশেই হাল্কা বন। সেই বন পার হলেও নর্মদা। বেশ বড় নদী। উচ্ছল। উত্তাল ঢেউ। শিবলিঙ্গ।

সন্ন্যাসী। সর্বত্যাগের বাতাস। শন শন করে গাছের কোটরে সংসার বিমুখ সুর।

সায়না এলো ঝুম ঝুম রিন রিন করে, ওর পায়ে নূপুর পরা।

এক ঘাঘরা জাতীয় কিছু পরে। লোকাল মেয়ে। স্কুলে ঝাড়ু দেয়। জল আনে। চা দেয়। ও এসে জানতে চাইলো কি বলছে লিচ্ছবি। সে মৃদু স্বরে জানায় যে গরম গরম চা না এনে আজ সরবৎ আনুক। আজ বড্ড তেতেছে ভুবন। লিচ্ছবি তপ্ত।

সায়না মাথা হেলিয়ে চলে গেলো।

এক বাংলাদেশীর সাথে ওর এখানে আসবার সময় ট্রেনে দেখা। ও জানতে চেয়েছিলো সে কলকাতার নাকি বাংলাদেশের, তাতে লোকটি খেঁকিয়ে বলে ওঠে : যেইখানকাইরই হই বাংগালি তো বটেই ! কি কন ?

লিচ্ছবি হাসে। কেন খেঁকালো জানে না। ভদ্র ভাবেও বলা যেতো।

--মুসলিমগুলো কি সবসময় টেররিজমের মুডে থাকে ? ভেঙে ফেলো,কেটে ফেলো, গুড়িয়ে ফেলো ? খোলা তরবারি নিয়ে আল্লা হো আকবর !

বলেছিলো ওর বান্ধবী কেট। যে আগুনে শেষ হয়ে গেছে লেসবিয়ান অপবাদে।

তারা আবার খ্রীস্টান। এদিকে লিচ্ছবির কোনো প্রথাগত ধর্ম নেই। অথচ সবাই মানুষ। এই খ্যাঁকশেয়ালকে বলতে সাধ হল কিন্তু বললো না : আপনের মতন সবাই যোওদি এত সেকুলার হইতো তাহইলে তসলিমা নাসরিনরে আপনেগো দ্যাশ ছাইরা পালাইতে হইতো না ! গড ইজ পাওয়ারফুল এনাফ টু প্রটেক্ট হিমসেল্ফ অ্যান্ড ইওর রিলিজিয়ান। ইউ বেটার প্রটেক্ট দা ম্যান্‌কাইন্ড।ইন্সটেড অফ চেজিং আ পুওর লেডি।

কোরানেই তো বলা আছে কেউ ঈশ্বরকে অস্বীকার করলে তাকে তর্কে আহবান করবে। লাঠি তরবারি নিয়ে তাড়া করবে এরকম লেখা আছে কি ? শান্তির ধর্ম ইসলাম। শান্তির গ্রন্থ কোরান। আর মানুষ ? এত অশান্ত ? তাদের পায়ে এত আগুন??

নাস্তিকদেরও তো ভগবানই বানিয়েছেন। ওরা কোথায় যাবে ??

এইসব কারণেই ওদের পুরাতন গ্রামে লোকে মুসলিম থেকে অন্য ধর্মে চলে যাচ্ছে । কমিউনিস্টের মতন মুসলিম শব্দটাও লোককে অস্বস্তিতে ফেলে আজকাল । বিদেশে যেমন পাদ্রিগুলো কচি কচি শিশুদের মলেস্ট করে সেরকম আজকাল ইসলামের সাথে জুড়ে গেছে উগ্রপন্থা । অচেনা মুসলিম মানুষের সাথে কথা বলতেও লোকে ভয় পায়।

–ওরে বাবা মোল্লা ব্যাটা ! কে জানে ! কি লিঙ্ক আছে কোথায় । শালা টেররিস্টের বাচ্চা নাকি !

কোথায় কোরানের শান্তির বাণী, ভ্রাতৃত্বের কথা, মৈত্রীর আহ্বান আর এইসব ছাইপাশ ! কিছু মন্দলোকের জন্য একটি গোটা ধর্মের মানুষের মাথায় কলঙ্কের বোঝা ! তবে ওদেরকেই এগিয়ে এসে এই কলঙ্ক মোচনের ব্যবস্থা নিতে হবে । ওদের যত বড় বড় ইন্টেলেকচুয়াল আছেন তারা এইব্যাপারে হাত মেলাতে পারেন।

লিচ্ছবি লামা এইসব ভেবে সরবৎ খাচ্ছিলো।

ভূতন এখানে পোস্ট ম্যান। সপ্তাহে দুদিন চিঠি বিলি করে। দলিত মানুষ। পড়ালেখা করেছে । ওকে বিটি বলে । একটু বুড়ো । গতকাল পড়ন্ত বেলায় ওকে বড় মায়াবী লাগছিলো। ক্লান্ত মুখে সূর্যাস্তের শেষ আভা, যেন শিল্পীর ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে এক সরল মুখ । ওকে একটি ঠোঙায় করে আলু বোন্দা দিলো। বললো : বিটি তু খাবি ?

- কেন খাবো না ?
- আমি যে দলিত ঘরের রে।
- তাতে কি ?
- এখানে এসব লোকে খুব মানে।
- আমি মানি না। আমার কাছে সবাই মানুষ।

ভূতন ওর ক্ষয়াটে দাঁতে খুব হাসে – হো হো হো, তু মজার আছিস । ব্রাহ্মণরা আমাদের এই নদীর জল নিতে দেয়না । রোদের তাপে পুড়ে ৫

মাইল গিয়ে জল আনি। গরম কালে জল কমে গেলে খুব সুখায় অসুবিধে হয় ।

বনের ভেতরে একটি জলা আছে ওখান থেকে ঘোলা জল এনে খেয়ে পেটের অসুখ হল । অনেকে মরেও গেলো । তবুও নদীর জল নিতে দেয়না বাবুরা ।

বলে জাত যাবে । নদী কি কারো বাপের আছে ? নদী তো সবার ! নর্মদা মাঈ তো সবার মা ।

ভূতন আবার হাসে । এই হাসিতে কেমন একটি বিদ্রূপ । যেন সমাজের নিয়ম গুলিকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারে এই অশিক্ষিত পোস্ট ম্যান এমন তার দাপুটে হাসি ।

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে নর্মদায় গেলো লিচ্ছবিও । একটু হাওয়ার আশায় । নেমেছিলো জলে । হাত মুখ ধুলো । মুখে জলের ঝাপটা । তাতেই কাল হল ।

ও অজাত কুজাত । কোথা থেকে এসেছে কেউ জানেনা ।

দলিত পোস্ট ম্যান ভূতনের হাতে খায় । অতএব ওকে প্রচন্ড মারধোর দেওয়া হল ব্রাহ্মণ পট্টি থেকে, গুন্ডা দ্বারা । ওদের পালোয়ানেরা ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে গ্যাং রেপ করে, কেটে ছিঁড়ে ফেলে দিলো বনে । নর্মদা কিনারে । পুণ্যতোয়া মাঈয়া নর্মদা নীরব । ভক্তের দলের তান্ডবে । সেই ধর্ষণ কারীদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানও ছিলো । কামুক এইসব উচ্চজাতের মানুষ অজাত কুজাতের মেয়েদের রেপ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না শুধু নদীর জলে পা ডোবালেই হুঙ্কার ! এলাকা ছাড়ো !

নিপাত যাও ! আমি ব্রাহ্মণ, কূল শ্রেষ্ঠ ! তুমি কে ? কী তোমার পিতৃ পরিচয় ?

আমার পিতৃ পরিচয় হল আমি ব্রাহ্মণ রেপিস্টের ছেলে । তুমি নিচুজাতের সাধুর মেয়ে ? তফাৎ যা পিশাচ ! রেপিস্ট বড় না সাধু ? দেখছিস না রেপিস্ট আদতে ব্রাহ্মণ?

ক্ষিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত কোমল লিচ্ছবিকে তুলে নিয়ে গিয়ে নবজীবন দেয় দলিত ভূতন। ওর ডেরায় সে বেঁচে ওঠে। ওদের নিজেদের ঠাকুর আছে। দিকু নাম। সেই দিকুকে দেখতে একেবারে অন্যরকম। খুব প্রাকৃত কিন্তু আলোছায়ায় ভাস্বর। হরিণের শিং মাথায়। আয়ত আঁখি। ঘোর কৃষ্ণ দেহ বল্লরী। তবুও চিত্রকরের মনের ক্যানভাসে সদাজগ্রত।

ভাঙাগড়ার খেলায় দিকু অনন্য। তাই তো দলিতের দেবতা উনি। ব্রাহ্মণের নন। উনি সমাজ সংস্কারক। তাই তো দলিতদের মধ্যে আছে বিধবা বিবাহ, বাল বিধবা বিবাহ, ওদের মধ্যে যারা আরো নিচু তাদের সাথে প্রতিষ্ঠিতরা বিয়ে করে। যেমন ভূতন করেছে এক দলিতের মেয়েকে যে খুবই দরিদ্র। দিকু বলেছে বলে। স্বপ্নে বলেছে।

লিচ্ছবিকে ভূতন বলেছিলো যে শহরের গাড়িতে তুলে দেবে। ও রাজি হয়নি।

অভিমানী আঁখি মেলে বলেছে : আমাকে তাড়িয়ে দিবি ?

ভূতন : না রে বিটি ! বিটি কে কেউ তাড়ায় ?

- তাহলে ?
- তু এখানে রইবি ?
- হ্যাঁ, তোর ছেলেদের পড়াবো।
- –খাবি কি ?
- তুই যা খাবি ! আমি কি রাক্ষস নাকি ?
- হো হো হো। ভূতনের দাপুটে হাসি।

নর্মদা নদী, মহৎ হিন্দু ধর্ম আর দলিতের ঠাকুর দিকু ও নিচু জাতের ছোটলোক ভূতন। নিঝুম বন, অর্জুন গাছের শেকল, পরিশীলিত প্রজ্ঞা, নিরাভরণ মন, সনাতন সংস্কারের বেড়াজাল কেটে লিচ্ছবি লামা বলে ওঠে আকাশের দিকে চেয়ে :

ভাগ্যিস আমার কোনো ধর্ম নেই !

অবৈধ

দেয়া একটি ওয়েবজিনের সম্পাদক। আসলে ফাউন্ডার-এডিটার।

বয়স প্রায় ৪২। বিবাহিতা, সুশ্রী। সুমধুরভাষিনী। নিজেও লেখে।

গল্পে নতুনত্ব থাকে বলে নাম আছে। সিক্রেট অ্যাডমায়ারার আছে অনেক।

নিজের টুইট ও ফেসবুক পেজ আছে। নিয়মিত আপডেট করে।

সেখানে ছবিও বসিয়েছে। আর পাঁচজন ফেসবুক ব্যবহারকারির মতন ও সেখানে বসে নিজের সুখ দু:খের গল্প ভাগ করে নেয় বন্ধুদের সাথে। জনপ্রিয় মানুষ কারণ ওয়েবপত্রিকার সম্পাদক। কাজেই বহু মানুষ ওকে চেনে, ওখানে আসে লেখা প্রকাশ করার তাগিদে। অনেকে মো সাহেব আবার বহু মানুষ ওর শুভাকাঙ্খী। প্রকৃত বন্ধু। দুনিয়ায় সবরকম মানুষই আছেন। ভালো মন্দেই মেশানো জগৎ। ধান্দাবাজ, স্বার্থপর যেমন অলিতে-গলিতে সেরকম খাঁটি সোনার দেখাও মেলে এদিকে সেদিকে।

সম্প্রতি ওর পরিবারে ওঠে এক ঝড়। পরিবার মানে একজোট হয়ে থাকা। ভালোবাসা, বন্ধন, মায়া মমতা।। সেরকম কিছুই অবশ্য ওর কোনোদিন ছিলোনা, মা ওকে কোনোদিনই ভালোবাসেনি। ওর গাত্রবর্ণ ঈষৎ ময়লা। তাই। বাবাও তেমন পছন্দ করেন নি।

ভাইয়েরাই বেশি আদর পেতো। ও তাতে কিছু মনে করতো না। ও হিংসুটে প্রকৃতির নয় একেবারেই। কিন্তু শেষদিকে ওর মা এমন ব্যবহার করতে শুরু করে যে অবস্থা চরমে পৌঁছায়। শেষে ওর পরিবারে ঘটে এক অঘটন। ওর ভাই পাশের বাড়ির এক মেয়েকে রেপ করে বসে। মেয়েটি মাত্র পনেরো। স্কুলের মেয়ে। পাড়ায় শোরগোল।

তৃণমূলের নেতারা ওদের বাড়ি ঘেরাও করে। মারধোর। ঝামেলা। দেয়ার স্বামী আহত।

উনি তখন ওখানে ছিলেন। ফিরে এসে অর্থাৎ ওদের পুনার বাড়িতে ফিরে ভদ্রলোক খুব চটে যান। ওর নাম জয়। জয়ের খুব রাগ হয় দেয়ার পরিবারের ওপরে। এরকম আনকালচার্ড পরিবার ওর আপন কেউ, নিজের এসব ভাবলে জয়ের ভীষণ মন কেমন করতো। ভালো লাগতো না। বুকের ভেতরে কষ্ট হত। একটা চাপা যন্ত্রণায় ফেটে যেতো কপালের দুইপাশ। ভেষজ চিকিৎসক ভার্গিজ বলেন : এই জগতে নানা মানুষ। আজকাল কে কি করবে কেউ জানে না। সিনেমা থিয়েটারে এত ক্রাইম, ভায়োলেন্স, সেক্স দেখায় মানুষ নানান কিছু করে। জিনিসগুলিকে সহজভাবে নাও। কি আর করবে! ওরা ওদের জার্নি তে আছে, তোমরা তোমাদের। দুটি পথ মিলছে না। সমান্তরাল পথ। চুকে গেলো। এইভাবেই ভাবো। কি আর করবে ?

মেয়েটির জন্যে দু:খ হয়, হওয়া স্বাভাবিক। কোনো গিল্ট ফিলিং রেখো না তোমরা। কি করতে পারো? কারো নেগেটিভ কাজের জন্যে তোমরা দায়ী নও।

এত কথার কথা। মনের ভাব ? জয়ের মনের ভাব ভিন্ন, তা বদল হবার নয়।

সে যেন দিন দিন দূরে সরে যেতে লাগলো। কথা কম, রাতে দেরিতে আসে। জন্মদিনে হুইশ করেনা। কথা বলে বেশির ভাগ সময় নোট লিখে কিংবা এস এম এসের মাধ্যমে।

দেয়ার সাথে ওর সম্পর্ক খুব ইন্টেন্স ছিলো কারণ দেয়া ভালোবাসতে জানে। যাকে মন দেয় তাকে সবটুকু দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু জয়ের মন আস্তে আস্তে যেন ছিন্ন হয়ে যায় ছিন্ন পত্রের মতন। শীতের ঝরাপাতা কিংবা মরাপাতার মতন। ধীরে ধীরে ফুলদানির সবগুলো ফুল শুকিয়ে ঝরে যায়। কেমন বাতাসহীন ঘর। দমবন্ধ পরিবেশ। পরিচিত রং বিবর্ণ, ফ্যাকাসে লাগে। ওদের ডাইভোর্স হয়ে যায়।

একটি ধর্ষণ। অন্য শহরে। অন্য গৃহে। অন্য কোণে। ভেঙে যায় ঘর তারই প্রকোপে এই শহরে। এমনই বিচিত্র এই মানবজমিন।

কেউ চড় মারলে তাকে অন্য গাল বাড়িয়ে দেবে – এই **পাওয়ার** যুদ্ধের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি । মার্টিন লুথার কিং অথবা মহাত্মা গান্ধীর হাতিয়ার তো ছিলো এই পাওয়ার । অনেকবার শুনেছিলো মাস্টারমশাই দীপক স্যারের কাছে । কিন্তু বাস্তব জীবনে তা মেনে চলা সত্যি কঠিন । কাজেই বিচ্ছেদ হয়েই গেলো । কারণ জয়ও তো সেই দীপক স্যারেরই ছাত্র । কয়েক বছরের সিনিয়র এই যা । কিন্তু সে তো ক্ষমার আলোয় ধুয়ে দিতে পারলো না ওর ভাইকে । বদলে ওকেই ছেড়ে চলে গেলো !

আজকাল লেখালেখিতেও মন বসেনা । ফেসবুক পেজ আপডেট করে আর টুইট করে ।

সেখানে দুই চার –কলি লেখা যায় । মনের কথা লেখে ফেসবুকে ।

কেন যেন মনে হয় ওর এই যে জীবন যন্ত্রণা তা কেউ যেন ভাগ করে নিতে চায় । কেউ যেন প্রতিটা টুইট খুব মন দিয়ে পড়ে । খেয়াল রাখে ওর প্রতিটি পদক্ষেপ । ব্যাথা, বেদনা, জ্বালা, দু:খ, কষ্ট । কেউ যেন ভাগ করে নিতে চায় । কিন্তু সে কে ?

কোথায় পাবে তাকে ?

আর জয়কে তো ও খুব ভালোবাসে । যদিও খাতায়পত্রে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে । ওরা আজ আলাদা । তবুও মনে মনে তো আজও সে জয়েরই । জয় কি ওকে ভালোবাসে ? হয়ত বাসে, হয়ত বাসেনা, ও জানে না । জানতে চায়না কারণ আজ জেনেও কোনো লাভ নেই ।

আচ্ছা একসাথে কি দুজনকে ভালোবাসা যায় ?

ওর সিক্রেট লাভার মানে যার কথা ওর মনে হয় আর এদিকে জয় --- দুজনকে কি ?? একটি নেশায় আসে এইসব পেজে । মন খুলে লেখে কিন্তু সেরকম কারো মেসেজ পায়না ।

একদিন শখ করেই ওর মোবাইল নম্বরটি দেয় ওখানে ।

কিন্তু অরণ্যে রোদন যাকে বলে ।

তার কিছুদিন পরে দু একটি কল আসে, সবই অচেনা মানুষ কিন্তু কাছের কেউ নয় যাকে ও খুঁজছে, চাইছে ।

সেদিন ফাগুন মাস।

ও থাকে লাট্রোবিয়া বলে একটি দেশে। বেশ বড় সড় দেশ। এখানে অক্টোবরে ফাগুন লাগে। আকাশে বসন্তের ছোঁয়া। লাল লাল শিমূল পলাশ। অচেনা ফুলের ঝাড়। নীল বেগুনি গোলাপি কতনা রং ও শোভা, মনেও রং লাগে।

একদিন গ্রিন টি পান করতে করতে মোবাইলে বেজে ওঠে সুর। গানের।

অচেনা নম্বর। বুকটা একটু কেঁপে ওঠে। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নেয় হ্যান্ড সেট টি।

সত্যি তো, অন্যদিকে পুরুষালি কণ্ঠস্বর।

: হ্যালো, আমার নাম মার্ক সেইন। আমি আপনার ফেসবুক পেজ থেকে নাম্বার পেয়ে।।।।

উত্তেজিত হয়না দেয়া, আলতো করে প্রতিনমস্কার জানায়। সাবধানে শুধায় – কেন কল করলেন হঠাৎ ?

- আমি আপনার লেখার বড় ফ্যান।

দেয়া হাসে। এরকম অনেক শুনেছে এই কয়বছরে।

স্তুতি। প্রেজ। আই অ্যাডমায়ার ইউ।

মার্ক সেইন বলেন : আমি আপনার সব টুইট গুলি পড়ি খুব মন দিয়ে। আমার আপনার সাথে দেখা করতে খুব ইচ্ছে হয়। আপনার কবিতার লাইন গুলি আমাকে ছুঁয়ে যায়। যদিও আপনি মানবতার কথা লেখেন তবুও মনে হয় এগুলি আমাকে কোথায় যেন খুব স্পর্শ করে।

মুগ্ধ হয়ে শোনে দেয়া।

মার্কের গলার স্বরটিও বেশ। ভারী। জলদ গম্ভীর।

- আচ্ছা আপনি যখন লাভ স্টোরি গুলি লেখেন তখন কি নিজেও ক্যারেক্টরের ভেতরে ডুবে যান ? চরিত্রগুলি এত জীবন্ত ! আপনি লাভকে অন্যভাবে ডিফাইন করেছেন। আমার খুব ভালোলাগে।

যেমন লিখেছিলেন না : আমি ষোড়শী যখন, শেরপাকে মন দিতে চাই, মাকালুর স্বর্ণচূড়ায় !

অসাধারণ !

দেয়া একটু হাসে । তারপরে বলে : হ্যাঁ, হৃদয়ে আকুলি বিকুলি করে বৈকি ।

তাই আমি এইসব গল্প খুব কম লিখি । আবার হাসে ও । বলে : প্রতিটি গল্প লেখার পরে যখন অন্য গল্প লিখি আগেরটি মনে হয় কাঁচা লেখা । সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন না যে আগের তৈরি সিনেমাগুলি মানে ওঁর নিজের দেখলে মনে হয় এগুলি কি বানিয়েছিলাম ?

মার্কও হাসেন । তারপরে বলেন : চেঞ্জ ও প্রগ্রেস এইদুটির নামই তো লাইফ ।

তারপর আরো কিছু কথা হয় । উনি দেখা করতে বলেন না।

বরং বলেন আবার ফোন করবেন ।

দেয়া ছোট্ট করে হ্যাঁ বলে ফোন রেখে দেয় ।

সেদিন সারাদিন খুব ভালো কাটে ।

ফুরফুর করে সব । মন প্রাণ । দেয়া এখনও insane হয়নি !! যদিও পাগলপারা সব।

বসন্ত চারদিকে । ফাগুন । অচেনা মানুষের কয়েকটি কথা কেমন বদলে দিলো সব ।

বিকেলে বাড়ির কাছে ক্লিনিকে গেলো কিছু ওষুধ কিনতে । দেখলো একজন নতুন চিকিৎসক বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছেন । কম বয়সী । ভারতীয় । আকাশও আজ মায়াবী ।

এরপরে কিছুদিন ও টুইট করেনা । ফেসবুকও আপডেট করেনা ইচ্ছে করেই । কদিন পরেই আসে মার্ক সেইনের ফোন ।

- কি ব্যাপার ? পেজ আপডেট হচ্ছে না, সব ভালো তো ?

- হ্যাঁ, মিষ্টি হেসে জানায় দেয়া । বলে, আসলে একটু ব্যস্ত ছিলাম ব্যক্তিগত কারণে ।
- ও আচ্ছা আমি ভাবলাম আবার কোনো অসুবিধে হল কিনা । আপনার যদি কোনো অসুবিধে না হয় আমরা কি দেখা করে কথা বলতে পারি ? আমার অনেক লেখা ভালোলাগে সেগুলি আপনাকে জানাতে চাই । যদি খুব অসুবিধে না হয় !

দেয়া যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো । যদিও ও জানে না মার্কের বয়স কত, কী করেন, ঠিক কোথায় আছেন উনি ।

ও মত দিলে উনি জানান যে উনিও এই দেশেই বাস করেন এবং পাশের শহরে ।

সময় স্থির করে দুজনে একদিন এক বসন্তে দেখা করতে রাজি হয় ।

দেয়ার বান্ধবী স্টেফির আছে এক চুল ছাঁটার অত্যাধুনিক দোকান । সেই দোকান দোতলা । তার ওপরের তলায় একটি ছোট কফিশপ । সেখানে দেখা করে মার্ক ও দেয়া । বড় বড় কাচের জানালা । উঁচু নিচু রাস্তা । সার বেঁধে চলেছে মানুষজন, হলুদ, কালো, সোনালী, বাদামী ।

দূরে পাহাড়ে রং লেগেছে । নীল রং । আকাশ স্বচ্ছ । মিষ্টি মেয়ে লিয়া ফ্যারো দিয়ে গেলো টুনা স্যালাদ ও কফি । মার্ক নিলেন ভেজ বার্গার ও টি । আর আলুভাজা ।

মার্কের চোখ নীল । রং সাদা । পদবী থেকে বোঝা যায় উনি ভারতীয় । মা মেমসাহেব । বাবা বাঙালি । বহুবছর এখানে আছেন । জন্ম এখানেই । বাবা এসেছিলেন পড়তে । ইঞ্জিনীয়ারিং । তারপরে কাজ নেন মাইনে । বিয়ে করেন ওর মা কে । কিন্তু সাহেব সমাজে ওরা ব্রাত্য হয় । ভারতীয় বলে । মার্ক ও ইঞ্জিনীয়ারিং এর ডিপ্লোমা করেন । শর্ট কোর্স । ২ বছরের Robotics and mechatronics । কবিতা লিখতেন ইংলিশে । ভালো আবৃত্তি করতেন । বাবা ওকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত, সংস্কৃতি সব শিখিয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথ ।

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া ----

আবৃত্তি করেও শোনালেন।

মার্ক কে দেখতেও বেশ। মন্দ নয়। মাঝারি উচ্চতা। রং খুব ফর্সা। ঈষৎ বাদামী চুল। থুতনিতে দুই ভাগ। চোয়াল কঠিন।

রিস্ট চওড়া। লোমশ বুক। পাতলা ঠোঁট। অনেকটা আমাদের দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের নবনিযুক্ত গভর্নর রঘুরাম রাজনের মতন দেখতে।

গোঁফ নেই।

দেয়াকে দেখতেও মন্দ নয়। বয়স হলেও বোঝা যায়না। মনে হয় ৩২/৩৩।

রং একটু ময়লার দিকে। তবে উজ্জ্বল। গমের মতন।

চোখ মুখ খুব সুন্দর। বিশেষ করে চোখ জোড়া খুব এক্সপ্রেসিভ। ওর ভিনাস এইটথ হাউজে প্লেসড। তাই পরকিয়ার যোগ ছিলো। কিন্তু এতো পরকিয়া নয়!

কফির খালি কাপ ভরে দিলেন মার্ক। নিজে চা নিলেন। বাইরের দিকে চেয়ে বলেন : আজ দিনটা খুব ব্রাইট। আপনি খুব ব্রাইট রং ভালোবাসেন তাই না?

আপনার ওয়েবজিনেও দেখেছি খুব ব্রাইট রং ইউজ করেন।

- হ্যাঁ। আমি উজ্জ্বল রং ভালোবাসি। দেয়া আজ উজ্জ্বল জামা পরেছে। টুপি পরেছে ব্রাইট কালারের কারণ ওর মাথার চুল খুব ছোট। প্রায় নেই। কদমছাঁট যাকে বলে।

মার্ক পরেছেন গাঢ় সবুজ, ডীপ গ্রিন। আর সাদা।

এইভাবে চলে আলাপন বেশ কিছুকাল। মার্ক সেইন ও দেয়ার।

কিন্তু মেয়েটি জানেনা উনি ঠিক কি করেন। ভাবে যে sureshot টেকি হবেন।

পড়াশোনা তো ওসব নিয়েই।

আলাপ বেড়ে হয় প্রলাপ। তারপর তা পরিণত হয় প্রেমে।

পরিণত বয়সের প্রেমে। কিন্তু প্রেমকে সময় দেওয়া, রিলেশানশিপকে সময় দেওয়া, মর্যাদা দেওয়া যেন হয়ে ওঠেনা মার্কের। সাহায্যের হাত সব সময় বাড়িয়ে দেন, আছেন ফোনের বিভায়, ফেসবুক, টুইটারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে যেন আসতে চান না তেমন। প্রেমের কবিতা লিখে পাঠান ইংলিশে। ছুঁয়ে যায় দেয়াকে।

দেয়া ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না কিন্তু নিরুপায়। উনি ধরা দেবেন না।

কেন ? উনি কি বিবাহিত ? সংসারি ? হতেও পারে। হ্যান্ডসাম। ভালো কাজ করেন নির্ঘাত টেকি যখন।

দেয়া হয়ত ওর ক্রাশ। লেখিকা হিসেবে শ্রদ্ধা করেন, অ্যাডমায়ার করেন তাই আসেন ভার্চুয়াল বিভায়।

রিয়ালিটিতে নন।

অবশ্য দেখা করেন মাঝে মাঝে।

একদিন দেয়া খুলে বললো।

মন খুলেই বললো। স্টেফির কফিশপে। ইতিমধ্যে ওখানেই কয়েকবার দেখা হয়েছে।

আপনি থেকে তুমিতে এসেছে সম্পর্ক।

বললো : তোমাকে ছেড়ে আর থাকা যাচ্ছেনা মার্ক।

বয়সে উনি বেশ কিছুটা বড়। তা আট বছর হবে। দেয়ার ডাইভোর্স হয়েছে উনি জানেন। কারণটিও। উনি অবাক। বলেন : কারণটা অবৈধ।

এটা কোনো কারণ হওয়া উচিৎ নয়। মার্কের কোমল হৃদয়ের পরিচয় আবার পায় দেয়া। বহুবার পেয়েছে আগে, কবিতা পাঠের সময়, লেখার সময়।

দেয়া মনে মনে বলে : ভাগ্যিস হয়েছিলো !

মার্ক প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। কিন্তু দেয়া নাছোড় বান্দা।

- না না তোমাকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারছি না মার্ক ।
- আমি কি করি তুমি তো জানো না ।
- তাতে কি ? তোমার খুব বিজি স্কেডিউল ?
- ইয়েস।
- আমি মানিয়ে নেবো। ঘ্যান ঘ্যান করবো না । নালিশ করবো না ।
- তোমার ভালো নাও লাগতে পারে ।
- কেন ?
- আজব পেশা ।
- কি শুনি ।
- সত্যি শুনতে চাও ।
- হ্যাঁ । আমি কি জোক করছি নাকি ?
- সিরিয়াস ?
- ইয়েস ম্যান ।
- সহ্য করতে পারবে ? আজ পর্যন্ত আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড হয়নি পেশার জন্য ।
- সে কি ! কেন ? কি এমন করো তুমি ? অনেক রাত হয় বুঝি ফিরতে ?
- আমি মানুষ মারি । আই অ্যাম আ কিলার !

জলদ গম্ভীর কন্ঠস্বর ভেসে আসে মার্ক সেইনের ।

দেয়া নির্বাক ।

মার্ক আবার বলে ওঠেন : আমি একজন পেশাদার executor ---

জল্লাদ বলা যায় কি ?

আমি খুনের আসামীদের ফাঁসি দিই অথবা গলা কেটে কিংবা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে পরপাড়ে পাঠাই। কত মানুষের অভিশাপে আমার চেতনা কলুষিত। আমার সাথে জীবনকে জড়িয়ে কি লাভ দেয়া ?

দেয়া বিস্ফোরিত নেত্রে চেয়ে আছে মার্কের দিকে। এরকম কিছু সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

এরকম এক অফ-বিট চরিত্র যে তারই প্রেমাস্পদ হবেন কোনোদিন সে ভাবতেও পারেনি। গল্পে চিরটাকালই সে ভিন্নজাতের মানুষের ছবি আঁকে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এরকম একজনের সাথে দেখা হবে ভাবেনি।

মার্ক বলে ওঠেন : আমার বাবা ও আমাকে এই বিদেশী সমাজ মানে আমার মামাবাড়ির লোকেরা একঘরে করে চামড়ার জন্য। মাকেও গালি দিতো। ডার্টি ইন্ডিয়ানকে বিয়ে করেছেন বলে। খুব কষ্ট পেতাম আমি। শেষে টেকির কাজ না করে এই লাইন ধরি। সমাজের ডার্ট সাফ করার ব্রত নিই। আমি তো ডার্টি। আমিই করি না কেন এই কাজ, কি বলো দেয়া ?

তুমি তো মেঘ, ঘন কৃষ্ণ, লর্ড কৃষ্ণার মতন, ভারতের ভাষায় সুপ্রিম কনশাসনেস উনি যিনি অর্জুনকে বলেছেন গীতায় যে কাজ করে যাও ফলের কথা ভেবো না। আমিও কাজ করে যাই অন্য কিছু নিয়ে ভাবি না। খুব টেনশান হয় মানুষ মারতে। কিন্তু ঐ যে মা ফলেষু কদাচন। আমি আইনের কাজ করছি। প্রথম যেদিন মানুষ মারি সারারাত ঘুমাতে পারিনি।

সেটা ছিলো ইলেকট্রিক চেয়ার। প্রকোষ্ঠ বন্ধ করে বোতাম টিপতেই মানুষ পোড়া গন্ধে বমনের উদ্রেক হল। কিন্তু যাবার উপায় নেই। শেষ না হওয়া অবধি। সারারাত নিদারুণ কষ্টে কাটলো। বস দুদিন ছুটি দিলেন।

তারপর আবার সমাজের নোংরা সাফ।

পুলিশ, সৈনিক, আমরা সবাই যারা ডার্ট ক্লিন করি আর তোমরা আনন্দে ঘুমাও -----দেয়া আমরা বোধহয় সারা জীবনে ভালো করে শুতে পারিনা !

কতদিন ঘুমাই নি দেয়া। আরামের ঘুম।

উদাস হয়ে যায় মার্কের চোখ জোড়া। নীল চোখ। গভীর চোখ। ওর মা ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। সাইকোলজির।

বলেন : মা বলতেন মানুষের মনের চেয়ে বড় রহস্য আর কিছুতে নেই। আজ বুঝি সে কথা।

বাইরে আমি খুশি অন্তরে কত বেদনা আমার। তোমাকে ভালোবাসি কিন্তু নিবেদন করতে ভয় হয়। পাবো জেনেও হাত বাড়াতে সঙ্কোচ হয়।

মার্কের চোখে কুয়াশা। কুহেলি নেই একটুও।

সফেদ কুয়াশা।

দেয়া অনুসন্ধানী।

- আমি প্রেমে রহস্য ভালোবাসি। টেক ইওর টাইম। ভেবে দেখো। আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। এইভাবে কাউকে কোনদিন বলিনি। যাকে বিয়ে করেছিলাম তাকেও না।
- দেয়া আমি দু:খিত। এই টাফ লাইফে তোমাকে টেনে আনার কোনো মানে হয়না। থাকো না শুধু কবিতায়, গানে, গদ্যে। উচ্চাঙ্গের আরাধনায়।

তুমি কি জানো আমাদের executor দের জন্য আলাদা সমাধিস্থল নির্মিত হয়!

সাধারণ মানুষ আমাদের অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেন না তাই ওদের সমাধিস্থলে আমরা অনাহুত। যদিও আমার বাবা ছিলেন ভারতীয় কিন্তু আমি মায়ের মতন খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহন করি। আমার মাতামহ বলতেন : ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি আ খ্রিস্টান টু লাভ যিসাস। তবুও আমি এই ধর্ম গ্রহন করি।

আগে বন্ধুদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতাম আমার পেশা। পরে বলতে শুরু করলে ওরা পালাতে শুরু করে আমার কাছ থেকে!

আমি হরিজন । সমাজের জঞ্জাল সাফ করা আমার কাজ । প্রতিবার কোতল করার আগে গডের কাছে আমি একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করে নিই । ক্ষমাভিক্ষা করে নিই যে আমি একটি প্রাণী হত্যা করছি তার দায় থেকে ঈশ্বর যেন আমাকে মুক্ত করেন ।

জুডিশিয়ারি আমাদের যথেষ্ট পাওয়ার দিয়েছেন এই মর্মে কাগজপত্র ও সই -সাবুদ থাকলেও মনের দিক থেকে আমরা খুব দূর্বল । প্রতিবার এক একটি মানব হত্যার দায় যে আমাদের ওপরেই বর্তায় । আইনের ওপরে আমাদের পুর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধা আছে । যেসব খুনীদের আমরা পরপাড়ে পাঠাই তারা দূর্ধর্ষ । যেমন একটি লোক এক ৭০ এর বৃদ্ধাকে কুপিয়ে মারে । এক মা তার সন্তানকে মাথা পিষে মারে । এদেরকে আমরা মৃত্যু সাজা দিই বিবেক আমাদের সাফ কিন্তু তবুও কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে থাকে । গোটা মানুষ একের পর এক মেরে যাওয়া, SANE MIND এ।

তোমার কবিতা এরপরে আমাকে স্নিগ্ধতার পরশ দেয় ও বেঁচে থাকার রসদ যোগায় । ঐ যে লিখেছিলে না :

বার্চ বনের পদতল থেকে

সন্ধ্যেটা কুড়িয়ে নিয়ে

আ-মি তারায় তারায় ঘুরে বেড়াই ।

কত গ্রহ, নক্ষত্র, উল্কাপথ-অচেনা ভুবন ---!

কিংবা ঐ কবিতার কলিগুলি :

আমার ছায়া আমার থেকেও লম্বা !

আমি দার্শনিকের ছায়ায় বাঁচি । কাফকার ছায়ার হাতলম্বা,

ধরে ফেলে আমায় যখন জয়পুরের গোলাপী রাজপ্রাসাদে

মেখলা পরে গর্বা নাচি ।

মার্কের মনে দেয়ার ভাইকে নিয়ে কোনো উদ্বেগ, আবেগ কিংবা ঘৃণা নেই ।

সে দিবারাত্রি এইধরণের মানুষদের নিয়েই কারবার করে ।

এরাই তার চারপাশে।

তাই বুঝি বলেন : ক্ষমা করা সহজ নয়। অনেকে বলেন যে আমি ক্ষমা করতে পারি কিন্তু মনে মনে পোষণ করেন ঘৃণা । বাহ্যিক ভাবে লোকদেখানো মহত্ত্ব –তাতে লাভ কি ? কেউ প্রকৃতভাবে যদি নিজেকে শুদ্ধ করতে ব্রতী হয় তাকে ক্ষমা করা চলে তবে তাকেও তার দোষ ত্রুটি ইগোকে কমিয়ে নর্মালে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে হবে।

দুই পক্ষের সমবেত চেষ্টায় ক্ষমা প্রকট হবে। কি বলো ? তোমার লেখক মন কি বলে ?

দেয়া নীরব। মার্ক ভারি সুন্দর কথা বলেন। ভাবতে বা কল্পনা করতে কষ্ট হয় যে এই মানুষ হরিণবাড়ির (জেল) ভেতরে হয়ে ওঠেন executor—

সেদিন বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। গভীর রাতে একগ্লাস রেড ওয়াইন নিয়ে বসে দেয়া। মাঝে মাঝে মদ্যাপন করে সে। খুব কম। ঘুমটা ভালো হবে।

ইউফোরিয়া –

যদিও মার্ক সেইন তার জীবনে আসাতে ইউফোরিয়া শুরু হয়েছে বেশ ভালই। ভিনাস তার এইটথ হাউজে। পরকিয়ার সম্ভবনা ছিলো। হৃদয় উথাল পাতাল করা ভালোবাসা। রোমান্স। আই ডিজায়ার ইউ ! প্যাশনেট কিস !

সিক্রেট অ্যাডমায়ারার।

মার্ক সেইন। রঘুরাম রাজনের মতন দেখতে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের নবনির্বাচিত গভর্নর । মার্ক সেইন টাফ গাই । মানুষ মারেন । জুডিশিয়ারির সাপোর্টে। হাতে আইনি কাগজ।

দরজা--- এত রাতে ঠক্ঠক্ ?

জোরে জোরে ?

কলিং বেল বাজায় না কেন ?

কে কে –কে ?

দেয়া উঠে যায় ।

বাইরে অসময়ের বৃষ্টি ।

কালো রেনকোট পরা কেউ এসেছেন ।

দরজা খুলতেই ওর ঠোঁট জোড়ায় প্যাশনেট কিস । যার জন্যে ও জন্ম জন্মান্তর ধরে ঘুরতে পারে নানান গ্যালাক্সি ও মিল্কি ওয়ে ।

অস্ফুটে শুধু বলতে পারলো :

কিস মি মার্ক কিস মি ----

অবৈধ কর্ম বলে সমাজে পরিচিত executor পেলো অবশেষে হয়ত নীড়ের পরশ, বহু দূরে এক শহরে হয়ে যাওয়া একটি ধর্ষণ ভেঙে দিয়েছিলো ঘর, এক নারীর –আজ সেই অবলা, নিরাপরাধ যে অবৈধ ছিলো নিজ পতির আশ্রয়ে–সেও কি তবে খুঁজে পেলো এক বৈধ আশ্রয় ??

বাঘিনী

ব্যাঙ্গালোর থেকে মুদুমলাই জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলাম বেড়াতে । ইচ্ছে ছিল বন্দীপুর মুদুমলাইতে থেকে অরণ্যের শোভা দেখবো । উঠেছিলাম বনবাংলোয় । জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে বাঘিনীর দেখা পেলাম না । ক্ষুণ হলাম । এতদূর থেকে এসেছি । আমাদের গাইড খোলা জীপে করে ফেরার সময় শোনাচ্ছিলেন তার দেখা অন্যান্য জঙ্গলে বাঘের গল্প, বাঘিনীর স্নেহের গল্প । মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম । বলছিলেন, বাঘিনী জানোয়ার হলেও ওদেরও নরম, কোমল মন হয় । ওরাও ভালোবাসতে জানে ।

কয়েক দিন কাটিয়ে হৈ হল্লা শেষে যখন ফেরার পালা তখন আমাদের গাড়ির ড্রাইভার হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে লোকাল হাসপাতালে ভর্তি হল ।

কি করা ? গাড়ি রেখে আসতে হবে । বাংলোর মালিক সাজেস্ট করলেন : আপনারা গাড়ি রেখে ফিরে যান, ও সুস্থ হলে নিয়ে যাবে । এখন একটা Yellow board --ট্র্যাভেলসের গাড়ি বুক করে ফিরে যান ।

কিন্তু ছোট জায়গা তার ওপর এই সময় দক্ষিণীদের কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলে ।

কাজেই গাড়ি পাওয়া একটু মুশকিল হয়ে গেলো । চিন্তায় পড়ে গেলাম ।কারণ আমাদের ফেরাটা জরুরি, বিশেষ কাজ আছে তাছাড়া একজন নিকট আত্মীয় আসছেন কলকাতা থেকে তাকে পিক আপ করতে যেতে হবে ।

ইষ্টনাম জপতে জপতেই একটি গাড়ি বন্দোবস্ত হয়ে গেলো । একটি টয়োটা কোয়ালিস । জানা গেল সকাল নটায় আসবে । আমরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম ।

সকাল ঠিক নটায় এসে গেলো রূপালি রঙের গাড়িটি । পরিষ্কার, চকচকে । ওয়েল মেন্টেন্ড । বোঝা গেলো চালক যথেষ্ট যত্নবান । যেটা গাড়িতে ওঠার আগের মূহুর্তে বুঝলাম সেটা হল যে চালক একজন নারী । মহিলা চালক অর্থাৎ চালিকা ।

আগে ইয়োলো বোর্ডে মহিলা চালিকা দেখিনি বলেই যেন বেশ বিস্মিত হলাম।

দেখতেও অন্যরকম, সুন্দরী তো বটেই অনেকটা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মতন দেখতে। সেই রকম আকর্ষক ওষ্ঠ। সেরকম চাউনি, একঢাল চুল, ঈষৎ বাদামী।

জানলাম আমাদের ব্যাঙ্গালোর অবধি ইনিই সারথী।

বেশ মনটা ফুরফুরে হয়ে গেলো। কারণ এর আগে মহিলা চালিকার গাড়িতে বসিনি তায় এরকম অসাধারণ সুন্দরী চালিকা।

বেশ আনন্দেই চড়ে বসলাম বামদিকে সামনের সীটে। সামনে বসলে পুরোটা রাস্তা বেশ ভালো দেখা যায় তাই আমি সাধারণত সামনেই বসি।

কোয়ালিস উড়ে চললো বুনো পথে, হরিণের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই।

সিডিতে বাজছে মৃদু য়্যানির কম্পোজিশান : ওয়ান ম্যানস্ ড্রিম।

অনেকটা পথ গিয়ে একটি আধা শহরে দাঁড়ালাম। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য।

শহরের ঘিঞ্জির মধ্যে একটি কাঠগোলা। বড় বড় শাল ও ইউক্যালিপটাস মোড়া, ভেতরে কাঠের গুড়ি রাখা, স্তুপ করে কাঠ চেরাই করে রাখা। একপাশে কাঠের সঙ্গে সামান্য খাবারের ব্যবস্থা। কয়েকটি খাটিয়া পাতা।

ভাত, ডাল, সবজি, দই ইত্যাদি মেলে। ভেজিটেরিয়ান। আমার অর্ডার দিয়ে বসলাম। মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ডেকে নিয়ে এলাম। বললাম – তুমি খাবে না ?

ও হেসে বললো– আমি খুব কম খাই। দিনে ভাত খাই না। দেখি একটু চা পাউরুটি খেয়ে নেবো।

খুব অবাক লাগলো। এরকম হাড়ভাঙা খাটুনি অথচ খায় এত কম ?

বললাম– তোমার পরিশ্রম হয় শরীরের তো খাবার দরকার।

ও পাল্টা হেসে বললো : আমার অল্প খেলেই পেট ভরে যায়। আমার অল্প খাওয়াই অভ্যাস।

আমিও কম অবাক হইনি। কারণ একে এর চেহারা দক্ষিণীদের মতন নয়। তায় আবার এত কম খাচ্ছে।

কথা হচ্ছিল হিন্দী ইংলিশে। এবার ও বাংলা বললো।

বললো – আমি বাঙালী, আমার নাম আমি পাল্টে বাঘিনী করে নিয়েছি, এরা বলে ভাঘিনি।

আমিও কম অবাক হইনি। বললাম – তুমি বাঙালী আগে বলনি তো ! আর এরকম অদ্ভুত নাম কেন নিয়েছো ?

ও বললো– আপনারা বাঙালী বলেই আমি এসেছিলাম। সাহায্য করতে।

আমি কলকাতার মেয়ে। এই নাম নেওয়া নিজেকে এক হিংস্র সত্তা রূপে লোকসমাজে প্রচার করার জন্য। যদিও এরা বাঘিনি মানে কী বোঝে আমি জনিনা।

আরো অবাক হলাম, কলকাতার মেয়ে এখানে ট্র্যাভেলসের গাড়ি চালাচ্ছে ? তাও ব্যাঙ্গালোর থেকে এতদূরে ? কেমন যেন গল্পের গন্ধ আসছে !

ইতিমধ্যে ওরা খাবারের আয়োজন করেছে। পরিষ্কার টেবিল, আসলে কাঠের কয়েকটা গুড়ি কোনটা টেবিল কোনটা চেয়ার। তারই ওপরে পরিপাটি করে ভাত, ডাল, বিটের সবজি, ক্যাপসিকামের চচ্চড়ি এসব দেওয়া, থালা অবশ্যই কলাপাতা। চারপাশে সবুজ সবুজ গন্ধ। গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি না থাকলেও ছায়াঘন এই অংশ বড়ই উজ্জ্বল।

আমরা খেতে বসলাম। খাওয়া হয়ে গেলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। হাতটাত ধুয়ে

একটু পান খেয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেবার জন্য খাটিয়াতে বসা হল। মেয়েটি যার নাম বাঘিনী কিংবা ভাগিনি সে চা খেয়ে নিয়েছে কিছু স্ন্যাকস্ সহকারে।

দেখে মনে হল ও এখানে প্রায়ই খায়।

আমিও গল্পের সন্ধানে জমিয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ এটা সেটা বলার পরে উল্টোদিকের একটা ওষুধের দোকানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ও বললো – জানেন আমার বাবাও ডাক্তার ছিলেন। আই স্পেশালিস্ট!

চমকে উঠলাম, মেয়ে বলে কি? ভুল শুনছি না তো? ও মিথ্যা বলছে না তো?

আমার শহুরে কলুষিত মন যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সহজ এই সত্য ভাষণ। খানিকটা অসতর্কতায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো – তাহলে তুমি এই পেশায়?

মেয়েটি ক্ষীণ হাসলো, বড় বেদনাময় সেই হাসি। তারপর মাটির দিকে চেয়ে শুকনো পাতাগুলো পা দিয়ে নড়াচড়া করতে করতে বলে উঠলো : সে এক লম্বা কাহিনি।

কলকাতার উপকণ্ঠে বাস করতেন এক চোখের ডাক্তার। সাংসারিক জীবনে ছিলেন ভীষণ কড়া ধাতের মানুষ। মেয়েকে বাড়ি থেকে একপাও বেরোতে দিতেন না। বারো ক্লাশে পর্যন্ত মা স্কুলে পৌছে দিয়ে আসতেন। সেই মেয়ে কলেজে উঠে এক পত্রবন্ধুর প্রেমে পড়লো। ছেলেটি ঘন কালো। সে সুদূর অ্যাফ্রিকা থেকে লাক্ষ্মৌ তে পড়তে এসেছিলো, তার নাম জেসন। একটি পত্রবন্ধুর ম্যাগাজিনে ওর সন্ধান পায় মেয়েটি। প্রেম জমে ওঠে।

কুচকুচে কালো ছেলেটির নিমেষেই ভালোলেগে গিয়েছিলো আমাদের অ্যাঞ্জেলিনা জোলির লুক আলাইককে। তারপর একদিন সে কলকাতা এলো। প্রেম জমে উঠলো।

ওর হোটেলের ঘরে শরীরের খেলায় মেতে উঠলো দুজনে এবং একদিন মেয়েটি জানলো সে অন্ত:সত্তা। বাড়িতে জানালে মার খাবে তাই বাড়ি ছাড়তে হল।

দুজনে পালিয়ে গেলো ব্যাঙ্গালোরে। সেখানে জেসনের এক বন্ধু পড়তো ও তার দাদা থাকতেন স্ত্রী পুত্র নিয়ে। জেসন মেয়েটিকে নিয়ে ওদের কাছে এলো এবং এক সুন্দর সকালে চার্চে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেললো। তারপর

কাজ নিলো। হোটেলে। চলতে লাগলো দিনগত পাপক্ষয়। কিন্তু বিধির বিধান কে খন্ডাবে ? মেয়েটির একদিন ফুটপাথে পড়ে গিয়ে গর্ভপাত হয়ে গেলো।

প্রথম সন্তান হারানোর দু:খ প্রবল হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে ছেলেটি হোটেলে এক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করতে সক্ষম হয় যিনি এইডস্ সংক্রান্ত কাজ করে বেশ নাম করেছেন। ছেলেটি বায়োলজির ছাত্র ছিল সে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হয়। যোগাযোগ বাড়তে থাকে ও একদিন সে ডাক্তারের ল্যাবে যোগ দেয় গবেষণার জন্য। ওরা গবেষণা করে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে যাতে করে লেজার ব্যবহার করে এইডস্ জীবানুকে ট্র্যাপ করা যায়। এইসব গবেষণা চলাকালীন নিজ মেধার জন্য জেসন অনেকের ঈর্ষার কারণ হয় বিশেষ করে সে ছিল ডাক্তারের স্নেহ ভাজন ও প্রথাগত ডিগ্রী তার ছিলনা। প্রথমে কটুক্তি তারপরে নিগ্রো বলে ব্যাঙ্গ করা –গায়ের চামড়া নিয়ে ঠাট্টা তামাশা এবং ওর গায়ে কেটে গেলে কালো রক্ত বেরোবে বলে বিদ্রুপ করা তাতেও কাজ হলনা দেখে শারীরিক নির্যাতন। লোক ভাড়া করে মারধোর দেওয়ানো। লোকাল থানায় অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি।

এরপরে একদিন জেসনকে তার ল্যাবের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। খাবারে বিষপ্রয়োগ। এবং অদ্ভুত ব্যাপার। অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে একটি বাঁদর ঘরে ঢুকে খাবারে বিষ ঢেলে দিয়ে গিয়েছিলো। খোঁজ খবর করে জানা যায় যে সে একটি লোকের কাছে খেলা দেখাতো এবং পরে কোন কারণে লোকটি তাকে ছেড়ে দেয়। ল্যাবের আরেকজন গবেষক ঐ বাঁদরটাকে যোগাড় করে ট্রেনিং দিয়ে বিষপ্রয়োগ করে। বাঘিনি অর্থাৎ আমাদের অ্যাঞ্জেলিনা এই পর্যন্ত বলে একটু থামলো।

কি যেন ভাবছে সে। দুপুরের আকাশে প্রচন্ড ঝাঁঝালো রোদ। তারপর বললো:

চলুন যাওয়া যাক বাকিটা যেতে যেতে বলবো।

ততক্ষণে আমাদের আবার যাত্রা শুরুর সময়, যে যার জায়গায় গিয়ে বসা হল।

গাড়ি ছুটে চললো মেঠোপথ দিয়ে। কোথাও কোথাও ভাঙা রাস্তা। নিপুন হাতে গাড়ি চালানোতে আমাদের কিন্তু একটুও কষ্ট হচ্ছিলো না। ভাবছিলাম মেয়েটি এত দক্ষ চালক হল কীভাবে?

পথ পেরিয়ে চলেছি হু হু করে। পাশের গাছপালা, কাঁচাঘর বাড়ি পেরিয়ে এসে থামলাম আরেক আধা শহরে। প্রাণটা চা চা করছিল।

একটা ঝুপড়ির পাশে এসে দাঁড়ালাম। এতক্ষণে বাঘিনী কথা বললো।

বললো– শেষটা শুনবেন না?

আমি মাথা নাড়লাম। ওর কপালে এসে একরাশ চুল পড়ছিল ও হাতে দিয়ে সরিয়ে নিলো।

জেসনের মৃত্যুর পরে ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিছুদিন ওর যেখান থেকে বিয়ে হয়েছিল সেই জেসনের বন্ধুর দাদার পরিবারের সঙ্গে থাকে। কিন্তু কতদিন?

আর ব্যাঙ্গালোরের চারিদিকে জেসনের স্মৃতি ওকে তাড়িয়ে বেড়াতো।

ভাবলো একবার কলকাতা ফিরে যাবে। কিন্তু সেগুড়েও বালি। আর ও তো বি-এ টাও কমপ্লিট করেনি তাই কেই বা এই বাজারে ওকে চাকরি দেবে সেজন্য অবশেষে ঠিক করলো ও ড্রাইভারি করবে আর তাতে ভালই পয়সা পাবে। বাড়ির গাড়ি ছিল কলকাতায়। ওর বাবার পুরনো মডেলের হন্ডা সিটি। সেটা ও চালাতেও শিখেছিল। কলকাতার রাস্তায় যখন গাড়ি চালাতে পারছে তখন অন্য জায়গায় ও পারা উচিৎ, কাজেই ও ট্র্যাভেলসের গাড়ি চালানোর চাকরির দরখাস্ত দিলো। আর ইয়েলো বোর্ডের গাড়ি চালানো মানেই দুর দুরান্তে ছুটে বেড়ানো। স্মৃতির শহর থেকে অনেক দূরে। বুকের গভীর ক্ষতর ওপরে একটা প্রলেপ পড়বে।

চাকরিটা হয়ে গেলো অসাধারণ গাড়ি চালানো জানার জন্য। প্রথমে অবশ্যই ওকে লোকাল গাড়ির ড্রাইভারি দিলো পরে হাইওয়ে ড্রাইভ।

লোকাল গাড়ি চালনোর সময় গভীর রাতের বেলা কতনা আজব কান্ড কারখানা দেখতে পেতো। খবরের কাগজে যাদের বড় মানুষ বলে ছবি আসে তারা গভীর রাতে উলঙ্গ হয়ে আকন্ঠ মদ্যপান করে রাস্তায় ছোটাছুটি

করছেন অথবা বিখ্যাত মহিলা হয়ত কারো ক্ষুধার্ত স্ত্রী তার সুবিশাল গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন কোন জিগোলোকে। যে আমাদের চেনা কোন সুভদ্র যুবক । প্রচন্ড নাস্তিক লেখকের পুত্রের কল্যাণে পুজো দিতে ঢোকা মন্দিরের গর্ভগৃহে, সাধ্বী সমাজসেবিকার গেরুয়ার আড়ালে বেরিয়ে পরা ক্লিভেজে হস্ত সঞ্চালন করছেন তার গডফাদার আরেক নামী স্বামীজি ।

গভীর রাতে হাইওয়েতে আলস্যের জন্য লরির ব্রেক ইচ্ছে করে না চিপে লোক মারা আর পরের দিন বলা যে লোকটি রাস্তার মাঝখানে বসে ছিল হর্ণ শুনেও নড়েনি ।

মানুষের মুখোশ খুলে যাচ্ছে চাপ চাপ অন্ধকারে ।

শুরু হল আরেক জীবন ।

ইতিমধ্যে সুন্দরী বলে যা হতে পারে তাও হল । ওর মালিক ওকে কুপ্রস্তাব দিলেন । মাইনে দেবার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে গায়ে হাত । কিন্তু বাঘিনী কি এত সহজে দমবার পাত্রী ?

সে দমলো না ।

- আমাকে তো এই নিষ্ঠুর দুনিয়ায় বাঁচতে হবে তাই না ?

প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সে আমার দিকে ।

চায়ের ভাড় প্রায় শুন্য । আমি আরেক ভাড় অর্ডার দিই । সঙ্গে গরম গরম আলুর চিপস্ । ও এক মুঠো নিলো আমার থেকে । আমার কর্ত্তা আর আরেকজন ছেলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথোপথন চালাচ্ছে । মনে হল ক্রিকেট স্কোর নিয়ে ।

বাঘিনীর স্বর কর্কশ নয়, হাওয়ায় ভেসে আসে কথামালা ।

- আমি একটা ডিল করলাম । ওর স্ত্রী থাকেন গ্রামে । আমি ওকে সঙ্গ দেবো দেহের এবং মনের কিন্তু ওর সন্তানের মা হবোনা কিংবা গাড়ির ড্রাইভারি ছাড়বো না । ও রাজি হল । আমরা একসঙ্গে ছুটি কাটাতে যাই কিছুদিন কিছু নিভৃত মুহূর্ত কাটিয়ে ফিরে আসি দৈনন্দিন জীবনে । তাছাড়া স্মৃতি আঁকড়ে আর কতদিন বাঁচা যায় বলুন ? আজ আমাদের এই ট্র্যাভেলস্ কোম্পানির অর্ধেক মালিকানা আমার ।

আমাদের অনেক জায়গায় অফিস আছে । মুদুমালাই এর কাছে একটা আছে সেখান থেকেই আপনি আমাদের খোঁজ পেয়েছেন । সাধারণত: এইসব সময়ে আমি ড্রাইভ করিনা কারণ এখন ছুটির সময় আমার কিন্তু একটি বাঙালী পরিবার এই দূরদেশে বিপদে পড়েছে শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না ।

বলে মৃদু হাসলো সে । ঠিক যেন অ্যাঞ্জেলিনা শুধু ব্র্যাড পিটের দেখাই পাওয়া হলনা আমার ।

ও বলে চলেছে, ছোটবেলায় অনেক গল্পের বই পড়তাম আর ভাবতাম যে লেখকেরা কি এগুলো বানিয়ে বানিয়ে লেখেন ? কিন্তু আজ মনে হয় নাহ্ বানিয়ে গল্প লেখা যায়না গল্প জীবনেরই অংশ এই দেখুন না আমার জীবনটাই তো একটা গল্প ! বলে আবার মধু ছড়িয়ে হেসে ওঠে ।

বেলা পড়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে ভেবে আবার চলা শুরু করলাম । কচি লেবু পাতার মতন মিষ্টি রোদ্দুর এসে চারিপাশ ভিজিয়ে দিচ্ছে । মনে মনে বললাম তুমি অনেক জেনেছো বাঘিনী শুধু জানতে পারলে না যে একজন গল্পকারের খপ্পরে পড়েছিলে তুমিও এবার তোমার জীবন গল্প হবে আর কতনা দূর দেশে বসে লোকে পড়বেন আর কেউ কেউ তোমার মতনই ভাববেন : লেখকেরা কী বানিয়ে বানিয়ে গল্পগুলো লেখেন ?

মুদুমালাই বনে বাঘিনির দেখা না পেলেও মানবী বাঘিনী আমার সেই যাত্রায় ক্ষোভ মিটিয়েছিল বহুলাংশেই ।

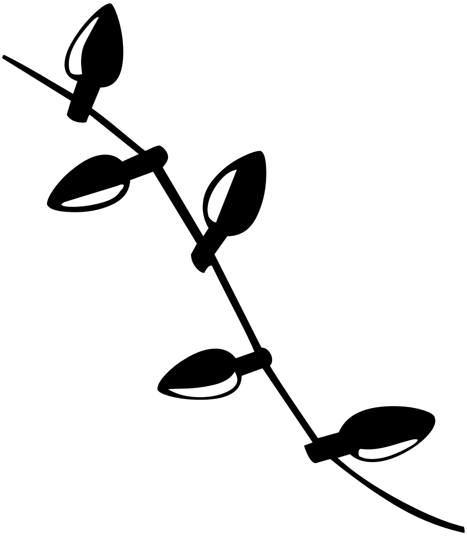

রাজবধূ

মেয়েটির বাবা ছিলেন না রাজবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত । ছিলেন মিলিওনেয়ার ব্যবাসায়ী । মেয়েটি ছিল অপরূপা । আর সরল । চোখদুটো ঠিক যেন হরিণের মতন । আয়নার মতন স্বচ্ছ একটা মন ছিল ।

ওরা তিন বোন এক ভাই । এই মেয়েটিই সবচেয়ে সুন্দরী । ওর দিদি ওর বাবার সঙ্গে এস্টেটের কাজ কর্ম দেখতো ।

একটু টমবয় গোছের ছিল সে । তার এক বন্ধু আসতো । সে ছিল রাজবংশের ছেলে । যুবরাজ ।

দিদির সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল । দুজনে একসঙ্গে কফি এস্টেটের মধ্যে ঘুরে বেড়াতো । ওদের একটা ঘোড়া ছিল ।

চেতক নাম তার । নামটা রাণা প্রতাপ সিংহের ঘোড়ার নাম থেকেই নেওয়া । সেই সুন্দর ও অসম্ভব তেজি কালো ঘোড়া করে দিদি ঘুরে বেড়াতো এস্টেটে । কখনো কখনো রাজপুত্রও সঙ্গ দিত । ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব ব্যাতীতও কিছু ছিল বলে মনে হত সূর্মার, সেই সরল মেয়েটির । সূর্মা নাম হলেও খুবই ফরসা ছিল সে। দুধে আলতা রং।

ওর দিদি হেমার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হবে মনে মনে সে এটাই ভেবে নিয়েছিল কিন্তু সব ভাবনায় ইতি টানতে হল একদিন যখন তাকেই রাজবধূ করার জন্যে তার বাবার কাছে প্রস্তাব নিয়ে এলেন রাজা ও তাঁর লোক ।

তারপর এলেন রাণী । ওদের বিশাল কফি এস্টেট কাম বাড়ি যেটি চিরদিন তাদের খুব বড় মনে হয়েছে

সেই জায়গাটি রাজপরিবারের সদস্যদের আগমণে নেহাতই ক্ষুদ্র মনে হত ।

আসলে বড় ছোটর সংজ্ঞা তো মানুষের মনে ।

দিদি ভেঙে পড়েছিল, প্রকাশ ছিলনা তবে বোন হিসেবে সূর্মা বুঝতো হেমার দু:খ। উপায় নেই। রাজপরিবারের সবার সঙ্গে রাজপুরুষও এমন ব্যবস্থা চাইছেন। অতএব কিছু দিন চললো দিদির চোখের জল মুছে ফেলার প্রচেষ্টা, ছোটবোন হিসেবে নিজেকে কখনো কখনো অপরাধী মনে হত সূর্মার। কিন্তু বাড়ির সবাই জানে দিদি আর রাজপুত্র নিছক বন্ধু আর যেহেতু রাজপুত্র নিজে এই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছেন তাই কারো কিছু বলার নেই। সূর্মার মনে হল দিদি হেমার অংশে সে ভাগ বসাচ্ছে কিন্তু কিছু করার নেই।

এরপরে তাকে কিছুদিন রাজার বোনের কাছে গিয়ে থাকতে হল। রাজকীয় আদব কায়দা শেখার জন্য।

কিভাবে বসতে হয় কিভাবে উঠতে হয় কিভাবে কথা বলতে হয় কখন হাসতে হয় কখন স্মাইল দিতে হয় ইত্যাদি।

প্রথম প্রথম অত্যন্ত আন কমফর্টেবল লাগতো লম্বা ঝুলের ঘাগরা পড়ে হাঁটতে চলতে। অভ্যাস নেই তো !

কিন্তু ধীরে ধীরে সয়ে গেলো। ক্ষিদে পেলেও খাবার উপায় নেই। বাড়িতে সবসময়ই প্রায় কিছু না কিছু খেতো, লজেন্স, আইসক্রীম কিংবা নিদেন পক্ষে ঘরে তৈরি চাট কিন্তু এখানে সব নিয়মে বাঁধা। আর সবার সঙ্গে খাওয়াই নিয়ম। যদি ক্ষিদে পায়ও তাহলে এমন জিনিস খেতে হয় যা ঠিক ওর পছ্ন্দ হয়না। যেমন কতদিন আচার খায়নি !

তাদের বাড়িতে এক ধরণের হজমি গুলি তৈরি হত ভেষজ দিয়ে সেই গুলি খেতে অসাধারণ কিন্তু রাজবাড়িতে ওসবের প্রবেশ নিষেধ, তাই নিজেকে কিছুটা বন্দিনী মনে হত।

বেশিরভাগ সদস্য কেমন মেকি ধরণের। প্রথমে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরবে যেন কত আপন পরমূহুর্তেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। এসবে ও অভ্যস্থ নয়। মানিয়ে নিতে সময় লাগবে। তবে রাণীমা খুব ভালো। সবাই বলে রাণীসাহেবা। খুব সুন্দরী, ব্যাক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। একমাত্র উনিই বোধহয় সাধারণ ব্যবহার করেন সূর্মার সঙ্গে। হাজার বিধি নিষেধের বেড়াজাল টপকে ওঁনার কাছে সহজেই পৌছানো যায়। উনিও মনে হয় সূর্মাকে

যথেষ্ট স্নেহ করেন। বাড়ির সঙ্গে আজকাল তেমন যোগাযোগ হয়না তো, এই রাজপ্রাসাদই তার বাড়ি। একজন ভৃত্য আছে, পরাশর নাম তার, এরা বলে ম্যানেজার– তাকে বেশ লাগে। অনেকটা সূর্মার মতন সাধারণ মানুষ, রাজবাড়ির মতন নয়। ওকে সে যুবরাণী বলে সম্বোধন করতো কিন্তু সে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো, বলেছিল -- আমাকে তুমি বহিনজি বলো। একহাত লম্বা জীভ কেটে সে বলেছিল– কি বলছেন ? আপনি আমাদের হবু যুবরাণী, পরে রাণী হবেন, আপনাকে কি বহিনজি বলতে পারে এই চুনোপুটি নকর ?

- কেন পারে না ? সূর্মা কৌতুহলি।
- আপনি নতুন এসেছেন এখানে, কিছুদিন যাক, আস্তে আস্তে সব শিখে যাবেন রাজবাড়ির কায়দা কানুন।

বলে মুচকি হেসেছিল লৌহ কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার পরাশর।

এভাবেই কেটে গেলো এক একটা দিন। হবু বরের সঙ্গে দেখাই হতনা। আর হলেই বা কি উনি সূর্মার চেয়ে পাক্কা ১৫ বছরের বড়। মাঝে একদিন একসঙ্গে একটি পারিবারিক ডিনারে গিয়েছিল। আর দেখা হয়নি।

তারপর এলো সেই শুভক্ষণ। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেলো সুর্মা আর রাজপুত্র বিষ্ণু বর্ধনের।

দক্ষিণ ভারতের এক রাজপরিবারের বধূ হয়ে গেলো সাধারণ ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে সূর্মা।

বিয়ের দিন দিদি মুখটা কালো করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অবশ্য সূর্মার বিয়ের কিছু মাস পরেই ওদের এস্টেটের এক নবীন ম্যানেজারের সাথে বাবা দিদির বিয়েটা দিয়ে দেন। ম্যানেজারটি বিলেত ফেরৎ।

বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সেও ওদের একজন হয়ে গেলো। এস্টেটের কাজে তাকে আরো অনেক দায়িত্ব দিয়ে বাবা ঝাড়া হাত পা হলেন। ম্যানেজার সাহেব বি –স্কুল জার্গন ফলো করতেন না বদলে নিজের আবিষ্কৃত পদ্ধতি দিয়ে কম সময়ে ব্যবসা বাড়িয়ে বাবার মন কেড়েছিলেন।

ছোটবোন তো খুব ছোট আর একমাত্র ভাই বিদেশে পাঠরত। সুর্মা মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতো তবে সেসব আসার পেছনে অনেক আগে থেকে প্ল্যান করতে হত। রাজবধূ বলে কথা!

আর স্বপারিষদ যখন তাদের গাড়ির কনভয় এসে দাঁড়াতো বিশাল কফি এস্টেটে তখন মনে হত যেন লোহার গরাদের বাইরে একফালি সবুজ সতেজতা ওকে দু হাত বাড়িয়ে ডাকছে। লাফিয়ে নামার উপায় নেই, সেসব অভ্যাসকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হয়েছে রাজবাড়ির চাপে। ধীরে নেমে এগিয়ে যায় হাঁটু সমান কফি বনে। অচেনা সুরে কি একটা পাখি ডেকে ওঠে, যেন ওকে স্বাগতম জানাচ্ছে– এসেছো কন্যে? ঘরে ফিরেছো?

শুকনো পাতার মচমচানি বড় মধুর লাগে, যেন বংশী বাদন। ঘর, আপন ঘর তার টানই আলাদা। যেখানে হেসে খেলে বেড়ে উঠেছে সেখানকার মায়া কি এত সহজে যায়? কত স্মৃতি কত আনন্দ।

কাঁঠালিচাঁপা গাছটা অভিমানী : এতদিনে আমাকে মনে পড়লো?

একপাশে জাল দিয়ে ঘিরে রাখা রাজহংসের দল প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে নানান অভিযোগ জানাতে লাগলো সূর্মাকে। আর ওদের পোষা উষ্ট্র। সেটি কেমন করুণ চোখে চেয়ে ছিল ওর দিকে যেন বলতে চাইছে -- তুমি এখানে থাকো না কেন গো? আর?

থাকা কি যায়? বিয়ের পরে তো স্বামীর ঘরই মেয়েদের ঘর। তার ওপর সে ঘর যদি হয় রাজ গৃহ তাতে অনেক নিয়ম শৃঙ্খল। বেচারা সামান্য জন্তু উষ্ট্র কি বুঝবে এসব? মানুষি চালাকির উপাখ্যান?

যদিও আজকাল তার রাজগৃহকেই মনে হয় জতুগৃহ। তার ১৫ বছরের বড় স্বামী বিয়ের রাতে খুবই রোমান্টিক ছিলেন, ওরা যখন হনলুলু হাওয়াই ওয়াইকিকি বীচে গেলো মধুচন্দ্রিমা যাপন তখন থেকেই একটা অন্য স্রোত লক্ষ্য করেছিল সূর্মা। কে একটা মেয়ে ক্রমাগত মোবাইলে কল করছিল। পরে জানা গেলো সে ওর ছেলেবেলার বান্ধবী। একসঙ্গে খেলেধুলে বড় হয়েছে। খুব ভালো জকি। দারুণ ঘোড়া চালায়।

সূর্মা সরলমনেই নিয়েছিল কিন্তু যত দিন কাটতে লাগলো দেখতে লাগলো, আস্তে আস্তে অনুভব করতে লাগলো যে তার স্বামীর মেয়ে বন্ধুর অভাব

নেই। এক একদিন তো রাতেও সে আসতো না। পরে পরাশরকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল যে রাজপুত্র ফার্ম হাউজে রাত কাটান। কেন ? উত্তরে পরাশর বলেছিল -- বড় বড় ঘরের সব কাজের কেন থাকে না, ওরা কাউকে জবাবদিহি করার প্রয়োজনও মনে করেন না।

আস্তে আস্তে সূর্মার সঙ্গে ১৫ বছরের বড় স্বামীর দূরত্ব বাড়তে লাগলো। ভালো তাকে বেসেছিল সুর্মা। খুবই ভালোবেসেছিল। যতটা বাসা সম্ভব কিন্তু এক এক সময় দিদির কাছে অপরাধী মনে হত নিজেকে। দিদির বিয়ের পরে অবশ্য হালকা লাগতো। আর ম্যানেজারের সঙ্গে দিদির ভালই সাংসারিক বন্ধন গড়ে উঠছিল।

দিদিকে আজকাল তার আর অখুশি মনে হতনা। কিন্তু নিজের স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া --বড় একা লাগতো। গল্ফ খেলতে যেতো, পার্টি করতো তবুও রাতের আঁধার নেমে এলেই নিঝুম পুরীতে কি যে এক অসম্ভব কষ্ট, একাকীত্ব তাকে চেপে ধরতো যে সে জানেনা।

ইতিমধ্যে মাতৃ বিয়োগ হল। রাজবাড়ি থেকে তাকে একবার যেতে দেওয়া হল, থাকতে দেওয়া হল না, ওটা নাকি তাদের প্রটোকলে নেই। যিনি যাবার তিনি চলেই গেছেন, ফিরবেন না। আর থেকে কি হবে ?

অদ্ভুত যুক্তি রাজবাড়ির। শুনে কান্নায় বুক ফেটে আসতো সুর্মার। প্রাসাদে বসেই মায়ের কথা ভাবতো। হাসিখুশি মোটাসোটা মা তাদের। লাল লাল গোল গোল গাল, অঢেল প্রাণ শক্তি, সবার জন্য হৃদয় ভরা স্নেহ, মমতা। মা তো মা-ই তাই না ? বাবা -মা তো চিরটাকাল থাকেন না কিন্তু ওঁনারা চলে গেলেই সবথেকে বেশি কষ্ট হয়।

একদিন টের পেলো সে মা হতে চলেছে। রাজাবাড়ির সদস্যরা তুমুল ব্যস্ত।

আয়োজন বেশি, আদর কম। তবুও তার স্বামীকে গৃহবন্দী করা গেলো না।

একদিন মা হল প্রকৃতির নিয়মে। একটি ফুটফুটে দেবশিশু জন্মালো। লাল শ্যাওলা ফুল তোলা লম্বা একটি ঈষৎ সোনালি ঘাগরা পরা সূর্মা ছেলে কোলে ছবি তুললো। হাজার হাজার ক্যামেরার ঝলকানিতে ছেলে বুঝি

মূর্ছা যায়। সেদিনটা যুবরাজ সঙ্গে ছিল -সারাটা দিন। তারপরই নিজের জগতে চলে গেলো।

ছেলে জন্মাবার পর কিছু দিনের জন্যে সে ছুটি পেয়েছে। বাবার কাছে এসেছে। ছেলে যেন এই পরিবেশে বড়ই খুশি। সবার কোলে যাচ্ছে, হাসছে, খেলছে। রাজপুত্র বলে কারো কারো কোলে যাবেনা এই নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে ফেলেছে সূর্মা। সে শুধু রাজপুত্র নয়, তারও তো ছেলে আর সে কোন রাজকন্যা নয় এক সাধারণ নাগরিকের মেয়ে। কিছুদিন থাকার পর একদিন রাজবাড়ি থেকে টেলিফোন এলো যে যুবরাজ বিষ্ণুবর্ধন খুব অসুস্থ। সূর্মা যেন শীঘ্রই ছেলেকে নিয়ে ফিরে যায়। সেদিন ঝড় উঠেছিল। চৈত্রের ঝড়। ঝড়ে উড়ে আসা একরাশ ফুলের মতন বৃষ্টিভেজা হয়ে ওরা পৌঁছালো রাজবাড়িতে।

কোথায় তার অসুস্থ স্বামী ?

দেখার জন্যে মনটা ছটফট করছে। দেখলো এক রূপসী থতক্ষঢ়নশধনক্ষ -এর বাহুলগ্না হয়ে বিষ্ণুবর্ধন দিব্যি সুস্থ, চাঙ্গা অবস্থায় সুরা পানরত। ভীষণ রাগ হল সুর্মার। মাথা থেকে পায়ের পাতা অবধি জ্বলে গেলো কিন্তু নিরুপায়। কি বা করার আছে ? জানলো তাকে নিয়ে আসার জন্য এও এক চাল।

নিজের বেডরুমের দিকে চলে গেলো। ছেলের ন্যানী রোহিনীর হাতে ছেলেকে সঁপে দিয়ে সোজা হাজির হল স্বামীর কাছে। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় আরম্ভ হল। যুবরাজ তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলো যে রাণীর ইচ্ছেতেই তাকে বিয়ে করেছে তা নাহলে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হবে। নইলে একটি সিভিলিয়ানের মেয়েকে বিয়ে করার কথা সে ভাবতেই পারে না। কাজেই এখন তার জীবন কাটাবার উপায় সে নিজেই ঠিক করবে বৌ যেন মাথা না গলায়। আরো এক পা এগিয়ে জানিয়ে দিলো যে ইচ্ছে হলে রাজবধূও কারো সঙ্গে এনজয় করতে পারেন। পথ খোলাই আছে।

ঘেন্নায় সারা শরীর বেয়ে এক অস্বস্তিকর স্রোত বয়ে গেলো। ঠিক করলো এখানে আর থাকবে না।

যেই সংসারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই ধরণের বোঝাপড়া সেখানে কিসের জন্য পড়ে থাকবে সুর্মা ? তার তো রাণী হবার তেমন সাধ নেই । বরং নিজের সন্তানকে যদি এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারে সেটাই অনেক ভালো হবে । কিন্তু কিভাবে ? রাজবাড়ি তো একে ছাড়বে না ?

পরাশর কিছু আঁচ করেছিল হয়ত । এক মেঘমন্দ্রিত সন্ধ্যায় বিশাল ড্রয়িং রুমে, মোমের আলোতে ওর রহস্যময় হয়ে ওঠা মুখ থেকে কটা ভয়ানক শব্দ শুনলো সূর্মা । এরজন্য সে প্রস্তুত ছিল না ।

রাজবাড়ির একটা গুম ঘর আছে সেখানে অনেক মানুষকে গুম করা হয়েছে যারা রাজবাড়ির বিরুদ্ধে কোন কারণে রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে । রাজার ছোটভাই নিরঞ্জন বর্ধনের স্ত্রীকে গুম করা হয়েছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় । প্রতিবাদ করেছিলেন নিরঞ্জনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে । লোকে জানে উনি অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন আসলে ওঁনাকে মেরে ফেলা হয়েছিল । ওঁনার কঙ্কাল রয়েছে সেই গুম ঘরে । হাতে চুরি, গলায় সাতনড়ি হার । পরাশর দেখেছে । ওঁনার বিদেহী আত্মা রাজবাড়ির আনাচে কানাচে হা হুতাশ করে বেড়ায় বলে পরাশরের মনে হয় । এলাকার অভিজাত পার্টিতে ভয়ে মেয়েরা আসতে চাইতো না । যুবরাজ বিষ্ণুবর্ধনের লাম্পট্যের ভয়ে । সব শুনে সূর্মা শিহরিত হল ।

রাজবাড়ির কেচ্ছা কাহিনীর যেন শেষ নেই । পরাশর আসলে রাজার এক নকরাণীর ছেলে । যুবরাজ বিষ্ণুবর্ধনের সৎ ভাই । সেই নকরাণী যুবরাজ বিষ্ণুবর্ধনের ন্যানি ছিল । কামুক রাজা এক রাতে সেই মেয়েকে ধর্ষণ করে । তারপর সন্তান হয় । সেই সন্তানই এই পরাশর, রাজবাড়ির চিফ ম্যানেজার । নিজের জন্মরহস্য সে জেনেছে তার মায়ের মৃত্যুর আগে ।

ততদিনে সে ম্যানেজার হিসেবে গেড়ে বসেছে এখানে । বাবাকে ডাকে : ইওর হাইনেস –স্যার ।

মুখ বন্ধ করে রেখেছে কিন্তু আজ রাজবধূর দু:খ দেখে তাকে খুলে বলেছে নিজের কথা, দু:খ বেদনা ভাগ করে নেবার জন্য ।

রাজার ওপর বেদম চটা বোঝাই গেলো ।

- তাহলে এখানে আছো কেন তুমি ? পরাশরকে জিজ্ঞেস করে সূর্মা ।

- উপায় কি ? কোথাও গেলে রাজবাড়ির সুবিধে ভোগ করতে পারবো না, উল্টে নিজের বংশ পরিচয় কুল শীল ইত্যাদি নিয়ে মহা ঝামেলা সৃষ্টি হবে তাই এই ছত্রছায়াতেই রয়ে গেছি ।

সূর্মা পালাবার মতলব করে । কিন্তু খুব মুস্কিল, চারিদিকে হাজার নিয়ম, রক্ষী ইত্যাদি । শেষে পরাশরকে ধরে । পরাশর দয়ালু । দেখলো নিজের জীবন গেছে কিন্তু একটি ফুলকে যদি বাঁচাতে পারে একটি পক্ষী শাবককে যদি মুক্তি দিতে পারে মন্দ কি?

পুণ্যের খাতায় কিছু তো জমা হবে । কামুক ও উচ্ছৃখল যুবরাজের কবল থেকে যদি একটি সরল মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাতে ক্ষতি কি ? খুব জোর কিছু দিন খোঁজা খুঁজি চলবে তারপর একদিন সব বন্ধ হয়ে যাবে । যুবরাজের আবার বিয়ে হবে । আবার পিতা হবেন উনি । এদের কাছে সেসব কোন বিগ ডীল নয় ।

এইসব সাথ পাছ ভেবে সে স্থির করলো পাখিকে খাঁচা থেকে মুক্তি দেবে ।

যেমন ভাবা তেমন কাজ । আরেক নিঝুম রাতে যখন রাজ পরিবারের এক সদস্যের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে তখন রাজবধূ শরীর খারাপের অজুহাতে রয়ে গেলেন সন্তান সহ যুবরাজের প্রাসাদে । ন্যানী রোহিনীকে ছুটি করে দিলেন এবং পরাশরের প্ল্যান মাফিক গভীর রাতে পলায়ন করলেন দূরে এক অজানা গ্রামে ।

শেষাদ্রিগড় । এই হল সেই জায়গায় নাম । আছে এক বিশাল পাহাড় । স্থানীয় লোকে বলে স্যাক্রেড হিল । শিবের প্রতিবিম্ব । পাহাড়ের নাম গিরিলিঙ্গম । ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করলে বড়ই শুভ হয় । পাদদেশে আছে দেবী ছিন্নমস্তার মন্দির । ওঁরা বলেন দেবী না-শির । একটি পাথর ব্যাতীত সেখানে কিছুই নেই । সিঁদুরে লেপা । লোকে সেখানেই পুজো দেন, হোম হয় । পাথরটা নিজে থেকে বেড়ে চলেছে । দেখে এক নারীর অবয়ব বলেই মনে হয় । খুব একটা যে ভীড় তা কিন্তু নয় । ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই প্রাচীন মন্দিরে বেশি ভক্তের আসা যাওয়া নেই কারণ এর কথা তেমন করে কেউ জানেনা । প্রচার নেই ।

হয়ত সেই কারণেই পরাশর তাদের এখানে পাঠিয়েছে। একজন চরের সঙ্গে। একটি নদী আছে, মুঠাপাণি নাম। পাহাড়ের পাশ দিয়ে একমনে বয়ে চলেছে। ভালই জল তাতে। একদিন সারাটা দিন ওখানে কাটিয়েছে

সুর্মা, ছেলেকে নিয়ে। নুড়ি পাথর ছড়ানো তীরে ছেলে খেলে বেরিয়েছে, নেচেছে, দুলেছে।

ইতিমধ্যে একজন সাধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। উনি প্রবীন সন্ন্যাসী। এখানেই থাকেন। পূর্বাশ্রমে ছিলেন

ভূ -তাত্ত্বিক। কাজের সুত্রেই এই অঞ্চলে প্রথম আসা তারপর আধ্যাত্মিক চেতনা জগ্রত হওয়ায়

এখানেই সাধনা শুরু করেন। পরে একটি আশ্রম করেছেন। সেখানেই থাকার জায়গা পেলো সুর্মা। কষ্ট হয়, একফালি ঘরে কাঠের মতন শক্ত খাটে শোয়া আর জনগণের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খিচুড়ি কিংবা ডাল ভাত দিয়ে পেট ভরানো - একটু কষ্টকর। কিন্তু উপায় নেই। ছেলেকে সে ঐ অসুস্থ পরিবেশ থেকে দূরে রাখতে চায় আর বাবার কাছে গেলে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। তাই শত কষ্ট হলেও এখানেই মুখ বুজে পরে থাকতে হবে আপাততঃ।

সন্ন্যাসী অবশ্য খুব স্নেহপরায়ণ, ছেলেকে খুব ভালোবাসেন। দাদুসোনা বলেন। ছেলেও ওঁনার বড় ন্যাওটা।

আজকাল সুর্মা খুব মন দিয়ে পুজো করে। সেই পাথরের সামনে, ভক্তিমতী হয়ে বলে -- মা আমার সন্তান যেন দুধে ভাতে থাকে, মানুষের মতন মানুষ হয়ে ওঠে, বাবার রক্ত যেন প্রকট না হয়, তোমার কোলে ওকে একটু আশ্রয় দাও মা !

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যের পরে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে চরাচর। ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে একা বসেছিল আশ্রমে। এমন সময় সন্ন্যাসী এসে একটা চিঠি দিলেন। সেদিনের ডাকে এসেছে।

শীলমোহর দেখে মনে হল রাজবাড়ির এলাকা থেকে এসেছে। যা ভেবেছে ঠিক তাই। পরাশরের চিঠি।

রাজদূত চারপাশে ছেয়ে গেছে, ছেয়ে গেছে চর। তাকে খুঁজে বার করার জন্য। লোকে জানে সে অসুস্থ। মিডিয়া পর্যন্ত সংবাদ যায়নি। গুপ্তচরেরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। নিজে হাতে পরাশর এসে এই চিঠি হেড পোস্ট অফিসে ফেলে গেছে যাতে কেউ টের না পায়। রাজবধূ যেন সাবধানে থাকেন।

সাবধানেই ছিল সুর্মা তবুও একদিন এলো চর তারপর এলেন যুবরাজ। খোঁজ খোঁজ। সূর্মা ছেলেকে কোলে নিয়ে নদীর ধারে লুকানোর জন্য হাঁটা লাগালো। কোন একটি ছোট খাটো পাথরের অন্তরালে লুকিয়ে থাকবে। ওরা চলে গেলে ফিরবে আশ্রমে। ছেলের মুখ বেঁধে, যাতে না চেঁচায় ওরা দুজনে নদীর পাড় বরাবর দ্রুত পায়ে চলতে লাগলো। পেছনে যুবরাজ, যুবরাজ ওদের দেখতে পেয়েছে। চীৎকার করতে করতে আসছে।

সূর্মাও চলার গতি বাড়িয়ে দেয় ঐ ডাকে কর্ণপাত না করে।

যুবরাজ ঘোড়ার পিঠে বলে ওদের ধরেই ফেলবে হয়ত। সুর্মা একমনে ছিন্নমস্তার নাম জপ করতে থাকে।

- বাঁচাও মা, আমার সন্তানকে বাঁচাও।

খট্ খট্ খট্ খট্ -- খুড়ের শব্দ কাছে, আরো কাছে, আরো !

হঠাৎ এক পরিত্রাহী চীৎকারে চমকে ফিরে তাকায় সুর্মা। নদীর এইদিকেই আছে চোরাবালি। সেই চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে অশ্বারোহী যুবরাজ, ক্রমশ নিমজ্জিত হচ্ছে। সূর্মা নীরব দর্শক।

নীরব হয়েই থাকে, এই আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী হয়েই রয়ে যায়। চেষ্টা করেনা কিছু করার।

ধীরে ধীরে বালির তলায় হারিয়ে যায় এক টগবগে রাজপুরুষ, যার শরীরের নীল রক্ত বইছে সুর্মার ছেলের ধমনীতে, শিরায় শিরায়।

রাজপরিবারের প্রটোকল বলে : নাবালক সন্তানসহ কোন রাজবধূ যদি বিধবা হন তাহলে তিনি সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব নিতে পারবেন এবং নিজের ইচ্ছে মতন সন্তানকে মানুষ করতে পারবেন শর্ত একটাই : আবার বিয়ে করা চলবে না। যদি বিয়ে করেন সেক্ষেত্রে সন্তানের সমস্ত দায় দায়িত্ব

বর্তাবে রাজবাড়ির ওপর। তারাই স্থির করবেন কি করে রাজকুমারের আপব্রিংগিং হবে।

লাফিয়ে উঠলো সুর্মা অনেকদিন পরে। সে তার সন্তানের সব দায়িত্ব নেবে। বিয়ে করার প্রশ্নই নেই। যেই দেবীর আশীর্বাদে তার মনস্কামনা পূরণ হয়েছে সেই দেবীর সেবায় বাকি জীবনটা অতিবাহিত করবে।

ছেলেকে রাজকুমারের থেকে বেশি মানুষ করে তুলবে।

আজকাল রাজবধূ থাকেন একটি ছোট প্রাসাদে। ছেলে বড় হয়েছে। মামাবাড়ির বিশাল কফি এস্টেটের একটা অংশ পেয়েছে তার মা। সেখানে তারা ছুটি কাটাতে যায়। প্রকৃতির মাঝে বেড়ে উঠেছে রাজনন্দন।

ফুল পাতা বৃক্ষরাজি তার সখা। চরিত্রে কোন মেকি পণা নেই, আছে দৃঢ়তা আর ঋজু একটা অনমনীয় স্বচ্ছ মন যে মন চায় জনগণের সেবা করতে, তার মা তো সেবাতেই জীবন কাটান।

চ্যারিটি করেন। গরীবের জন্য হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, গরীব শিল্পীদের জন্যে আর্ট গ্যালারি,

নিরন্নে অন্নদান, দৃষ্টিহীনের জন্যে হাতের কাজের ব্যবস্থা এইডস্, কুষ্ঠ আরো কত অসহায় মানুষের

অবলম্বন রাজবধূ সুর্মাসাহেবা।

শুধু মানুষই নয় অসহায় পশুপক্ষীও তার কাছে সমান আদরনীয়। তাদের জন্যেও ব্যবস্থা করেছেন। বিশ্ব জোড়া সন্তান তার আজ, লোকে বলে রাজবধূর সম্বন্ধে যে এই নারী স্বামীকে হারিয়ে পুর্ণতা পেয়েছেন।।

বৈধব্য ওঁনার ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে, না হলে আজ এত রিক্ত, দুস্থ, অসহায় মানব সন্তান ও জন্তু জানোয়ার কার হাত ধরে বেঁচে থাকতো ?

পাঁকেও পদ্ম ফোটে, শুধু পদ্মকে ফোটাতে জানতে হয় -- হালকা হাসি সূর্মার মুখে।

দিদি হেমার দিকে চেয়ে মৃদু সুরে বলে ওঠে – আঁধার ঘেরা এক প্রকোষ্ঠ থেকে যখন প্রথম আলোয় এলাম তখন আর ইচ্ছে করলো না পুনরায় অন্ধকার রাজ্যে ডুবে যেতে, তাই আমি সেদিন ওকে বাঁচানোর জন্য হাত বাড়াই নি । এর জন্য কোন পাপ যদি হয়ে থাকে, আমি যদি পতিঘাতিনী হয়ে থাকি তার আঁচ যেন আমার সন্তানের গায়ে না লাগে । ও আলো হয়ে উঠুক !

ভগিনীর পরিণতির কথা ভেবে হেমা আজ প্রথম তার সঙ্গে যুবরাজ বিষ্ণুবর্ধনের বিবাহ না হওয়ায় ঈশ্বরের চরণে একটি প্রণাম জানায়, অবশ্যই মনে মনে, গোপনে।

কুহেলি

কুহেলি সিনেমাটি জীবনে বহুবার দেখেছে সুনহরি। আসলে সুনেহরি কিন্তু উচ্চারণের দৌলতে সুনহরি, পদবী মিত্র। সোনার মেয়ে। পদবী বাঙালীর হলেও বাংলার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিলনা ওদের। বাবা ছিলেন মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। সুনহরির মা মারাঠি। ওরা তৎকালীন বম্বে বা আজকের মুম্বাইতে বসবাস করতো। বাড়িতে যতদিন ঠাকুর্দা ছিলেন ততদিন বাংলা সিনেমা দেখার চল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরও দেখা হত তবে অনেক কম কিন্তু সুনহরি সুযোগ পেলেই কুহেলি ছবিটি দেখতো। ওর খুব ভালোলগতো সিনেমাটি। নিজের জীবনেও যে একদিন এক কুহেলি উপস্থিত হবে শুধু সেটাই জানতো না।

ঘটনাটি ঘটেছিল এক রবার প্লান্টেশনে। কেরালা রাজ্যে। সুনহরি তখন কাজ থেকে একটু জলদি অবসর নিয়ে এই প্লান্টেশনের কাছেই এক বাংলা কিনে থাকতো। বিয়ে করেছিল কিন্তু স্বামীকে অকালে হারায় দুরারোগ্য অসুখে। নিজের সন্তান নেই তবে স্বামীর প্রথম পক্ষের একটি ছেলে ছিল সে বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। আর সুনহরির মা ও এক বহু পুরাতন ভৃত্য মঞ্জুনাথ ওর সঙ্গে এসেছিল এই বাংলোতে। এখানে সুনহরি দিন কাটাতো এক চ্যারিটি সংস্থায় কাজ করে। কর্মজীবনে সে ছিল বলিউডের স্টান্ট ওম্যান। আমরা পর্দায় নায়িকাদের যেসব অ্যাকশন করতে দেখি সেইসব অ্যাকশন আসলে করতো সুনহরি। পাহাড়ের ধার থেকে ঝাঁপ দেওয়া, হেলিকপ্টার থেকে লম্ফ কিংবা প্যারাগ্লাইডিং অথবা গভীর সমুদ্রে জাহাজ থেকে জলে লাফ দেওয়া, ভিলেনের সঙ্গে বাইক রেস সবই নায়িকার বকলমে করতো সুনহরি। একে বাঙালী মেয়ে যারা ভীতু, লবঙ্গ লতিকা বলেই পরিচিত তায় স্টান্ট এর মতন বিপজ্জনক কাজ করাতে ও কর্মজীবনে বেশ পপুলার ছিল। বহু বড় বড় অভিনেত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। অনেকেই ওকে বেশ শ্রদ্ধা করতো। যখন প্রথম সে এই কাজে যোগদান করার মনোবাসনা জানায় তার বাবাকে উনি একটি কথাই বলেন, *জীবনে যাইই করো মন দিয়ে করবে আর বি আ স্ট্রং লেডি। এমন কোন কাজ করবে না যাতে লোকজন তোমাকে ডিগনিফাইড বলতে কুণ্ঠা*

বোধ করেন। মেয়েরা যাই করুক না কেন তাদের অলঙ্কার হল শালীনতা/ আজও সে এই কথাগুলো হৃদয়ের মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রেখেছে। সিনেমা লাইনে থেকেও লোকে তার সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। বলে– এত কালচার্ড, এতটাই অন্যরকম মানুষ যে আপনা আপনিই শ্রদ্ধা জাগে। ওর স্ট্রেট ফরোয়ার্ড বলে সুনাম ছিল। তবে সে স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ডিপ্লোম্যাসির পথ অনুসরণ করতো। সেটি চাণক্যের ফিলোসফি। শারীরিক দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচুর পড়াশোনাও করতো। কাজের চেয়ে অকাজের বই বেশি আকর্ষণ করতো। নানান ধরণের বই পড়া ছিল তার প্যাশন। এখন এই অখন্ড অবসরের অনেকটাই সে বই পড়ে কাটায়। ইদানিং পড়ছে জন গ্রিশামের বইগুলি। জনের ওয়েব সাইটে রেজিস্টার করেছে মেম্বার হিসেবে। কোন নতুন নোভেল বেরোলেই জেনে যায়। শহরে গিয়ে কিনে আনে অর্ডার দিয়ে।

জীবনটা রসে বশে কাটিয়ে অবসরের পর একটা সেবামূলক কাজে সে নিজেকে নিবেদন করেছে।

শৈশব থেকেই তার দানের বাতিক ছিল। ছোটবেলায় সে জানালা দিয়ে লোকজনকে ডেকে ডেকে জিনিস দিয়ে দিতো – নাও নাও নিয়ে যাও, আমাদের অনেক আছে, তোমার জামাটা ছিঁড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি।

কেউ নিয়ে চলে যেতো। কেউ ফেরৎ দিয়ে যেতো। পাশের বাড়ির মুখার্জী কাকু বলতেন– আপনাদের মেয়ে তো দেখছি লেডি বিবেকানন্দ।

হৃদয়ের টানেই অবসর জীবনে সুনহরি আবার চলে আসে মাটির কাছে। এই রিমোট অথচ সুন্দর অঞ্চলে। এসেই বেশ গুছিয়ে বসেছে। কাজ করে মাটির মানুষদের জন্য। আদিবাসিদের জন্য।

এখানে এক আদিবাসিনীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যাকে এরা বলে আম্মা।

আম্মার বয়স ১১৫। কালো কুচকুচে চেহারা হলেও একটা সৌম্য ভাব, নাকে জ্বলজ্বল করে একটি পানপাতার ডিজাইনে অজস্র নকল হীরে বসানো নাকছাবি। ওর চাপা নাক, খুদে চোখ সত্ত্বেও ঐ হীরে র গহনা খানি পরাতে মুখটা ভীষণ উজ্জ্বল লাগে। চোখে কম দেখে, ঝুঁকে চলে, মাথায় বরফ পড়েছে তবুও হাজার খানেক ভেষজের নাম গড়গড় করে মুখস্থ

বলতে পারে । গভীর বনে কোথায় কি গাছ থেকে কোন শেকড় বাকড় মিলবে যা দিয়ে নানাবিধ কঠিন ব্যাধি সেরে যাবে তা সবই ইনি জানেন । ইন্টেরেস্টিং চরিত্র । দুনিয়ায় কত রকমের মানুষ আছেন সে এক দেখার মতন বিষয় তো বটেই । এই মহিলার চোখেই প্রথম পড়েছিল সেই ধ্বংস স্তুপ । ভেষজের সন্ধানে আম্মার সর্বত্রই যাতায়াত । একটি লুপ্তপ্রায় গুহাপথে প্রথম আম্মাই এই অঞ্চলের হদিস পান । উনি বিষাক্ত গাছের বনে ঢুকে পড়েছিলেন । বেরোনোর পথ খুঁজতেই এই স্থানটি দেখেন, প্রাচীন কোন রাজবংশের তৈরি প্রাসাদের প্রত্নরূপ । সবাই যখন জানলো, একে একে দেখতে গেলো । রাস্তা চওড়া ও ব্যবহার যোগ্য হয়ে উঠলো । কিন্তু কেউ ভেতরে প্রবেশ করলে তারা আর ফিরতো না । এ এক আশ্চর্য ঘটনা । মণিমুক্তোর লোভে অনেকেই গেছে কিন্তু ফেরেনি । গুপ্তধন তো থাকতেই পারে ! রাজবাড়ি বলে কথা ! সাধারণ লোক সেই অমোঘ আকর্ষণ এর বশবর্ত্তী হয়েই গেছেন, ফেরেননি । হারিয়ে গেছেন চিরতরে । এসেছেন প্রত্নবিদেরা কেউ কেউ । তারাও ফেরেন নি । অতএব এই স্থানটি পরিণত হয়েছে রহস্যময় স্থান হিসেবে । আর ঐ মৃত্যুদূত এক কুহেলি । কেউ ভাবেন ভেতরেও হয়ত বিষাক্ত কোন উৎস আছে । অনেকে বলে অপদেবতা ।

সুনহরি স্থির করলো সে এই কুহেলির রহস্যভেদ করবে । নিজে সে অসীম সাহসিনী যদিও এখন একটু বয়স হয়েছে তবুও মনের জোর তো আগের মতই অটুট । আর চোখ কানও খোলা আছে ।

যারা খুব ডেয়ার ডেভিল হয় তাদের কাছে অলসভাবে বসে থাকা এক বিড়ম্বনা । যদিও সে কাজ করে তবুও অফিস ওয়ার্ক আর ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ নেওয়া তো এক নয় ! অবশ্য রহস্যভেদ করতে গেলে মগজাস্ত্রর তো প্রয়োজন আছেই ! লোকে তো বলে ভুতপ্রেতের কাজ । এত বছরের সভ্যতা যখন আড়ালে রয়েছে তার মানেই ওখানে অতৃপ্ত আত্মারা ঘোরে । তারাই সব চালায়, আর যে ভাবে মানুষ অদৃশ্য হচ্ছে তাতে করে তো ধারণা বদ্ধমূল হবেই ! তবু সুনহরি সেই রহস্যকেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে । দেখা যাক কে জেতে !

এই অঞ্চলে এক জাঁদরেল আইনজ্ঞ আছেন । মিস্টার বেণুগোপাল । উনি এখানকার নামকরা ক্রিমিন্যাল লইয়ার । খুব ভদ্র, মৃদুভাষী, নম্র । কাঁচা পাকা চুল, তীক্ষ্ণ নাসিকা, উজ্জ্বল দুটি চোখ । সুনহরির সঙ্গে আলাপ হয়েছে । ভদ্রলোক অকৃতদার । চোখে পড়ার মতন চেহারা এই বয়সেও । দয়ালুও বটে । অনেক দরিদ্র গ্রামবাসীর কেস উনি বিনা পয়সায় লড়েন বলে জনপ্রিয়ও বটে । ওনার বিশাল পৈত্রিক সম্পত্তি। মাঝে মাঝে বিদেশ ভ্রমণে যান রিচ অ্যান্ড ফেমাসদের মতন । আর প্রতি উইক এন্ডেই বাসায় বিরাট পার্টি দেন । সুনহরির মতন বহিরাগতরা প্লাস এখানকার রহিস লোকেরা সেখানে হৈ হল্লা করে রাত্রিযাপন করেন । লোকটিকে বেশ ভালোলাগে সুনহরির ।

একটা কথা খুব আওড়ান, ক্রাইম নেভার পেজ !

বিচক্ষণ ব্যক্তি ।আর খুব কেয়ারিং । মনে মনে ভাবে সে : ২৫ বছর আগে কোথায় ছিলে ?

ভদ্রলোক বেশ দরাজ দিল । সুনহরির সংস্থার জন্য মোটা ডোনেশন দেন । বলেন : সমাজে যাঁরা ভাগ্যবান হিসেবে পরিগণিত তাদের উচিৎ কম ভাগ্যবানেদের সাহায্য করা । তাতে ভাগ্যবিধাতা খুশি হন । একা একা স্বার্থপরের মতন ধনসম্পদ ভোগ করাও তো ক্রাইম, অ্যান্ড ক্রাইম নেভার পেজ । উনি খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন । ভালোলাগে, শ্রদ্ধা জাগে । বলিউডের মেকি জগত থেকে একদম অন্যরকম একটা জগত । এখানে না এলে অজানাই থেকে যেতো ।

অবসর সময় সুনহরি একটা সাইকেল নিয়ে রবার প্ল্যান্টেশনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় । সবুজ সবুজ গাছগুলোতে আসমানি রং লেগেছে, মৃদু বাতাসে দুলছে পাতাবাহার । মাঝে মাঝে আনারস গাছ । রং বেরং এর পাখি বসেছে তাতে । প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে আপন মনে ।

সোনার মেয়ে নিবিষ্ট চিত্তে দেখে । ভাবে পরের জন্মে প্রজাপতি হবে । উড়ে বেড়াবে এখানে ওখানে ।

রবার বাগানেই অনেকটা সময় কেটে যায় ওর। কঠিন মনের আড়ালে আছে এক নরম সত্তা। প্রকৃতির কোলে যেই সত্তা হংসপাখা মেলে উড়ে যায় সুদূরে।

ও হংসিনী, মেরি হংসিনী, কাঁহা উড় চলি ?

মেরে অরমানো কে, পংখ লাগাকে, কাঁহা উড় চলি ?

বাঁধনহীন মনটা উড়ে যায় কোন সে দূরদেশে, মেঘের ওপারে, অনাবিল আনন্দের রাজ্যে।

সন্ধ্যায় বাংলোয় ফিরে বসে একটা হালকা পানীয় নিয়ে। কোনো কোনো দিন আসে বন্ধুরা, সহকর্মিনীরা। হাসি তামাশা হয়, গান হয়। এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল। একদিন তো স্থির করে ফেললো জীবনটা বড্ড ম্যাড় ম্যাড়ে হয়ে গেলো, এবার ঐ কুহেলির সমাধান করায় মনোনিবেশ করা যাক। আসলে যারা খুব সাহসী হন তাদের বোধহয় একঘেয়ে নিশ্চিন্তের জীবন বেশিদিন টানতে পারেনা। বোরিং লাগে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তারা অ্যাডভেঞ্চার খোঁজেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। এক সুন্দর সকালে সে কাউকে কিছু না বলে রওনা দিল সেই প্রত্ন রাজ্যে। অনেক দূর। সাইকেল নিয়ে যাবার সময় দেখা হল আম্মার সঙ্গে।

- কোথায় যাচ্ছিস এত সকাল সকাল ? আম্মার হাসি হাসি মুখটা ভেসে ওঠে নীল আকশের ক্যানভাসে।
- এই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি আরকি। মিষ্টি হেসে জবাব দেয় সুনহরি।

দিনটা আজকে খুব সুন্দর, পরিষ্কার। বুড়ি একগাদা গাছ গাছড়া নিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। আদিবাসী গ্রাম। একটি ছেলের খুব কঠিন ব্যাধি হয়েছে তাই সে শেকড় বাকড় দিয়ে ওষুধ তৈরি করবে। এত বয়সে বুড়ির এনার্জি ও ক্ষমতা দেখে সত্যি সুনহরি চমকিত। নিজের কাজের দ্বিগুণ উৎসাহ পায়। সাইকেল ঘুরিয়ে চলার পথে পা বাড়ায়।

অনেকটা রাস্তা পার হলে সেই ভগ্নস্তূপ। মেটে রং, কোথাও কোথাও শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। আগাছা, গাঢ় অন্ধকার, বুনোফুল সব কিছু মিলিয়ে এ রহস্যময় পরিবেশ।

ঢোকার মুখে একটি পরিত্যক্ত মন্দির আছে । সেখানে এক অদ্ভুত দেবী পূজিতা হচ্ছেন আজকাল । আছেন এক বৃদ্ধ পুরোহিত । এই প্রত্ন রাজ্যটি আবিষ্কৃত হবার পরেই ঐ পুরোহিত মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়ে পুজোর ঘটা শুরু করেছেন । সুনহরিকে দেখে কেমন অদ্ভুত মুখ করে বললেন : কোথায় যাচ্ছিস বেটি ? সুনহরি হেসে জবাব দেয় – বুঝতে পারছেন না ? এই ভূতের দেশে ঢুকছি ।

পুরোহিত একটু চমকে বলেন -বেটি এই জায়গা তো খুব খারাপ জায়গা জানিস না ? কেউ ফেরেনা একবার ওখানে গেলে । জোরে হেসে ওঠে সুনহরি । তারপর দুষ্টু হেসে বলে- কেন আপনি তো দিব্যি বহাল তবিয়তে রয়েছেন, অপদেবতা কি বেছে বেছে সাধারণ লোককেই মারে ? আপনি কি কোন বিশেষ মন্ত্র জানেন ওকে তাড়াবার ? আমাকেও একটু শিখিয়ে দিন না ।

পুরোহিত একটু বিরক্ত হন । চোখ কুঁচকে বলেন- সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা করা মোটেই ঠিক না ।

সুনহরি আর কথা না বাড়িয়ে গটগট করে যেন বৃদ্ধকে কিছুটা তাচ্ছিল্য করেই ঢুকে যায় ঐ গভীর প্রত্নরাজ্যে । পায়ে চলার পথ তৈরি হয়েছে ঘাসের বুকে । বড় বড় আগাছা, সাপ খোপের ভয় থাকতে পারে ভেবে ও বিশেষ জুতো পরে এসেছিল কিন্তু দেখা গেল যে রাস্তাটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন । হয়ত অনেক লোক আসাতে এই জায়গাটা সাপেদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে ।

কে বলে এখানে প্রাণ নেই ? দিব্যি হেসে খেলে বেরোচ্ছে গুটি কতক প্রজাপতি । মানুষ হয়ত নেই ।

সরু রাস্তাটা দিয়ে ও চলেছে । ভগ্ন প্রাচীরের গায়ে গায়ে জমা শ্যাওলা । বট, অশ্বথ গাছ । তক্ষকের ডাক । ভেজা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া হলেও একটা কেমন যেন মানুষের গন্ধ রয়েছে বাতাসে ।

অদ্ভুত লাগলো সুনহরির । মনে হচ্ছে এই এলাকায় মানুষের যাতায়াত আছে ।

সুনহরি চলেছে একটু সতর্ক পায়ে। বেশ কিছুটা অঞ্চল পেরিয়ে এসেছে একটি চাতালে। মনে হয় এটি এই প্রাসাদের অন্দর মহল। সার সার ভগ্ন ঘর, ঈষৎ ঘিঞ্জি। টানা বরান্দা, ইঁদারা গোছের একটা পাথরের পরিত্যক্ত জলাধার তাতে শুকনো পাতা ভর্তি। মেঝেটা কেমন খসখসে।

কালো মেঝে, অমসৃণ। টুপটুপ করে সাদা রংয়ের বুনো ফুলো ঝরে পড়ছে অচেনা গাছ থেকে।

মুগ্ধ হয়ে যায় সুনহরি। তার জীবনে নানান ধরণের পরিবেশ দেখেছে সুনহরি। কিন্তু এরকম জায়গা একটাও দেখেনি। আর প্রত্ন অঞ্চল বলে ঘোরার সময় একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চও হচ্ছে।

কত না কাহিনী, কতনা গল্পগাথা, হাহাকার বন্দী আছে এই প্রাসাদের কোণায় কোণায়। জানতে ইচ্ছে করে, ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে তার। কে বলবে তাকে ? যে জানে সে কি বেঁচে আছে ?

কোন জাতিস্মর যদি থেকে থাকে কোথাও সে হয়ত বলতে পারবে।

আঁকা বাঁকা মরা নদীর রেখা দেখা গেলো। খুবই শীর্ণ। সেই নদী পেরিয়ে ওপাশে প্রাচীন মানুষের তৈরি পাথরের যন্ত্রপাতি, দেখা গেলো। খনন কার্য শুরু হয়েছিল মনে হয়।

আছে ধূসর দেওয়ালে লাল লাল স্বস্তিক চিহ্নের মতন গুহালিপি। কি ভাষা বোঝা যায়না। জায়গাটা বহু পুরনো ও জীর্ণ হলেও কি যেন একটা মাদকতা ছড়িয়ে আছে চারপাশে। পুরণো স্তম্ভের গায়ে বৃষ্টির জল জমে টলটল করছে। বাতাসের সঙ্গে কানাকানিতে এই নিঝুম পুরীতে এক সুরের হিল্লোল তুলেছে। আরো খানিক এগিয়ে ভগ্ন মন্দির, অশ্বরুঢ়া দেবী ভয়ানক তার মুখ, লোলজিহ্বা দেখা গেলো। এই দেবী কি নামে পূজিতা হতেন ? এই কি রাজবংশের কূল দেবতা ছিলেন ?

এইসব ভাবতে ভাবতে সে এসে পৌছালো একটি উঁচু দালানে। একদিকের দেওয়ালে নানান ভঙ্গিমায় মিথুন মূর্তি, অন্যদিকের অংশটি একটু নড়বড়ে কিন্তু সেখানেও কালো পাথরেও ওপরে কিছু লিপি খোদিত আছে। সবই কালের ভারে জর্জরিত। কোথাও কোথাও পৌরানিক কাহিনী

স্থাপত্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করা আছে বলে মনে হয়। সবুজে ঢাকা লাল পথে ফুলের সলমা চুমকি ছড়ানো।

এই অসাধারণ প্রত্ন অঞ্চলের গুরুত্ব অপরীসীম। যদি সত্যি এই স্থান নিয়ে গবেষণার সুযোগ পেতেন প্রত্নবিদেরা তাহলে আরো একটি সভ্যতার কথা জানতে পারতেন সভ্য মানুষ। একটি বিশলাকৃতি পায়ের ছাপ রয়েছে। মানুষের মতন কিন্তু লম্বায় আন্দাজ ২ ফিট হবে। কার পদচিহ্ন জানা নেই।

ভীমের কি ? নাকি হিড়িম্ব অথবা ঘটোৎকচ ?

পুরোটা দেখা হয়নি, যেটুকু দেখেছে তাতেই মনে হয় জায়গাটি ওয়েল প্ল্যানড্। একটি উঁচু টিলা রয়েছে। নীচেটা ভারি সুন্দর। পাহাড়ের খাদ জাতীয় দেখা যাচ্ছে। খাদ বলা হয়ত ঠিক নয় এদিকটা একটু উঁচু একটি স্থান। ওদিকে কত গাছ গাছালি, সবুজের মেলা। মেটে দালান আর সবুজের মিলণ একটি সুন্দর কনট্রাস্ট এনেছিল। একটু ঝুঁকে দেখতে গেলো এমন সময় পেছন থেকে হঠাৎই সজোরে এক ধাক্কা। জোরে। টাল সামলাতে না পেরে সুনহরি গড়িয়ে গেলো নিচে দিকে। কিন্তু বডি ফিটনেস চূড়ান্ত থাকায় পড়ার আগেই ঘুরে সেই ব্যাক্তিকে বিশ্রীভাবে আঁচড়ে দিলো হাতে। তার অনেকটা হাত কেটে গেলো। লোকটির মুখ কালোকাপড়ে ঢাকা ছিল। সুনহরি কিন্তু নিচে পড়েনি। একটি বড় গাছে আটকে গেলো। জায়গাটা ঝোপঝাড়ে ভরা। নানাবিধ গাছের সমাহার ঘটেছে ওখানে। কোনটা ছোট কোনটা কাঁটাওয়ালা গাছ। সেই গাছের গায়ে দোলনার মতন আটকে যাওয়া সুনহরি অনেক কষ্টে নেমে এলো ঢালু জমিতে। হাত পা কেটে গেলো। সে তো গড়িয়ে নেমে এসেছে অনেক নিচে তারপর আটকে গেছে গাছে। ক্ষতবিক্ষত মেয়েটি প্রায় ডাল শুদ্ধু ভেঙে পড়লো মাটিতে। ব্যাথায় হাত পা টনটন করছে।

কোনক্রমে পা টেনে টেনে সে চললো। এদিকে সুর্যর তেজ কমছে। সুনহরি এতই ধীরে চলছিল যে নীচে দেখা যাওয়া রাস্তা পর্যন্ত পৌছাতে ওর অনেক সময় হয়ে গেলো। তারপর একটি চলমান গাড়িকে হাত দেখিয়ে সে অতি কষ্টে থামালো। সেটি একটি মাল বোঝাই ট্রাক। খালাসী ওর অবস্থা দেখে হতভম্ব। গাড়ি থামতেই এক লাফে সে নেমে এলো। ও অনুরোধ করলো

ওকে পৌঁছে দেবার জন্য । ট্রাকটি সেই রাস্তায় যাচ্ছিলো । ওরা ওকে ধারাধরি করে তুললো সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে । খুব ব্যাথা লেগেছিল । ড্রাইভারের সীটটা তো অনেক উঁচু ! হাড়গুলো যেন মড়মড় করে উঠলো । ব্যাথায় কঁকিয়ে ওঠে সে । ড্রাইভার তার মোটা পিঠে দেবার গদিটা এগিয়ে দিলো ওর দিকে । বসবার সুবিধার জন্য । গাড়ি চলতে শুরু করলো । চালক ওকে যথাস্থানে পৌঁছে দিলো, ওর এলাকায় । সুনহরি নেমে ধন্যবাদ জানাতেই অশিক্ষিত খালাসী বলে উঠলো – মেম্‌সাব আপ ঠিক হো যাইয়ে । বাস ! অনেক কষ্টে একটু হেসে সে হাত নাড়লো । তারপর ওর বাসার দিকে পা টেনে টেনে হাঁটা লাগালো । রক্ত ঝরছে দেহ থেকে । কিম্ভুতকিমাকার চেহারা হয়েছে ওর । বাড়িতে গিয়ে ওর অবস্থা দেখে অন্যরা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলো । কি করে হল এই অদ্ভুত ঘটনা । সুনহরি বললো – আগে ডাক্তার ডাকো, বিশ্রাম নিই পরে সব শুনো । আমি খুব ক্লান্ত । সেইমতন সব ব্যবস্থা হল । দিন দুয়েকের মধ্যে সে মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেলো । কিন্তু কে তাকে ফেললো আর কেনই বা ফেললো তা কিন্তু রহস্যই রয়ে গেলো।

এলাকার আইনজ্ঞ বেনুগোপাল একটি পার্টি দিয়েছেন । অনেকেই আমন্ত্রিত হলেন । মাঝে মাঝেই উনি এরকম অনুষ্ঠান করে থাকেন । লোকাল লোকেদেরও একটি উৎসব মুখর সন্ধ্যা কাটে । এন্তার মদের ফোয়ারা আর বিলাতী সমস্ত খাবার চেটেপুটে খেতে বহু মানুষ ভীড় করেন ।

সুনহরিও কখনো কখনো আসে । আজও এসেছে । টিপটপ সেজেছে ।

যদিও আজ পার্টিতে তার মানুষের গন্ধ অসহ্য লাগছে । সদ্য ঘটে যাওয়া বিভীষিকা থেকে সে যে মুক্তি পেয়েছে তাই নিয়েই চিন্তায় মশগুল । তবুও এসেছে । জখম হয়ে একা একা ঘরে বড্ড দম বন্ধ হয়ে আসছিল । তাছাড়া আরো একটি ভাবনা মনের মধ্যে কুরেকুরে খাচ্ছিল । সেটা হল ; যে ওকে মারবার ফন্দি করেছিল সে আবার অ্যাটেম্পট নেবে না তো ! এইসব ভাবছিল এমন সময় বেণুগোপল এলেন । একটু দূরে বসা মিসেস কেশবনের সঙ্গে হেসে কথোপকথন আরম্ভ করলেন । উনি সুনহরিকে দেখেন নি । একটি ফুলগাছের আড়াল দুজনের মধ্যে । বাহারি পাতার

ফাঁক দিয়ে সুনহরি দেখতে পেলো ওনার হাতে একটা প্রকান্ড ব্যান্ডেজ। কেশবন জানতে চাইলেন, হাতে কি হয়েছে আপনার ?

বেণুগোপাল স্বভাবসিদ্ধ হেসে বলে ওঠেন : এই একটু কেটে গেছে।

এতখানি ? কেশবন বিস্মিত।

হ্যাঁ গাড়ির দরজাটা চেপে দিয়েছিলো তাতেই হাতটা গেছে চেপে। মাংস খুবলে এসেছিলো।

বেণুগোপাল সপ্রতিভ। গলায় নেই কোন স্বরের উঁচু নিচু খেলা। আজ কিন্তু একবারো বললেন না : ক্রাইম নেভার পেজ ! আশ্চর্য ! তবে কি উনি কিছু আঁচ করেছেন ? কিন্তু সুনহরিকে তো উনি দেখতে পাননি ! বোঝা যাচ্ছে না, দুঁদে উকিল বলে কথা।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে তখন দুয়ে দুয়ে চার করছে সুনহরি। কাউকে কিছু না বলে সে পার্টি থেকে চলে এলো। পরদিন আবার সেই প্রত্ন এলাকায় গেলো। এবার সোজা ধরলো পুরুৎ কে।বেণুগোপালের সব কথা জানার জন্য পুরো ঘটনা খুলে বললো। পুরুৎ কে পুলিশের ভয় দেখালো। বললো তার ওপর মহলে কানেকশনের কথা। পুরুৎ প্রথমে কিছু না বললেও পরে স্বীকার করলো যে সবই আগে থেকে জানতো। সে জানতো যে বেণুগোপাল লোককে অযথা ভয় দেখিয়ে এই জায়গা থেকে দূরে রাখতো। সে এখানে চরস, গাঁজা, হাসিসের কারবার চালাতো। মন্দিরের পুরোহিত ছিল অলিখিত পাহারাদার। তার মাসোহারাও জুটতো। যতবার প্রত্নতাত্ত্বিকের দল এসেছে হয় বেণুগোপালের সাগরেদের হাতে মারা গেছে নয়ত ভয় পেয়ে পালিয়েছে। পয়সার লালসায় বেণুগোপাল এই পরিত্যক্ত অঞ্চলকে ওর কর্মকান্ডের হেড অফিস করে তুলেছিল। ঐ প্ল্যান্টেশন এলাকায় কিছু দোকানে নেশার দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিত ড্রাগস্। ফলে লোকজন সেইসব দোকান থেকেই অনবরত জিনিস কিনতো। বিরাট নেটওয়ার্ক ছিল তার। কেরালার সমুদ্র তীরে নোঙর করা থাকতো বিশাল জাহাজ। পাড়ি দিতে চোরাচালানের জিনিস নিয়ে সুদূর কোন দেশে। কোটি কোটি টাকার লেনদেন হত ওর বিদেশী মক্কেলের সঙ্গে। কিছু কিছু দরিদ্র মেয়েকে ধরে নিয়ে পাচার ও করা হয়েছে তবে মুল ব্যবসা সেই ড্রাগস ইত্যাদিরই ছিল।

সচরাচর কারো নজর এদিকে পড়বে না। সেও সব কাজ সারতে পারবে চুপিসারে। তাই বেছে নিয়েছিল এই এলাকা। লুকিয়ে লুকিয়ে গুপ্তধনের সন্ধানও সে শুরু করেছিলো। পুরোহিত সবই জনতো। কিন্তু সে তো ছিল ওদের কেনা গোলাম। হতদরিদ্র পরিবারের মানুষ সে। মোটা টাকার লোভে এই কাজে নেমেছিল। ছেলেপুলেগুলো খেয়ে পরে বাঁচবে। আসবে দৈনন্দিন শান্তি। একমুঠো চালের জন্য,অর্থের পেছনে ঘরতে হবেনা দিবানিশি।

হল রহস্য ভেদ। কুহেলীর সমাধান হওয়াতে সুনহরি যারপরনাই খুশী। একসময় স্টান্ট ওম্যান ছিল বলেই বোধহয় ওর বডি ফিটনেসের জন্য ও বেঁচে গেলো। নাহলে পূর্বজদের মতন তলিয়ে যেতো মৃত্যু সাগরে। টিকিটি কেউ খুঁজে পেতোনা। আর গড়পরতা মেয়ে হলে হত নরম সরম তাই হয়ত তলিয়ে যেতো খাদের অতল গহ্বরে। ঝট করে ঘুরে আঁচড়ে দেওয়ার জন্যে নিজের সযত্নে রক্ষিত লম্বা নখগুলোকে মনে মনে তারিফ না অরে পারলো না, যাকে একসময় ওর স্বামী বাঘনখ বলে ব্যঙ্গ করতেন। বলতেন : তুমি মেয়ে তাই কমজোরি সেই জন্য এত বড় বড় নখ রেখেছো হিংস্র জন্তুদের আঁচড়ে দেবার জন্য। সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতে ভুলো না।

আজ বেঁচে থাকলে উনি দেখতেন সত্যি নখের জোরেই বেঁচে গেলো তার স্ত্রী, প্রথম রাতে যার নখের খোঁচা উনিও খেয়েছিলেন।

আমরা মেয়েরাও পারি, কোন অংশে আজ আর আমরা পিছিয়ে নেই : নিজের মনেই আত্মতৃপ্তির একটি হাসি হেসে সে পা বাড়ালো পুলিশ স্টেশানের দিকে, ৫ মাইল দূরে।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো একটি রাস্তার কুকুর। সাদা লোমওয়ালা, স্নো বলের মতন দেখতে।

বন্ধু নাকি পাহাড়াদার বোঝা গেলোনা।

জলপরী

সমুদ্রের কিনারায় এসে দাঁড়ালো মহিলা স্কুবা ডাইভার রুমঝুম । এই জায়গাটা পূর্ব ভারতের সাগর তীরে, লছমনবেলা নাম ।

রুমঝুমের পরণে হলকা নীল ড্রেস । চোখে চশমা । পাশে দাঁড়ানো এক টগবগে যুবক হিমেশ ।

হিমেশ ঝুনঝুনওয়ালা । পর্যটক, এসেছেন স্কুবা ডাইভিং এ ।

রুমঝুম বাজে ঝুনঝুন – কলেজে সবাই এই বলেই তো তাকে ক্ষ্যাপাতো ।

হিমেশের গানের গলা ছিল অ–সাধারণ । গান করতো কিশোর স্টাইলে গমগমে গলায়।

যেকোন ফাংশানে ভরাট গলায় গেয়ে উঠতো– আজি বসন্ত জগ্রত দ্বারে দ্বারে –

মাঝে মাঝে মুচকি হেসে আড়চোখে রুমঝুমের দিকে চাইতো ।

কলেজের চত্ত্বর ছেড়ে একটা সময় চললো পাড়ায় গান গাওয়া । তারপর জলসা, মঞ্চের হাতছানি শেষে সিনেমার প্লে ব্যাক সিঙ্গার । হিমেশ ঝুনঝুনওয়ালা হল সবার কর্ণের মধুর ধ্বনি ।

হ্যাঁ মহেন্দ্র সিং ধ্বনি নয় মধুর ধ্বনি ছদ্মনামেই সে গাইতো । বাংলা ছেড়ে এলো বম্বে । মুম্বাই হয়নি তখনও । খুব অল্প সময়েই নাম কিনে ফেললো সে । প্রথম ব্রেক দেন প্রখ্যাত মিউজিক ডাইরেকটর প্রযশ খান্না । হিমেশের গান : সায়োনারা, সায়োনারা মেরা দিল চুরাকে-- খুব হিট হল । ঘরে ঘরে মুখে মুখে চলে সেই গান ।

তারপর বেশ অর্থ বল হতেই ওরা বিবাহ করলো । রুমঝুম তো তখন একেবারে কচি, একটি ফুলের কলি । কয়েক বছর খুব আনন্দেই কেটে গেলো । দেশে বিদেশে গানের প্রোগ্রাম । নানান স্বনাম ধন্য সুরকারকে

চাক্ষুষ করা এমন কি রুমঝুমের পরম প্রিয় লতা মঙ্গেশকরকেও তো একদম সামনাসামনি দেখলো একদিন। খুব রোমাঞ্চ হয়েছিল ওর বুকে।

কৃষ্ণচূড়া শোন শোন গানটা গাইলেন উনি। দারুণ লাগছিল। শেষের দিকে তো রুমঝুমও গেয়ে উঠেছিলো। *সারা বেলা দোলায় তোকে ক্ষ্যাপা হাওয়াতে, পায়ের শব্দ যায়না শোনা পাতার আওয়াজে* শুনে হিমেশ বলেছিল – এত সুন্দর গলা তোমার!

–কিন্তু আমি তো তোমার মতন এত বড় গাইয়ে নই!

- তাতে কি এতো সুন্দর গলা যার সেটাই তো একটা চেরিশ করার মতন ব্যাপার। আর গান তো লোকে নিজের জন্যেও গায়। সবার গানকে কি পয়সা দিয়ে কেনা যায়?

দেখোনা গিরিজা দেবী, এম এস শুভলক্ষ্মী, গাঙ্গুবাই হাঙ্গল এঁদের গানকে কি কেনা যায়?

মনে মনে খুব আনন্দ পেয়েছিল রুমঝুম। নাম তার রুমঝুম কিন্তু এক পাও নাচতে জানতো না। বরং গান গাইতো। বাবা মা শখ করে ভর্তি করেন নাচের ক্লাসে। স্টেপ ভুল করায় গুরুর কঞ্চির বাড়ি খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে একদিন ছেড়ে দিল নাচ। গান গাইতো। নিজের মনে।

রেডিও শুনে শুনে। বন্ধুমহলে প্রশংসাও পেতো। কিন্তু স্কুল জীবনের পরে চর্চা না করায় গলা বসে যায়। অনেকবার গান গাইতে গিয়ে গলা ধরে যেতো, চোখ দিয়ে জল বেরোতো।

কিন্তু লতার সামনে একবারে ঠিকঠাক সপ্ত সুরের দোলা লাগলো। হয়ত সেটা লতাজির কৃপায়।

সুন্দর সাজানো সংসার তাদের। হঠাৎ একদিন শুরু হল হিমেশের মোটা হওয়া। প্রথমে ৭৫ তারপর ৮০ তারপর ৮৮ এবং একদিন ১০০ কিলো ছাড়িয়ে গেল। ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার হিমেশকে নদনদে শুয়োরের মতন দেখাতো। এরপর একেবারে ১৫০ কিলো। উঠতে কষ্ট, বসতে কষ্ট, নড়তে চড়তেও। একটুতেই হাঁফ ধরে যেতো। শরীরে যেন হাড্ডি বলে কিছু ছিলনা। আপাদ মস্তক মেদের আস্তরণ। নিঃশ্বাস নিলে ঘো ঘো

আওয়াজ হত । হাঁটলে চললে মনে হত থপথপ করে একটি মাংসের বল গড়িয়ে যাচ্ছে । গানের আসরে ভাঁটা পড়লো । ঐ শরীর নিয়ে সে আর পেরে উঠতো না । বিবাহিত জীবনেও এলো দু:খের স্রোত । নিয়মিত সেক্স করতে পারতো না হিমেশ । নগ্ন হিমেশকে দেখে ভয় পেয়ে যেতো রুমঝুম । দম বন্ধ হয়ে আসতো ।

পাশের ফ্ল্যাটের বৌ গীতি অগ্রবাল । সুন্দরী, গ্ল্যামারাস, সুগঠনা । হাসলে মুক্তো ঝরে। তার স্বামী বীর সিং তাকে ভাড়া খাটায় । পরিচিত লোক কিংবা বন্ধুবান্ধব দুপুরবেলা এসে ওর সঙ্গে শোয় । মাঝে মাঝে পাতলা দেওয়াল ভেদ করে হা হা হি হি, উ উ ম, চুকুস শব্দ ভেসে আসে ।

একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে হিমেশ বলেই ফেললো – তুমিও ওরকম করো না, কিছু অর্থও আসবে আর আমি তো আজকাল পারিনা !

গ্রীবা বেঁকিয়ে ঝাঝিয়ে ওঠে রুমঝুম – কি করে এত নোংরা কথা বললে তুমি ?আমি কোন অনুযোগ করেছি নাকি ?

- আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে আমি কি পারবো স্বামীর কর্তব্য পালন করতে? তুমি তো সেই অন্যপুরুষে যাবেই । তার চেয়ে আমার পরামর্শ মতন গেলে আমি অন্তত: নিজের বিবেক দংশন থেকে রক্ষা পাবো ।

হেলথ্ সেন্টার, ডায়েটিং কিছুই পারেনি ওজন কমাতে । শেষে গ্যাস্ট্রিক সার্জারি করার কথাও ভেবেছে কিন্তু পেটে ফ্যাট জমে ইন্সুলিন সিক্রিয়েশন বন্ধ হয়ে সুগার চেপে ধরায় রক্তারক্তির ভয়ে সেটাও বাতিল হয়েছে ।

অবশেষে একদিন মনোকষ্ট নিয়ে ঘর ছাড়ে রুমঝুম । হিমেশের হীনমন্যতার কারণে।

ভয় । একটা ভয় ধরে গেলো রুমঝুমের মনে । বন্ধু বান্ধবদের প্রশ্ন করতো – হ্যাঁ রে মোটা কি ছোঁয়াচে রোগ ? লোকে হাসতো । কেউ কেউ বলতো তুই মানসিক ডাক্তার দেখা । তোর ভয় টা সীমা ছাড়িয়ে গেছে ।

তারপর একদিন আন্দামান বেড়াতে গিয়ে রুমঝুম স্কুবা ডাইভিং করলো পর্যটক হিসেবে । অসম্ভব ভালো একটা অনুভূতি হল । স্থির করলো সে

এই প্রফেশনে আসবে। এতে ভবিষ্যতে মেদহীনও থাকা যাবে। যেমন ভাবা সেরকম কাজ। ভর্তি হল স্কুবা ডাইভিং স্কুলে। কোর্স শেষ করে ফেললো সাফল্যের সঙ্গে। ভালো লাগতো সময়টুকু নিজের মতন করে ব্যয় করতে। এক অচিন দেশে ভেসে বেড়াতে। মাছ গুলো কেমন প্যাট প্যাট করে ওকে দেখতো।

যেন বলছে- ব্যাপার কি ? ডাঙা তো শেষ করেছো এবার জলের তলায় হাত পড়েছে?

পিলপিল করে এবার এখানে ঘাঁটি গাড়বে ? ছারপোকার মতন এখানে বংশবৃদ্ধি করে আমাদেরও বারোটা বাজাবে ? আর হাঙরগুলো তো সাংঘাতিক। গিলে খেতে আসে। একদিন তো একটা মানুষের বীভৎস খুলি দেখে প্রায় আঁৎকে উঠেছিল ও।

তবুও বাকিটা আনন্দময়, রোমাঞ্চ, শিরদাঁড়া খাড়া করা অনুভুতি সবমিলিয়ে এক অদ্ভুত আবেগে একদিন স্বেচ্ছায় যোগ দিল টুরিস্টদের স্কুবা ডাইভিং করানোর দায়িত্ব নিয়ে। আজ এখানেই আবার দেখা হিমেশের সঙ্গে। কিন্তু এই হিমেশের সাথে পুরনো হিমেশের কোন মিল নেই। এই হিমেশ একদম স্লিম। পেটানো পেশীবহুল। সুইমিং কাস্টিউমে অনবদ্য। সুঠাম দেহের মোহে যে কোন নারী আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে। ডুব দিতে পারে পৌরুষের অতল গহ্বরে। গায়ের রংটাও আগের মতন দুধের ছানার বর্ণ নেই। বেশ ট্যানড্ হয়েছে। ওষ্ঠে একটা পোড়া পোড়া রং এসেছে। আগে চুমু খেলে কেমন সুড়সুড়ি লাগতো এখন বেশ ভালো লাগবে। নিকোটিনের গন্ধে বেশ রোমান্টিক একটা অনুভুতি হবে। ভেবেই ভালো লাগছে রুমঝুমের। ওর আদর্শ পুরুষ ছিল পুরুষাকার। কিন্তু কলেজ জীবনে যাকে মনে ধরলো সে নরম গোছের। তবুও ভালোবাসার জন তো।

সবসময় মনের মাঝে আঁকা চিত্রের সঙ্গে না মিললেও মনের মিল হয়।

তারপর ঘর বাঁধে মানুষ।

রুমঝুমের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। শেষে তো স্বপ্নটুকুও মারা গেলো। কিন্তু আজকের হিমেশ তার স্বপ্নের পুরুষ। অদ্ভুত জেল্লা এসেছে ওর দেহে। হয়ত মনেও। কি করে হল এই অসম্ভব সম্ভব ?

পর্দার আড়ালে আছেন চাঙ্কী পান্ডের মা। পেশায় চিকিৎসক। একটি বই লিখেছেন স্থুলত্ব নিয়ে। সেই বই এর ডায়েট ফলো করে ও নিয়মিত যোগাসন করে আজ হিমেশ আবার রাজপুত্র। গানের রেকর্ড ও বেরিয়েছে। নতুন রেকর্ড - বিতে হুয়ে লমহে। তাতে অনেক গানই বাঁধা হয়েছে রুমঝুমকে নিয়ে। ওদের জীবন নিয়ে। রুমঝুম এসব কিছুই জানতো না। আজকাল তার সভ্য জগতের সঙ্গে বড় একটা যোগাযোগ হয়না। সে জলপরী। জলে ডুব দেয়। ডাঙায় উঠেই আবার ডুব দেয় নিজের জগতে। সে তো ডুবুরি। ডুব না দিয়ে পারে ? জলই হোক কিংবা বাতাস !

মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনে চলে রুমঝুম। আর অন্য হাতে ধরা ছিপছিপে হিমেশ। দুজনে ভেসে চলে জলসমুদ্রে। জলের তলায়। মাথায় একটা চাপ লেগেছিল হিমেশের। প্রথমে। হয়ত অনভ্যাসের জন্য। তারপর রুমঝুমের হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে সঁপে দিয়ে জল রাজ্যে ভেসে চললো। কত কোরাল রিফ (প্রবাল দ্বীপ), অদ্ভুত গাছ্পালা দেখা হল। সামুদ্রিক মাছ, ভগ্ন জলযান যার ভেতরে প্রেতপুরীর মতন এক একটি কোটর শুন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে, রং বেরংয়ের মাছ আর মৎস্য কন্যা তো সঙ্গেই রয়েছে। কোরাল রিফ গুলোকে ছুঁয়ে দেখছিল হিমেশ। রুমঝুমের মনে হল বিয়ের পর পরেই ঠিক এইভাবেই তার সারা শরীরকে ছুঁয়ে দেখতো হিমেশ। ঠোঁট, কপাল, বক্ষযুগল, নাভীমূল এমন কি যোনিপথ।

পুরুষের স্বাভাবিক উগ্রতায়, ব্যস্ততায় সে নারীদেহের সবটুকু সুধা চেটেপুটে খেতে অগ্রহী ছিল।

অনেক সময় মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছে হিমেশ একদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। চাঁদ ঘুমায়, রাতপাখিরাও ঘুমায়, জেগে থাকে দুটি চোখ, মুগ্ধ, বিস্মিত।

-তুমি খুব সুন্দর রুম। হিমেশের সরল স্বীকারক্তি। রুমঝুম খুশি হয়। মেয়েরা রূপের প্রশংসা শুনলে ভারি খুশি হয়। তাদের বরেরাও। তবে আজকাল তো সুন্দরীর কনসেপ্ট পালটে গেছে।

মুখশ্রীতে লোকে আর জোর দেয়না তত। বরং দেহ বল্লভ, উচ্চতা, মুখের হাড় বেরনো, চোয়াল ভাঙা মানে মোটামুটি বাঙালী পার্সপেক্টিভে যারে কয় ডাকিনি সেরকম চেহারাই বেশী সুন্দরের লক্ষণ। রুমঝুমের গায়ের রঙ খুব সুন্দর, পাকা গমের মতন কিন্তু ওর বোন ঝিলমিল বেশ কালো। মুখ চোখ ভালো। কিন্তু যেহেতু কালো অতএব বাঙালী মতে কুৎসিত। বাঙালী তো তেমন মদ খায় না বাড়ির বৌয়ের গায়ের রং ধুয়ে জল খায়। পাড়ার ছেলেদের তাড়নায় রাস্তায় বেরোতে পারতো না সে। প্যাঁক দিত– কালিয়া কালিয়া।

ঝিলমিলের দু:খ ছিল। তাই ওদের কাকুমণি একদিন সান্ত্বনা দিলেন।

–দেখ ঝিলু তুই তো তেমন কালো নোস। কালো চার প্রকার। টেলিফোন কালো, মিশ কালো, ভ্যাবাচ্যাকা কালো আর বাপরে কালো। তা তুই পড়িস টেলিফোন কালোর দলে। এমন কিছু নয়।

ঝিলমিল কিছুই বুঝলো না। হাঁ করে চেয়ে আছে কাকার দিকে দেখে উনি এক্সপ্লেন করলেন।

টেলিফোনের মতন কালো হল টেলিফোন কালো, মিশির মতন মিশকালো, যেই কালো দেখে লোক ভ্যাবাচ্যাকা খায় তা হল ভ্যাবাচ্যাকা কালো আর যাকে দেখে লোকে ভয়ে পেছন ঘুরে দৌড় মারে সে হল বাপরে কালো। তুই তো সেরকম কালো নোস। তুই একদম বেসিক লেভেল কালো।

ঝিলমিলের কালো মুখে উজ্জ্বল হাসি। রুমঝুমের মুখটাও ঝিলমিলের মতন কিন্তু সে খুব ফর্সা তাই সুন্দরীর দলে। যদিও ছোটবোনের জন্য তার মনোবেদনা হত। সত্যি লোকে পারেও বটে। দুনিয়ায় যেন মানুষের চেহারা বিশ্লেষণ করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ওর ডাইভোর্সও তো হল সেই চেহারার জন্যই। স্থূলত্ব। এতটাই বেমানান যে স্বামী হীনমন্যতায় ভুগে নিজেই তাকে বলছে অন্য পুরুষের শয্যা সঙ্গী হতে। তখন খারাপ লেগেছিল কিন্তু আজ বোঝে সেই অনুরোধের অন্তরালে কি গভীর কষ্ট ছিল হিমেশের। কি যন্ত্রণা। দু:সহ বেদনা। একটা সময় তো হিমেশের জন্য অর্ডার দিয়ে বিশাল মাপের শক্ত পোক্ত কাঠের চেয়ার তৈরি করতে হত। এমন কি শৌচকার্যেও সাহায্য লাগতো। সোফায় বসতো না সে।

বসলে সোফা ডেবে যেতো। কমোড তৈরি করতে হত অর্ডার দিয়ে। ভাগ্যিস অর্থবল ছিল তা নাহলে কি হত কে জানে!

থাইরয়েডের কোন সমস্যা নেই, বিয়ার খায়না দেদার তবুও এত মেদবহুল কেন যে হয়ে পড়েছিল কে জানে! ওজন যেন গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটার মতন বাড়তো।

পুরনো ঝাঁপি খুলে ভাসছিল রুমঝুম। হঠাৎ একটা হাঙরের আগমনে ওর হাতটা জোরে চেপে ধরলো হিমেশ, ভয়ে ওর গায়ে একটা ছমছামানি জেগে ওঠে। শিহরণ হল রুমঝুমেরও সারা দেহে। ভালোলাগার, নির্ভরতার আত্ম গরিমায়। ডাঙায় তুমি রাজা হলেও জলে আমিই জলপরী। আমিই আজ তোমার রক্ষক হে পুরুষ! মনে মনে এগুলো না বলে পারলো না রুমঝুম।

আমাদের পরিচিত জগতের বাইরেও যে এমন মোহময় জগত রয়েছে জলের নিচে না নামলে কোনদিন জানা হতনা হিমেশের। এও এক অন্য সভ্যতা। জলচর সভ্যতা। নিচে স্বচ্ছ তল, নানাবিধ জন্তু জানোয়ার, শামুক, ঝিনুক, প্রস্ফুটিত প্রবাল, সামুদ্রিক গাছগাছালি, ঝাঁকে ঝাঁকে কত মাছ সব মিলিয়ে অনবদ্য। যদি আর কোনদিন ডাঙায় না উঠতে হত? কি মজাই না হত।

কিন্তু সারা জীবন তো ওখানে কাটানো সম্ভব নয়। তাই একটা সময় সমস্ত মুগ্ধতা কে ফেলে রেখে একরাশ আনন্দ পকেটে ভরে ওরা উঠে এলো চেনা জগতের ঘেরাটোপে।

হাত ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো হিমেশ। রুমঝুম নিজের ড্রেস বদলে এলো। একসঙ্গে ওরা সাগরকিনারে নারকেল পাতায় ছাওয়া একটা দোকানের নিচে বসে কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতলে ঠোঁট ডোবালে। দিনের এই সময়টা সমুদ্র শান্ত থাকে। নীল ফেনিল তরঙ্গমালা আছড়ে পড়ছে তীরে।সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে নিজেকে বড় দূর্বল মনে হয় হিমেশের। কিন্তু আজ তলদেশ সফর শেষে আর তত খারাপ লাগছে না। ওখানেও আছে প্রাণের স্পন্দন। নি:শ্বাসের বিন্দু। একটা সুনামী পারেনা প্রাণের অস্তিত্বকে নি:শেষ করে দিতে এই গ্রহ থেকে। রয়ে যাবে আরো শত শত অজানা চেতনার উষ্ণতা। খুব ভালো লাগছিল হিমেশের। মনে মনে কল্পনার জাল বুনছিল

রুমঝুমও । হিমেশকে কিভাবে সে জানাবে তার হৃদয়ের কথা । সে যে আবার ঘর বাঁধতে চায় এই নবজীবনের সঙ্গে । হিমেশ কি কিছু বলবে ? কখন বলবে ? কৈ বলছে না তো ! অনেক ক্ষণ তো পেরিয়ে গেল ওরা ডাঙায় উঠেছে ।

- কাল সন্ধ্যায় হোটেল ডোনাটেলায় একটা পার্টি থ্রো করেছি তুমি কি আসবে ?

এই তো মুখ খুলেছে সে, বেজেছে হৃদয়ে ঝঙ্কার, ছিন্ন বীণা জোড়া লাগাতে সেও উৎসাহী তাহলে । বেশ বেশ । রুমঝুমের মুখে বেশ একটা জয়ী জয়ী ভাব ।

আকাশে ঘন মেঘ । ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামলো । ভিজে যাচ্ছে সে, তার সমস্ত সত্তা । আনন্দে, উল্লাসে। মনে মনে গেয়ে উঠলো -- রিমিঝিমি এই শ্রাবণে, কালো মেঘে ভরা গগনে চাই যেতে অভিসারে, ওগো এসো তুমি এসো মোর ঘরে -----

পরদিন ছুটি নিল সে। কাজে গেলনা । সারাটা দিন মনে মনে কত না কল্পনা করলো । কিভাবে সে বলবে একসঙ্গে বাকি জীবন কাটানোর কথা, আবার কিছু অঙ্গীকার, শপথ --- আচ্ছা ও কি ওমর শরিফের মতন রুমঝুমের গ্রীবায় আলতো চুমু খেয়ে প্রস্তাবটা দেবে ? নাকি চোখে চোখ রেখে বলবে অথবা অভিজাত সমাজের মতন হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে হাতটা ধরে--- নাহ্ ! আর ভাবা যাচ্ছে না ! দারুণ ভালোলাগায় মনটা ছেয়ে আছে । খুব ভালো লাগছে । ওর হুঁকো মুখো চাপরাশিকেও মনে হচ্ছে সদা হাস্যরসে সিক্ত । আসলে দুনিয়াটা পাল্টে গেছে ওর । এত রোমান্টিকতা যে ওর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তা কি ও জানতে পারতো হিমেশ ওর জীবনে আবার না এলে ?

ওর এক বান্ধবী পোড় খাওয়া মেয়ে । এখন আই বি অফিসার । সে বহু আগে ওকে একবার পরামর্শ দিয়েছিল - বিয়ে করবি টেকনোক্র্যাটদের । এইসব গাইয়ে, শিল্পী, অভিনেতা ফেতা কিংবা কবি এরা ওয়ার্থলেস । ঝটপট লোকের প্রেমে পড়ে যায় । এদের শ্রদ্ধা করবি, সম্ভ্রম দেখাবি কিন্তু স্বামীত্ব ? নেভার । বিজ্ঞানী বিয়ে করতে যাসনা । পাগলামোর চোটে একদিন পালাতে হবে । সারাটা জীবনই ওরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কাটিয়ে

দেয় । ঘাস সেদ্ধ করে রকেটের ফুয়েল বানাবে, তোর সাজানো বাগান দুদিনে মরুভূমি করে ছেড়ে দেবে । ওদেরই সব থেকে বেশি বৌ পালায় খেয়াল করবি । আর ব্যবসায়ীও অচল । খালি ডেবিট ক্রেডিটের হিসেব করে । শোওয়ার আগেও হিসেব করে নেবে এইবার শুলে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে কিভাবে সেটা ছায়া ফেলবে ।

নিজের মনে হেসে ওঠে রুমঝুম । সত্যি কি ছেলেমানুষই ওরা ছিল । এইভাবে কি র‍্যাশেনালি ভেবে চিন্তে জীবন কাটানো চলে ? ও তো হাঁফিয়ে উঠবে । হিমেশ আবার ফিরলো কিনা ওর কাছে ?তবে ? আসলে ঐভাবে অঙ্ক কষে তদন্ত করা চলে প্রেম নয় ।

সূর্য ডুব দিতেই জলপরী রওনা হল হোটেল ডোনাটেলার দিকে । পরণে ঘিয়ে রঙের শাড়ি, মিহি সিল্কের, তাতে পেঁয়াজি চওড়া পাড় । খোঁপায় মানান সই বেগুনি ফুল । কানে রুবি । হাতে ঝিনুকের ব্যাগ । নাহ্ ড্রেস কোড নিয়ে কখনই মাথা ঘামায় না রুমঝুম । ওর যেভাবে ভালোলাগে সেই ভাবেই সাজে । হালকা মেকাআপ করে । যাত্রা দলের মতন সঙ সাজার ওর কোন বাসনা নেই কোনদিনই । আর প্রকৃতি ওকে এমন সুন্দর দেহ ও মুখশ্রী দিয়েছে যে ওর না সাজলেও চলে । রূপের ছ্টায় ও প্রায় সবাইকেই ঘায়েল করে দিতে পারে ।

হোটেলে প্রবেশ করলো, চোখ গেলো কোণায় । গানের আসর হবে মনে হল । তা তো হবেই । হিমেশের পার্টি ।

আজা আজা হাত মার দে তালিয়া -- আসমান কো লুটেঙ্গে --ঝুম বরাবর ঝুম ! এ রাত বরি চিকনি হ্যায়, মাত খেল পিসল জায়েগা এ চাঁদ কা চিকনা --কুছ দের মে গল জায়েগা ---

হিমেশ এসে হাত বাড়ালো । সৌজন্য বিনিময় করার পর পাশের টেবিলে বসলো রুমঝুম ।

আশেপাশে নজর পড়ছে । কম বয়সী ছেলেপুলেরা চিল্লাচ্ছে নানান কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে হয়ত এস এম এস ভাষা কেউ চোখ টিপছে, ছেলে মেয়ে নির্লজ্জের মতন কোলাকুলি করছে, কেউ কারো পশ্চাৎ দেশে তবলা বাজাচ্ছে । এই সো কলড হাই সোসাইটির এক অদ্ভুত জগৎ । মেকি অথচ

শক্ত এক জালে জড়ানো । অদৃশ্য মাকড়সা আড়ালে বাঁদুর ঝোলা হয়ে হাসছে ।

ক্যাডবেরি কালারের লেহেঙ্গা ও ওপরে স্বল্পবাসের পোশাকে এক রমনীয় রমণী । খুব হাসছে । খিলখিল করে । ডাকিনী সুন্দরী । হঠাৎ রুমঝুমের দিকে চোখ গেল । ভ্রূ পল্লবে ঝিলিক খেলে গেলো । হিমেশকে প্রায় বগলদাবা করে ছুট্টে এলো মেয়েটি । একটু দূর থেকেও শুনতে পেলো রুমঝুম মেয়েটির সুরেলা গলার অনুরনন ---এই সেই রুমঝুম যে তোমাকে ফেলে পালিয়ে ছিল ? আজকে এসেছে যে বড় ? তোমাকে ভালোবেসেছিল না তোমার দেহকে ?

হিমেশের উত্তর কানে এসে পৌছালো না রুমঝুমের । তুমুল হৈচৈ ও গানের আওয়াজে ঢেকে গেল সেই উত্তর । শোনার চেষ্টাও করলো না আর । হিমেশ এসে মিষ্টি হেসে বললো- তোমাকে বলার সুযোগ হয়নি রুম ইনি হলেন আমার হবুপত্নী কামিনী সেহগল । আমরা একসঙ্গে গান করি । মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির নতুন মুখ । এক্সটিক ট্যালেন্ট । লোকে বলে ওকে একদম মধুবালার মতন দেখতে । হিমেশের সপ্রতিভ ইন্ট্রোডাক্‌শনের মাঝেও তার অসোয়াস্তি ধরা পড়ে গেল রুমঝুমের কাছে । মৃদু হেসে সে বললো- হাই । মধুবালার মুখটাকে ওর তখন একটা প্রেতিনীর মুখ বলেই মনে হচ্ছিল ।

সবার চোখ এড়িয়ে ঘরে ফিরে এলো রুমঝুম কিছু না খেয়েই । নিজেকে খুব নীচ মনে হচ্ছিল । কেমন পট করে হেরে গেলো সে হিমেশের কাছে । আর ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে হিমেশ কিন্তু তাকে কোন আশ্বাস দেয়নি । সে নিজেই নিজের মনে মনে স্বপ্নের জাল রচনা করেছিল ।

মেয়েটির কথাগুলো সবথেকে বেশ আঘাত করেছে ওকে । ও তো নিজে বেরিয়ে আসেনি ওর সাজানো ঘর ছেড়ে । হিমেশের ইনসিকিউরিটি, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স সব মিলিয়ে ওর দম বন্ধ হয়ে আসতো । হিমেশকে ও অনেক বুঝিয়েছিল । ওর বন্ধুরা বলতো কেটে পড় । আজকাল ভলোবাসা ফাসার কোন মূল্য নেই । নিজের আখেড় গোছাও । যেটা করলে সুবিধে হবে তাই করো । যাকে প্রেম নিবেদন করলে নিজের গ্রোথ হবে

তাকে ভালোবাসো। রোমান্স, হৃদয়ে উথাল পাতাল এইসব প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। ডাইনো স্টেগোরা করতো। তাই তো আজ ওরা বিলুপ্ত।

এতো গেলো যুগের কথা। আর নারীর মনের কথা? তা কিদৃশ? সেতো চিরটাকাল পুরুষকে ভালোবেসেই সন্তান চেয়েছে। সেতারি রবিশঙ্করকে অনুরোধ করেছিলেন ওনার বর্তমান ঘরণী -- আমি তোমার সন্তান চাই। সেও ভালোবেসেই।

মনের কি কোন নিয়ম হয়? এত যান্ত্রিকতা তবুও আজও তো পক্ষীশাবক মায়ের কোলেই আশ্রয় নেয় সৃষ্টির আদিকালের মতন। আসলে কিছু কিছু নিয়ম বদলায় না। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বদলেছে আদতে সে কিছু চিহ্ন রেখে যায়। অদেখা ছাপ। সেই ছাঁচেই আবার গড়ে ওঠে নতুন নিয়মাবলী। রোমান্স বেঁচে থাকে রুমঝুমের মতন নারীর মনে। জীবনকে সময় দেওয়া, প্রেমকে সময় দেওয়া আজও বাঙালী স্কুবা ডাইভার রুমঝুমের কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি।

বলিউডের আপাত কৃত্রিম জগতে তাই আজও লোকে ঘর বাঁধে। কিছু আশা ও স্বপ্ন নিয়ে।

রাত বেড়েছে। রুমঝুম শুয়ে পড়ে। বাতাসে হিমের গন্ধ। গায়ে আলতো করে বাহারি কম্বলটা টেনে নেয়। কখন যে দু চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে ও টের পায়না।

ঘুম ভাঙে পরদিন ভোরে।ল্যান্ড টেলিফোনের শব্দে। এত সকালে কে জ্বালায়? বিছানা থেকে উঠে দ্রুত এগিয়ে যায়। ওপাড়ে বান্ধবী রিনা।

- হ্যালো, কেন যে মোবাইল নিস না বুঝিনা বাবা! কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে তবেই লাইন পেলাম। শোন আজ খবরের কাগজ দেখেছিস?
- না রে, এই মাত্র তো উঠলাম। তোর ফোনের ঝঙ্কারে। কেন কি হয়েছে?
- খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে তোর এক্স হিমেশের পার্টির সবাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে।

বলিউড সঙ্গীত জগতের উঠতি তারকা কামিনী সেহগাল একমাত্র ভিকটিম যাকে বাঁচানো যায়নি । বোধহয় বেশী খেয়ে ফেলেছিল । অন্যরা চিকিৎসাধীন ।

কলকল করে কথাগুলো উগড়ে দিয়ে দম নেয় রিনা ।

হাত থেকে রিসিভারটা পরে গেলো রুমঝুমের টিপিক্যাল বাঙলা ছবির নায়িকার মতন ।

হাসপাতাল চত্ত্বরে তখন মিডিয়া ও টিভি চ্যানেলের ভীড় । তাদের খবর চাই, কাগজ ভরাতে হবে ।

হিমেশের বাঁচা মরা তত জরুরি নয় ওদের কাছে । মরে গেলে কি ভাবে খবরটা কভার করবে তাও ছক কষা হয়ে গেছে ওদের । প্রেসের লোককে ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল এক উদভ্রান্ত নারী । আলুথালু বেশ । উদাস নয়নী । হিমেশের কেবিনে ঢুকে গেল নির্দ্ধিধায় । চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছে হিমেশ । স্যালাইন চলছে । পাশের প্লাস্টিকের কৃত্রিম টুলে বসে পড়লো রমণী । আজ তার প্রতীক্ষা শুধুই হিমেশের জেগে ওঠার । মন সমুদ্রে ডুব দিয়েছে সে ঝিনুকের আশায় । তাতে মুক্তো না থাকলে চলে?

এসকর্ট

হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতমালা ও শীতল আনন্দের মধ্যে বাস করে এক মেয়ে। নাম তার রূপণ। রূপণ সিন্‌হা। বাবা অবাঙালী মা বাঙালী। ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়েছে একটি দূর্ঘটনায়। মানুষ হয়েছে দাদুর কাছে।

গ্র্যাজুয়েশান শেষ করে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়েছে। তারপর চাকরি নিয়েছে এক বড় সংস্থায়। সংস্থার বহু ব্যবসার মধ্যে একটি হিমালয়ে। মালানা এলাকায়। লোকচক্ষুর আড়ালে মারিজুয়ানা(মারিয়ানা/মারিহুয়ানা) সৃষ্টিকারী গাছ ক্যানাবিসের চাষ করে এই সংস্থা তারপর তা থেকে ড্রাগস্‌ বানিয়ে বাজারে ছাড়ে। দরিদ্র পাহাড়িরা চাষের ক্ষেতে বংশ পরম্পরায় কাজ করে। এই বিজনেস গ্রুপের মালিক এক সিন্ধি। নিখিল আওত্রাওয়ানি। তিনি মাঝে মাঝে বিজনেস ট্রিপে হিমালয়ে আসেন।

রূপণ ইভেন্ট ম্যানেজার হলেও আপাতত কাজ করে ওদের এসকর্ট হিসেবে। কোম্পানির এসকর্ট এর কাজ সাধারণত: বড় বড় বিজনেস টাইকুন অথবা সি ই ও দের এসকর্ট করা। ওঁদের প্রোগ্রাম ম্যানেজ করা ও সেক্সুয়াল ফেভার দেওয়া। রূপণ সমস্ত কাজই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করে বলে ওর বেশ নাম হয়েছে। যেকোনো হার্ডকোর বিজনেসম্যানকে খুব সুন্দরভাবে ও ম্যানেজ করে। বহু ডিল সাইন হয় ওর জন্য। ও রূপসী ও স্মার্ট। অ্যাগ্রেসিভ নয়, শান্ত সমাহিত। ওর সঙ্গ পেতে বহু মানুষ অগ্রহী। তাঁরা বার বার আসেন হিমাচলে। বিজনেস ট্রিপে।

এবার আসছেন ফিদেল রঁলা। ওঁর বিরাট ব্যাবসা। মূলত করেন জাহাজের ব্যবসা এবার ড্রাগ্‌স আমদানি করতে চান ভারত থেকে। হাই কমান্ড জানিয়েছেন যে এঁকে খুশি করতে পারলে অনেক মুনাফা হবে কোম্পানির। রূপণ যেন সর্বান্তকরণে চেষ্টা করে। জানেন সবাই যে সে কোনো ত্রুটি রাখবে না তবুও------

আজ পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন সবাই ওকে ভোগ করেছেন। কিন্তু রূপণের কোনো আক্ষেপ নেই। এটাকে সে বিজনেসের অংশ হিসেবেই ধরে।

আর এসব তো অনেকেই করে। ও মুখোশ খুলে করে অন্যরা মুখোশ পরে।

সোসাইটি গার্ল বা হাই সোসাইটি প্রস কনসেপ্ট তো নতুন নয়। অনেক সুচাকুরে ভদ্রমহিলাও আজকাল দেহপসারিনী।

বিদেশে তো একজন নারী অনেকের সঙ্গেই বিছানায় যায়। তাকে তো কেউ প্রস বলেনা। ভারতেই যত ন্যাকামো। অদ্ভুত দমবন্ধ হওয়া দেশ। তবে হিমালয় অনন্য। টাটকা বাতাস, হিমেল পরিবেশ এরকমটি ভারত ব্যাতীত আর কোথাও নেই।

সকালের সোনারঙা রোদ মেখে এককাপ মশালা চায়ে পান করতে করতে নিচের বারান্দায় নেমে আসে রূপণ। ওর বাড়িটি দোতলা। মজার ব্যাপার হল একতলা ও দোতলা দুই বারান্দা দিয়েই বাইরে আসা যায়।

দুটি বারান্দা দুটি রাস্তায় খুলেছে। একটি ওপরের রাস্তা অন্যটি নিচের।

যেকোনো একটি দিয়ে পাহাড়ের দুই ঢালে নামা যায়। সাধারণতঃ রূপণ নিচেরটা দিয়ে নেমে হেঁটে ওপরে উঠে আবার ভেতরে ঢুকে পড়ে।

এতে কিছুটা ব্যায়ামও হয়। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই গতকালের ডাকে আসা চিঠি খুলে দেখছিলো। এমন সময় বেজে উঠলো মোবাইল।

এসে গেছেন মিস্টার ফিদেল রঁলা। ফিদেলের বংশ লতিকা না জানলেও এটা পরিষ্কার যে উনি ওরই মতন খিচুরি প্রোডাক্ট। অর্থাৎ লাতিন আমেরিকান ও ফ্রেঞ্চ মিক্স। নাও হতে পারে তবে নাম শুনলে সেরকমই মনে হয়।

ওর যেমন বাঙালী ও অবাঙালী মিক্সচার। এধরণের মানুষদের ওরা বলে খিচড়ি প্রোডাক্ট বা খিচুড়ি প্রোডাক্ট।

সময়ের আগেই এসে গেছেন। আসার কথা ছিল বেলা ১টায়। হয়ত আগের ফ্লাইটে এসে গেছেন। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে নিজের স্করপিওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রূপণ। গাড়ি অফিসে রেখে কনভার্টিবেল মার্সিডিজ বেঞ্জ নিয়ে যাবে।

বিদেশী মানুষ বলে কথা!

দেখবেন মারিজুয়ানার ফ্যাক্টরি। চাষ হওয়া ক্ষেতখামার। আর সঙ্গ দেবে রূপণ।

সময়ের একটু পরে পৌঁছালো রূপণ। বাদামী হাফ প্যান্ট ও কালো ঝালর দেওয়া জামায় চমৎকার দেখাচ্ছিলো তাকে। কানে লম্বা পান্নার দুল। চুল খোলা। আর কোনো গয়না নেই। এক গুচ্ছ ফুল দিয়ে স্বাগতম্ জানালো ফিদেলকে।

ফিদেল প্রত্যত্তুরে দিলেন চুম্বন।

- ও ডিয়ার হাউ আর ইউ ?

একটু ভাঙা ভাঙা ইংলিশ বলেন উনি। ওঁর গালে পাল্টা চুম্বন এঁকে দিয়ে লাগেজ গুলির দিকে হাত বাড়ালো রূপণ। সেগুলি শফারের হাতে গুঁজে দিয়ে ওরা বসলো অফিসের গাড়িতে। এখন রোদ। হালকা, মিষ্টি রোদ্দুর। হয়ত তাই মার্সিডিজের ছাদটা খুলে দিলো। সোনালি রঙে ভরে উঠলো ওদের দুনিয়া। ধীরে ধীরে গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো পাহাড়ি পথ বেয়ে।

আসলে কাছের বিমান বন্দর বলতে দিল্লি। কিন্তু এই এয়ার স্ট্রিপটা কোম্পানি থেকে বানানো হয়েছে। এখানে প্রাইভেট জেট ও হেলিকপ্টার নামে। সবই বড় বড় নামী দামী মানুষের কিংবা কোম্পানির।

বিলাস বহুল গাড়ির ভেতরে সবই আছে। টিভি, প্যানট্রি, বার, ছোট স্পা ও শয্যা। একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। আয়েস করা যায়। ব্যস্ত কর্পোরেট অফিসারদের সময়ের বড় অভাব। যেটুকু পান লুটেপুটে নিতে চান।

আজকে ফিদেল রেস্ট নেবেন। কাল থেকে শুরু হবে কাজ।

একটি লিস্ট বানানো হয়েছে। কি কি করবেন কোথায় যাবেন সেইসব সংক্রান্ত। ওরা সোজা চলে গেলো একটি ক্লাব মহিন্দ্রার রিসর্টে।

বিলাস বহুল রিসর্ট। ওয়াইন পান করতে করতে সুইমিং পুলে স্নান করে নিয়ে উঠে গেলো ঘরে। ড্রয়িং রুম, ডাইনিং, কিচেন, ব্যালকনি নিয়ে বিরাট স্যুইট। রূপণ দেখেছে কয়েক পেগ চড়লেই মানুষ জন্তু হয়ে ওঠে। কে বড় অফিসার ও কে ছোট তার কোনো মূল্য থাকেনা। শিক্ষা, রুচি, আত্মমর্যাদা কথাগুলো পুঁথিতেই আজকাল বেশি শোভা পায়। বন্য পশুর মতন তার

শরীরকে ভোগ করে চলে যাওয়া মানুষগুলো পরের দিন স্যুট বুট পরে কতনা সুন্দর সুন্দর কথা বলেন টিভিতে। কাগজে।

রূপণের খুব হাসি পায়– একবার ওর এক বন্ধু ফার্স্ট জেনেরেশানে বিজনেস এম্পায়ার গড়া এক শিল্পপতির দেওয়া গীতার ওপরে ভাষণ শুনে বলে : উনি নমস্য। এত বড়লোক কিন্তু একটুও অহঙ্কার নেই। যেন মাটির মানুষ এই ভদ্রলোক।

শিল্পপতি রূপণের ক্লায়েন্ট ছিলেন। খুব ভালো করে চেনে ওকে।

হেসে বলে : কাকে ভদ্রলোক বলছো ? হি ইজ আ বাস্টার্ড। গান্ড ফার দেনা চাহিয়ে।

ভদ্র সভ্য মেয়েটির মুখে এহেন গালি শুনে বন্ধু একটু অবাক হয়।

বুঝতে পারে তার ভেতরে কোনো কারণে জমা হয়েছে ভীষণ ক্ষোভ।

লোকটি রূপণকে বাধ্য করেছিলো একরাতে ২৪ বার সঙ্গম করতে।

ক্লিটরিসে সিগারের ছ্যাঁকা না দিলে লোকটির শরীর জাগেনা। তাই দিয়েছিলো। নরম জায়গাটা জ্বলে ঘেয়ো হয়ে গিয়েছিলো। কতদিন ঠিক ভাবে বসতে পারতো না রূপণ।

এইসব মানুষের কবলে পড়তে হয় তাকে। কয়েকবার ভেবেছে কাজ ছেড়ে দেবে কিন্তু অর্থের জন্য পারেনি। সাধারণ গ্র্যাজুয়েশান করে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট পাশ করে এত টাকার চাকরি সহজে জোটে না।

দাদুন ও দিদান তো গত হয়েছেন বহু আগে। যখন ও কিশোরী। তারপর কত সংগ্রাম। বাড়ি ভাড়ার টাকায় পড়া শেষ করে। কত মানুষের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ওর ওপরে। ওর যেসব বন্ধুরা যৌথ পরিবারে থাকতো তাঁদের দেখে হিংসা হত ওর। ওদের মাথার ওপরে কত মানুষ, ওর কেউ নেই। কোনো বাঁধন নেই। শাসন নেই।

ও স্বাধীন চেতা চিরটাকালই। তবুও মনে হয় দিনশেষে কেউ যদি খাবার সাজিয়ে মিষ্টি করে বকা দেয় ভালই লাগে।

- ম্যাম স্যার ইজ কলিং ইউ। প্লিজ কাম ডাউন।

ইন্টারকম বেজে ওঠে । রূপণ নিজেকে সামলে নিয়ে ভেতরে যায় । ইনি কেমন হবেন জানেন ঈশ্বর । মাঝে মাঝে ওর প্যামেলা বোর্দেজের কথা খুব মনে পড়ে ।

কী করে একটি ভদ্র পরিবারের মেয়ে হয়ে উঠলো দেহপসারিনী তা সত্যি ভাবার বিষয় । অনেকে নাক শিঁটকান । তাঁদের মতে দুনিয়ায় আরো অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে যা নিয়ে ভাবা যায় । তাঁরা শুধু স্থাপত্য দেখেন ।

কিন্তু যে ব্যাথা লুকিয়ে আছে প্রতিটি পাথরে তার হিসেব কি কেউ করে ?

কারো অত সময় নেই আজকাল । তাই শিল্পপতিরা ২৪ দিনের সঙ্গম এক দিনেই করেন । ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় সঙ্গিনীর নরম নিটোল দেহ । তাই নিয়ে কেউ ভাবেন না কারণ ভাবার আরো সিরিয়াস বিষয় আছে ধরিত্রীতে ।

প্যামেলা সম্ভবতঃ বিদেশে আছেন বলেই এখন বেশ ভালো ফটোগ্রাফার হতে পেরেছেন । বহু জায়গায় ওঁর তোলা আলোকচিত্র, শিল্প হিসেবে প্রশংসা পেয়েছে । নিজের একটা জগৎ সৃষ্টি করে নিতে পেরেছেন উনি ! কিন্তু ভারতে ?

ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতেই দেখলো ফিদেল জরুরি কিছু ফোন কল অ্যাটেন্ড করছেন । রূপণ ভেতরে গিয়ে ড্রেস বদলে লঞ্জারি পরে এলো ।

খুব মোহময়ী স্বল্পবাসে রূপসী রূপণ । এবং ডিগনিফায়েড–ও ।

সস্তার, চটুল বি –গ্রেড সিনেমার ভ্যাম্পের মতন একেবারেই নয় ।

কেউ না বলে দিলে মনে হতে পারে রাজকন্যে ।অধরা মাধুরি ।

অল্প কিছুক্ষণ পরে ওদের মেলামেশা ও মৈথুন আরম্ভ হল । এত বড় বিজনেস ম্যান অথচ এত নরম পৌরুষ । খুব ভালো লাগছিলো রূপণের এবং জীবনে এই প্রথম ও সঙ্গম উপভোগ করছিলো । মনে হচ্ছিলো যেন ওর পরিচিত কেউ ওকে চুম্বন করছে, যাকে ও ভালোবেসেছে, যার দেহের উষ্ণতা ওর ভালোলাগে, যার চুম্বনের পরে ও লুকিয়ে হাত দিয়ে মুখ মুছে নেয় না । ভীষণ নিরাপত্তা বোধ যা সাধারণত এইসব ক্ষেত্রে হয়না ওকে ঘিরে

ছিলো। এই ব্যক্তি যেন ওর স্বামী। ওকে ভালোবেসে, আপন ভেবে ভোগ করছেন। ও আজ পণ্য নয়।

অবাক হল। ওর টেনশান ছিলো এঁকে নিয়ে। তারওপর ইনি বিদেশী। সাধারণত এঁরা শয্যায় খুব অ্যাডভেঞ্চার করেন। রূপণের পুর্ব অভিজ্ঞতা আছে এবং তা খুব মধুর নয়।

টান একটি অদ্ভুত টান জন্মালো ওর ফিদেলে প্রতি। ফিদেল এত রক্ষণশীল ও ভদ্র রূপণের মনে হল যেন ইনি ওর ক্লায়েন্ট নন, সোলমেট।

ফিদেলও খুব খুশি। ওর ব্যক্তিগত খোঁজ খবর নিলেন।

ভোরের আলো ফোটার আগে ওরা এক সঙ্গে স্নান করে নিলো। বাথ টবে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে। খুব উপভোগ করলো রূপণ এই অল্পক্ষণের বন্ধুত্ব।

সূর্যের সোনারঙা আলো মেখে দুই অসম বয়সী মানুষ হয়ে উঠলো একটি পূর্ণ দিবস। যেখানে শুধুই আলো। নেই কোনো অন্ধকার অথবা বিষাদে মোড়া রাত।

সত্যি আজ সে এসকর্ট হিসেবে নয় একজন নারী হিসেবে নিজেকে খুঁজে পেলো।

খুব ভালো লাগলো এই স্বল্প ক্ষণের মিলন। মনকে জড়িয়ে ধরলো আষ্টেপৃষ্টে।

ফিদেল পর্ব শেষ হতেই রূপণ কিছুদিনের একটি ব্রেক নিলো। ঠিক করলো বেড়াতে যাবে বিদেশে। ফিদেলের দেশে। তাঁকে খুব মিস করছে। কিন্তু তিনি কি দেখা করবেন? রূপণ জানেনা। সেই ব্যাপারে কোন কথা হয়নি। ও এখন ছুটিতে আছে। দেহে ফিদেলের স্পর্শকে আরো কিছুদিন জীবিত রাখতে চায়। অন্য কেউ ছুঁয়ে দিক এটা সে এক্ষুনি চাইছে না। মনটাও ভারি বিক্ষিপ্ত।

ও কি প্রেমে পড়ে গেলো ? উমরাও জান অথবা দেবী চৌধুরাণীর মতন। বঙ্কিমের বই ইংলিশে পড়েছে। অনুবাদ। সাহিত্য ভালই লাগতো। কিন্তু ভালোবাসার সমস্ত জিনিস করার সুযোগ কজনের আর হয় ? বেশির ভাগ মানুষই তো কলুর বলদের মতন জীবন কাটান !

রূপণের এক বন্ধু ছিলো। মেয়েটি ট্যারো কার্ড পড়ে। পাহাড়ের মেয়ে।

ঝুমকা নাম। নদীর মতন উচ্ছল, প্রাণবন্ত। সবসময় খুশি। বলে : ছোট্ট জীবন। মানুষের ক্ষতি না করে ভালো করেই বিতানো উচিৎ।

কিছুদিন কলকাতায় ছিলো। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে।

রূপণ ওর ভাগ্য জানতে গেলো। আসলে গেলো ফিদেলের সঙ্গে কবে দেখা হবে তাই জানতে।

যে বিস্ময় অপেক্ষা করেছিলো তার জন্য রূপণ প্রস্তুত ছিলনা।

ঝুমকার ছোট বাড়ি। কাঠের একতলা নিচে পিলার দেওয়া। ওখানে সুন্দর বাগান। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। পাশেই একটি বৌদ্ধ্য গুম্ফা। পাখির ডাকে ও ঘন্টা ধ্বনিতে স্থানটি মুখরিত সদাই। প্রস্তুত ছিল ঝুমকা।

একমুখ হাসি নিয়ে গেয়ে উঠলো : *ঝুমকা গিরা রে ! হিমালয় কি পাহারিও মে ঝুমকা গিরা রে !*

টেবিল সাজিয়ে বসেছিলো কার্ড নিয়ে। এটা হ্যাং ম্যান এটা সূর্য এইসব বলছিলো। আগে অবশ্য একটি ধূপ ধুনো পূর্ণ মাটির কলস এনে ওর চারপাশে ঘুরিয়ে ওকে শুদ্ধ করে নিলো। ধূপ বা ধুনোতে অপূর্ব গন্ধ ! মনটা জুড়িয়ে গেলো রূপণের।

ফিদেল সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই অসম্ভব আনন্দ দিচ্ছে তাকে !

মনটা মূহুর্তে ভালো হয়ে যাচ্ছে ! যেন কতদিনের চেনা এই অচেনা মানুষটি !

নোঙর করতে চাইছে তার চঞ্চল জীবন। এই ঘাটে।

- ফিদেল, ফিদেল কোথায় তুমি ? কোথায় ?

ফিদেল যেন হেমন্তের ম্যাপেল গাছ। গাছের নিচে শুয়ে রূপণ। ঝরাপাতায় ভরে যাচ্ছে দেহ। ঢেকে যাচ্ছে।

কিন্তু গাছটিকে ছোঁয়া যাচ্ছে না। শুধু পাতার পরশে ভেসে আসছে নরম আদর।

অপূর্ব প্রেম সুবাস –ফিদেল মনের কথা বলে দেহের নয়। নারী দেহের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করার থেকে তাঁদের মননে সদা জগ্রত থাকতে অগ্রহী, ওঁর কাছে সামান্য একজন এসকর্টও নারীর মর্যাদা পায়। নেশার বস্তুর কারবারি, পাপী, বাইরের জগতের কাছে রোবট হলেও রূপণের কাছে উনি শুধুই ফিদেল। এক মানব সন্তান।

ঝুমকা কার্ড নিয়ে বসলো। ঘরটা আধো আলো আধো ছায়াতে ঢাকা।

একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে সে বসে। কার্ড শাফেল করে মেলে ধরে। তুলতে বলে এবং নানান টুকিটাকি প্রশ্নের পরে জানায় যে শীঘ্রই ওরা মিলিত হবে, বিদেশে।

এবং আরো চাঞ্চল্যকর একটি তথ্য জানায়। বলে এই মানুষটিকে ও শুধু এই জন্মে নয় আগের জন্ম থেকে চেনে। ভীষণ অবাক হয় রূপণ।

সে পরজন্মে বিশ্বাস করে। জাতিস্মর, পাস্ট লাইফ রিগ্রেশান সমস্ত মানে।

কাজেই ঝুমকা যা বলে ওঁর মনে গেঁথে যায়। ভীষণভাবে।

ট্যারো কার্ড রিডার আগেও ওঁর অনেক ভবিষ্যৎ বাণী ফলিয়ে দিয়েছে কাজেই অবিশ্বাস করেনা। এইবার অতীত বাণী।

জানা গেলো আগের জন্মে রূপণ ছিল এক রাজকন্যে। সে ছিলো রৌনকগড় নামক এক রাজ্যের – রাজার মেয়ে। কেজড্ প্রিন্সেস। শৃঙ্খল বন্দিনী। নিয়মের বেড়াজাল। লৌহকপাট নয়। তাঁর রাজ্যের এক সেনাপতির সঙ্গে প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো।

ভীষণ ভালোবাসতো তাঁরা দুজন দুজনকে।

চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো রুক্ষ্ম মালভূমি। বড় বড় গ্রানাইটের থাম দেওয়া প্রাসাদ, লাল পাথুরে মাটি, চন্দনের সুবাসে সুবাসিত মন্দির ও পাথরের ভয়াল কালো মূর্তি, অশ্বারোহী, মিহিন পোষাকে রাজদুহিতার দল, চুলে রাশি রাশি ফুল আরো কত কি !

নদীর শীতল জলে পা ডুবিয়ে বসে রাজদুহিতা। দূরে সেনাপতি। কাছে আসার সুযোগ নেই। কলাপাতার পেছন দিকে বিশেষ কালি দিয়ে লেখা প্রেম পত্র। যাতে মুড়ে ফুল পাঠানোর আছিলায় প্রেম পত্র পাঠাতেন বীর যোদ্ধা।

পিতার আপত্তি থাকায় ওঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেননি । এক সেনাপতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের বংশের মর্যাদাহানি করতে রাজি ছিলেন না রাজা ভিষ্ণু বর্ধন । আদরিনী কন্যা মৃগনয়নী ও সেনাপতি রাজবল্লভ আলাদা হয়ে গেলেন । মনে মনে কিন্তু দুজনে দুজনের কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ রইলেন । রীতিবদ্ধও ।

যেখানেই থাকি তোমারই থাকবো --

রাজবল্লভ আর বিবাহ করেন নি । মৃগনয়নী কিছুদিন পর হঠাৎ আত্মহত্যা করেন কারণ তাঁর পিতা তাঁর বিবাহের আয়োজন করেছিলেন আরেক রাজা মকরগুপ্তর সঙ্গে । এই লম্পট রাজার একমাত্র সংরাগ ছিলো রূপসী কন্যাদের অন্ত:সত্ত্বা করা । প্রজাদের ঘরে ঘরে তাঁর সন্তান । পারতেন না মৃগনয়নী মকরকে মেনে নিতে, তাঁর লাম্পট্য স্বীকার করে নিতে । তাই বিশাল আম বাগানে গলায় রেশমের কাপড়ের ফাঁস দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেন ।

যখন শববাহী ঘোড়ার গাড়ি নগরে ঘুরছিলো শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, প্রজাদের, তখন গাড়ির ভেতর, চন্দন কাঠের খাটে শায়িতা রাজকুমারীর পায়ের কাছে বসে এক শক্ত সমর্থ বীর অঝোরে কেঁদে চলেছিলেন ।

নীরব প্রশ্ন জেগে উঠছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার খুড়ের শব্দে ।

: কেন কেন কেন ? কেন এমন করলে ? সঙ্গে ছিলে না, চোখের সামনে তো থাকতে !

বক্ষের লৌহ বন্ধনী থেকে চুইয়ে পড়ছিলো অদ্ভুত করুণ সুর ------ কেউ শোনেনি–শায়িতা মৃতদেহ ছাড়া ।

সেই সেনাপতিই এই জন্মে ফিদেল । আর রাজকন্যে মৃগনয়নী আমাদের এসকর্ট রূপণ ।

- খুব অবাক হয়েছো তাই না রূপণ ? বেজে ওঠে ঝুমকার মিঠেল আওয়াজ ।

অবাক রূপণ যত না হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি শান্তি পেয়েছে, খুশি হয়েছে । ফিদেলকে সে তাহলে আগে থেকেই চিনতো । তাই তো এত টান, মায়া, ভালোবাসা ।

সে ওঁর কাছের মানুষ। আপনজন। ওর রক্ষক, ভক্ষক নন।

জন্ম জন্মান্তরের প্রাণেশ।

কিন্তু ফিদেল কি এগুলো বিশ্বাস করবেন ?

ঝুমকা কে প্রশ্ন করতেই সে একটি পাথর বার করে দিলো। বেগুনি রং।

চৌকো। একটু বড় সাইজ। বললো : এটা নিয়ে যাও। ফিদেলের সঙ্গে যখন দেখা হবে, বুকে ছুঁইয়ে দেবে। সবকথা ওঁর মনে পড়ে যাবে।

এইসব ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস না থাকলে চলেনা। তাই রূপণও সরল বিশ্বাসে পাথর বুকে করে রওনা হল বিদেশে। অকৃতদার ফিদেলের সঙ্গে দেখা হল সুদূর ইতালিতে। ভেনিসের কাছে এক ছোট শহরে ওঁরা আবার মিলিত হল।

রূপণ বললো : আমি একটি উপহার এনেছি। বলে কায়দা করে ওঁর বুকে ওটা ছুঁইয়ে দিলো। ম্যাজিক ঠিক নয় – এক অদ্ভুত মায়ায় আচ্ছন্ন হলেন ফিদেল। মনে পড়ে গেলো তাঁর পুর্বজন্মের কথা। তারপর ?

আর ভাষায় প্রকাশ করা যায়না ! শুধু ছায়াছবির ফ্ল্যাশব্যাকের মতন। পর পর কয়েকটি চলন্ত, জীবন্ত সিন। ভেসে বেড়াচ্ছে, চোখের সামনে কেবল স্মৃতির কোটরে নয়।

আগের জন্মে রাজকন্যের পানিপ্রার্থি সেই টগবগে যুবক কোনোদিন রাজদুহিতাকে স্পর্শ করার স্পর্ধা দেখান নি। ইচ্ছে করতো ভীষণ !

তাঁর নরম নরম গাল ও ললাট স্পর্শ করতে, ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিতে খুবই ইচ্ছে হত। সম্ভব হয়নি হাজার প্রোটকলের কারণে।

সেনাপতি, রাজকুমারীর দশহাতের মধ্যে আসতে সক্ষম নন বিশেষ রাজ আদেশ ছাড়া। হৃদয় ভেঙে চুরমার হলেও নিরুপায় ছিলেন। কারণে অকারণে ছুটে যেতেন প্রাসাদে, স্বপ্ন মাখা আঁখি কাকে যেন খুঁজে বেড়াতো।

একটি জংলী কাকাতুয়া উপহার দিয়েছিলেন রাজকুমারীকে। যে একটিমাত্র বুলি আওড়াতো : তুমি কাকে সবথেকে বেশি ভালোবাসো ইওর হাইনেস ?

আজ সেই রূপসী দয়িতা তাঁর বাহুবন্ধনে। ভারত থেকে উড়ে এসেছেন সুদূর ইতালি –শুধু তাঁরই কারণে।

দর্পণে ফুটে উঠলো সব ছবি। পরিষ্কার –একেবারে, স্ফটিকের মতন।

অনেক গল্প হল, প্রেম হল, পরিণয় হলনা। কথা দিলেন ভারতে যাবেন শীঘ্রই।

রূপণ ফিরে এলো নিজ দুনিয়ায়। কাজে যোগ দিলো।

ট্যারো কার্ড রিডার ঝুমকা হিমালয়ের বাস উঠিয়ে মুম্বাই চলে গেছে। হয়ত নিজ ভাগ্য সন্ধানে।

রূপণের নতুন ক্লায়েন্ট সৈয়দ মিরজাফর। বহু ভাষা জানেন। ভাঙা ভাঙা বাংলাও।ডুবাইয়ের ডন। ড্রাগস ব্যবসার এক বড় খেলোয়াড়। এখানে এসেছেন। বাজারে গুজব আছে এঁকে নিয়ে তৈরি সিনেমায় ভারত সরকার এঁকে ধরে ফাঁসি দিয়েছেন দেখে জনগণ হাততালি দিলেও আদতে সেই সিনেমা এঁর টাকাতেই তৈরি।

–পাইসা চাহিয়ে! বাস।

এটাই এঁর মূলমন্ত্র। লাইফ ইস বিজনেস। বিজনেস ইস লাইফ। পাইসা কী উপায়ে আসছে ভেবোনা। শ্যামকৃষ্ণের জমানা গেছে।

তাতেও একটু দু:খি এই ব্যবসায়ি। বলেন : শ্রী পরমহংস জীর কতা হামি বইতে পড়েছি। ওহ্ হো! উনি মইরে গেলেন। আজকে অ্যালাইভ থাকলে আনেক টাকা লাভ হত ইন্ডিয়ান কাস্টম্ ডিপার্টমেন্টের। এই দেকুন না কোন সুটকেসে সোনা আছে, মানি আছে উনি বসলেই : আহ্ করে চিল্লিয়ে উঠে বাতলে দিতে পারতেন। এসব ওঁনার বডিতে হার্ট করতো বলে সুনেছি। উনি না থাকাতে কুকুর ফুকুর রেখে আনেক খরচা হয়ে যাচ্ছে ডিপার্মেন্টের। বহুৎ ফালতু ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে। কী বোলেন? তাতে অবস্য আমাদের মাতন বিজনেস ম্যানের লাভ হচ্ছে। পরম হংস জী থাকলে আমাদের প্রোবলেম হত। সাপ ফাপ দিয়ে দিতেন একেবারে।

ওঁনারা সেন্ট আদমী আছেন। এসব ড্রাগ্স্ ফ্রাগস্ বিলকুল না পসন্দ!

কথা ছিলো রূপণ এঁকে এন্টার্টেইন করবে এক শনিবার থেকে।

শনিবার ভোরে প্রাইভেট জেট ল্যান্ড করলো কোম্পানির নিজস্ব এয়ার স্ট্রিপে।

আনতে যাওয়ার কথা সফল এসকর্ট রূপণের। কিন্তু কেউ গেলোনা।

একা চলে এলেন এই ব্যবসায়ি,হোটেলে । সেদিন বিকেলে পাহাড়ের উল্টোদিকে একটি পাইন বনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো রূপণ ও ফিদেলকে।

মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে । পুলিশ বলছে : বিষাক্ত কোনো গাছের সংস্পর্শে আসাতে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

হঠাৎ দুজনে এক আজব জঙ্গলে কেন গেলেন এবং কোন বিষবৃক্ষ এর জন্য দায়ী সেই ব্যাপার পুলিশ কুয়াশায়। কুয়াশার জাল সরানোর চেষ্টা হচ্ছে।

খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়ে সুদূর মুম্বাইয়ে বসে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো এক পাহাড়ি মেয়ে। কানে ঝুমকো, মাথায় বুনোফুল।

মুম্বাইয়ের ঘোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বললো :

এবার ওঁদের শান্তি দাও হে পরমেশ্বর। অনেক জন্ম তো হল, পরের জন্মটা ওঁদেরকেই দিও। তোমার করাল কর্ম ফলের গ্রাস থেকে মুক্তি দাও দুটি প্রেম পক্ষিকে। হে নাথ !

একটু দূরের চার্চে বেজে উঠলো ঘন্টা : ঢং ঢং ঢং।

হয়ত ঝুমকার প্রেয়ারের অ্যান্সার হিসেবে।

বিভূতিবাবা

অ -উ-ম- হ-উ-ম -ম-ম-ম-ম-! অ-উ-ম ----- ঘর কাঁপানো নাদে ত্রিভুবন দুলে ওঠে। আর চারদিকে ভক্তদের চীৎকার, করুণ আর্তি -

বাবা, বাবা -- ব্যা-ব্যা---------- জাগো, তুমি জাগো -----জাগো।

স্বর্ণ পালঙ্কে শায়িত এক মহাপুরুষের নিথর দেহ। কপালে বিরাট সিন্দুরের টিপ। ধূপ ধুনোর সুবাসে এই ব্যাথা কক্ষ হয়ে উঠেছে মায়াময়। চন্দনে স্নান করে শুয়ে আছেন সন্ন্যাসী যোগীপর্ণ। হীরক খচিত কফিনের মুখে রাশি রাশি গেঁদা ও চন্দ্রমল্লিকা। ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে গৈরিক বসন। কর্ণ কুন্তল বাবাজীর বৈশিষ্ট্য। তাও দৃষ্টিপথের বাইরে। পাশে রাখা মন্ত্রপূত করোটি। যদি বাবাজী প্রাণ ফিরে পান!

কফিনের চারপাশে ভক্তবৃন্দ। এন আর আই, মন্ত্রী, ভি ভি আই পি, ডিপ্লোম্যাট, ফিল্মস্টার --- কে নেই?

মহাপুরুষ গত হয়েছেন। কুঞ্চিত কেশ নেতিয়ে পড়েছে। চোখ মুখে তুলো গোঁজা।

বাবা দীর্ঘকাল রোগভোগের পর মাল্টিপেল অর্গ্যান ফেলিওরে মারা গেছেন।

দেশ বিদেশ থেকে ভক্ত বৃন্দ আছড়ে পড়েছে। ভারতের মিডিয়ার এখন একটাই কভারেজ, বিভূতিবাবার মহাপ্রয়াণ। কর্মযোগী এই সন্ন্যাসীর দান ধ্যান ও মানুষের জন্যে কাজ করা দেখে অনেক নাস্তিকও আজ ওঁর ভক্ত। এরকম উচ্চস্তরের মানুষ বা স্বয়ং মানবদেহ ধারী ঈশ্বরকে কে না ভালোবাসে?

উত্তর পুর্ব ভারতে পাহাড়ের গায়ে এই অশ্রমের পরিধি বেশ বড়। মোটামুটি ভাবে একটি গোটা পাহাড়কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে যোগীপর্ণ সেবাশ্রম। বাবা নতুন ধরণের ঠাকুরের চল শুরু করেছেন। শিব যোনি ও দুর্গা লিঙ্গ। বলেন : আমিই আসল ঈশ্বরের স্রষ্টা। আমি ভাঙি আবার গড়ি। এই রামকৃষ্ণ ফিষ্ণ তো সবই আমার তৈরি ক্ষুদ্র জীব! তোমাদের

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী তো আমার বাড়িতে এঁঠো শালপাতা কুড়াতো !

নাগা-কুকি-মিজো ভক্ত ছাড়িয়ে বাবা বিশ্ব নাগরিক হয়েছেন । এখন আসেন গ্রীক, জাপানি, বৃটিশ ও আমেরিকান ভক্ত । বাবার আশ্রম বড় থেকে অনেক বড় হয়েছে । কর্মকান্ড না বলে মহাযজ্ঞ বলাই বোধহয় ভালো । কি নেই ? অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, বিধবা, দরিদ্র, অনাথ, পথশিশু সবার জন্য ছাদ দিয়েছেন বাবা । লক্ষ লক্ষ সেবামূলক কাজ হচ্ছে সর্বত্র । ফ্রিতে বড় বড় হাসপাতালে জটিল অপারেশন করতে পারছেন দুঃস্থ মানুষ । কত লোকের উচ্চশিক্ষার ভার নিয়েছেন বাবা । কত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন । এমন কি এইড্স আক্রান্ত মানুষের জন্যেও বাবার ব্যবস্থা আছে । যাতে করে শেষের কটাদিন তারা আত্মমর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারেন । আছে ধ্যান আশ্রম । আজকের স্ট্রেস ভরা দুনিয়ায় স্ট্রেস ফ্রি হতে ধ্যান করুন । শেখাবেন ও খরচ বহন করবেন বাবা । বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অর্থাৎ যে উপায়ে হাতেনাতে ফল মেলে সেইভাবে ধ্যান করতে শেখানো হবে । ইন্সট্যান্ট রেজাল্ট পাবেন। জীবনে আসবে শান্তি ।

সেখানেও স্ক্যাম । শোনা যায় একবার এক রুগী যোগাসন করতে গিয়ে আটকে যান । পা দুই খানি এমনভাবে জুড়ে যায় যে অপারেশান করে আলাদা করতে হয় । বাবাজীকে ধরতেই উনি বলে ওঠেন : সব কুছ মায়া হ্যায় ! এ হল ওর পাপের ফল । আর তো কারো হচ্ছে না !

উপস্থিত বুদ্ধি, তুখোড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেন্স ওঁকে অনেক ওপরে তুলে দিয়েছে ।

কেউ বুঝি একবার বলেছিলো সেবাশ্রমের চাঁদা বাড়াতে । নাহলে কিছু কিছু সংস্থা লোকসানে চলছে । বাবা বলে ওঠেন : আমি সংস্থা তুলে দেবো কিন্তু কারো থেকে এক পয়সাও নেবোনা ।

এরপরে নাকি সেই সংস্থা আর লসে রান করেনি । বদমাইশ লোকেরা বলে : ব্যাটা দুনম্বরী কালো টাকাগুলো এবার ওদিকে ঢেলেছে ।

বাবা ভীষণভাবে বাস্তববাদী তবুও ---- তবুও বাবাকে মানুষ চমৎকারের সঙ্গে জুড়ে দেয় । আসলে বাবার কৃপায় এক এইডসে আক্রান্ত

রুগি পরপারে যাবার পরেও ফিরে আসে। নবজীবন পায়। লোকে বলে : মিরাকেল। নিন্দুকে বলে : কোমা কেটে গেছিলো।

এছাড়া বাবা শেয়ার বাজার ওঠানো নামানো করে বহু শিল্পপতিকে কুবেরের ধনের সন্ধান দিয়েছেন। ওঁর এক আঙুলের চাপেই ধ্বসে যায় বাজার কিংবা চড়ে যায়। ভোট বাক্স তো নস্যি। মন্ত্রী সান্ত্রীদের জেতানো বাবার বাঁয়ে হাত কা খেল।

কীভাবে ? সেই চমৎকার।

তাই নাম বিভূতি বাবা।

বাবার নাম খানা বেশ। আসলে উনি বিভূতি দিয়ে চমৎকার দেখাতেন। বিভূতি লাগালে সেরে যায় ঘা, পচন। বিভূতি ঝরে ওঁর দেওয়া ফটো থেকে যা কিনা স্কেপটিকরা বলেনঃ বিশেষ কেমিক্যালের খেলা। বাবা ফটোতে, শুকনো কেমিক্যাল আটকে দেন। একটা সময় পরে বাতাসের সংস্পর্শে এসে যা ধূলিকণা হয়ে ঝরে পড়ে।

বাবার হাওয়া থেকে মূল্যবান বস্তু আনা সম্পর্কে নিন্দুকে অবশ্য বলে এগুলো ওঁর ম্যাজিক। হাতসাফাই এর কারসাজি। বাবার দরিদ্র ভক্তরা পান আশীর্বাদ হিসেবে রূপার আংটি ও ধনী ভক্তেরা হীরে জহরৎ।

ওঁর মতে এ একচোখামি নয়। দরিদ্রদের বেশি মূল্যবান দ্রব্য দিলে ওরা ভিকটিমাইজড্ হতে পারে তাই তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে এই ব্যবস্থা।

বিভূতি বাবার আরেকটা পরিচয় আছে। নিন্দুকে বলে উনি পার্ভার্ট। বিদেশী ও এন আর আই মহিলা ভক্তদের ধরে এনে নিজের লিঙ্গ স্পর্শ করান ও তাই নিয়ে খেলাধূলা করান।

বিদেশিনী হলে বলেন : দিস ইজ হিন্দু কাস্টম টু সাক মেল জেনিটাল অ্যাস ইট ইজ শিবলিঙ্গ। দেশি মহিলা হলে অন্য কোনো চাল চালেন। বহু মানুষ এই নিয়ে বিক্ষোভ করলেও সমস্ত ধামাচাপা পড়ে গেছে পলিটিক্যাল চাপে। তবুও সন্ন্যাসী যোগীপর্ণ-র নাম মানুষ দিয়ে দিয়েছেন : সন্ন্যাসী যোগী পর্ণগ্রাফি।

আজ আশ্রমে ওঁকে সমাধিস্থ করা হবে। কদিন হল মারা গেছেন, ছিলেন হিম ঘরে। চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে যে ওঁকে মৃত ঘোষণা করার বহু আগেই উনি মারা গেছেন কারণ কফিনের অর্ডার দেওয়া হয়েছিলো পাক্কা ১৫ দিন আগে। অনেকে বলছেন বাবা ষড়যন্ত্রের শিকার। ওঁর ৭৫ হাজার কোটির সম্পত্তির লোভে কাছের মানুষ অর্থাৎ প্রিয় ভাগনে খুন করিয়েছেন। অবশ্য খুন বলা যায়কি ? বহুদিন ধরেই নিজেকে ঈশ্বর ঘোষনা করা বাবাজি শয্যাশায়ী ছিলেন। ঈশ্বরের এত শরীর খারাপ কারণ উনি সবার অসুস্থতা নিয়ে নেন।

ভক্তরা বলেন। ভক্তরা বাবাজীর সেবাকর্মের দিকে আঙুল দেখান ----- কে কে কে ?

আর কে পেরেছেন ১ বছরে ২৫ লাখ হার্ট সার্জারি করাতে বিনাপয়সায় ?

কে পেরেছেন ১৫০০ গ্রামে বিজলী বাতি ও জলের ব্যবস্থা করতে ? একি সোজা কথা ?

নিন্দুকে বলেন : উনি সমাজ সেবক। ঈশ্বর নন।

- মামদোবাজি নাকি ? অত্যন্ত রুঢ়ভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ডঃ নিরানন্দ দাশগুপ্ত। পুণায় ম্যানেজমেন্ট পড়ান। আদতে শিলঙের মানুষ। ব্যবহারই নামের মাহাত্ম্য বোঝায়। লোকে বলে : দীর্ঘদিনের ডায়বেটিস রুগী তাই খ্যাঁচাটে, গোয়ার গোবিন্দ, সবসময় হাইপার থাকেন।

এক লাইন শুদ্ধ ইংলিশ লিখতে অক্ষম এই প্রফেসর কি ভাষায় পুণায় সর্ব ভারতীয় ছাত্রদের পড়ান কে জানে ! বাবাজীর সব চেলাই কিম্ভুত। আরেক চেলা থাকেন সুদূর ইংল্যান্ডে।

বাংলা ওয়েবসাইটে নিজেকে সেবাপরায়ণ বলে প্রচার করেন, মূলত করেন বৃদ্ধদের সেবা। সবসময় বাবার বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান জীবনের প্রকৃত অর্থ কি অথচ বাড়িতে পুত্রসম গেস্টকে নেমতন্ন করে কাঁচা খিস্তি মেরে ভাগিয়ে দেন। ক্ষমাই পরম ধর্ম প্রচার করলেও পাড়ার কালোমানুষ বা অ্যাফ্রিক্যান লোক ব্যাড়ার বাইরে ঝরে পড়া গাছের ফুল তুলে নিয়ে গেলে তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়ে দেন, লেখা উনিশ থেকে বিশ হলে

সম্পাদকদের সঙ্গেও ঝগড়া করেন এবং দুনিয়ার যত বাজে লোক আছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ওঁর গাঢ় । আবার অন্য কেউ বিদেশে বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশান খুলে পাবলিকের টাকায় ফুর্তি করেন । বাড়িতে গুচ্ছের লেখক কবিদের তুলে অ্যাসোসিয়েশানের ঘাড় ভেঙে টাকা আদায় করেন । ৫ কিলোমিটার ট্যাক্সির ভাড়া চার্জ করেছিলেন ১০০০ ডলার । উপরিউক্ত শিষ্যা । ধরে ফেলেছিলো টুসু । বাবার শিষ্যরা গুরুভাই হওয়া সত্ত্বেও একে অন্যকে ঠকান । কেউ কারো অর্থ নিয়ে চম্পট দেন তো কেউ কারো থেকে ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে উধাও হয়ে যান ।

বিশ্বাস বেয়ে আসে অবিশ্বাস ।

কারো পেছন পেছন যায় কৃষ্ণ, কেউ মা কালীর হাত থেকে ফুল পান, কেউ বাবা কালীর হাত থেকে কলম কেউ বা বাড়িতে বাতাস থেকে বাতাসা ও দেওয়াল থেকে গুজিয়া গজিয়ে তাক লাগিয়ে দেন । নিন্দুকে বলে : মিথ্যাচারের একটা লিমিট আছে, যা ইচ্ছে তাই -----

ভাদু, টুসু ও বিহু তিন ভাইবোন । একসঙ্গে এসেছে আশ্রমে, ওঁরাও বাবাজীর চেলা হবে ভেবেছিলো । শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে শিঁকে ছেড়েনি । বাবা গত হয়েছেন । ঈশ্বর মারা গেছেন । এসেছে আজ শেষ কাজ বলা ভালো পুণ্য কর্ম দেখতে । বসেছে প্রথম সারিতে একেবারে ।

ভক্তরা তো বাবার রেজারেকশান হবে বলে অনশন করেছিলো । বাবাকে সমাধিস্থ করা যাবেনা ----- মৃতদেহ থেকে পচা গন্ধ বার হতে ওরা রাজি হলেন তবে পোড়াবেন না, কারণ বাবা গড রিয়েলাইজড হয়ে গেছেন । নিন্দুকে বলে : বিভূতি বাবার কান্ড কারখানা দেখে প্রাচীন ভারতের মুণী ঋষিরা লজ্জা পেয়ে যাবেন !

বাবা আদতে গড রিয়েলাইজড নন বলে প্রায়ই ভুলভাল আধ্যাত্মকথা বলে দিতেন বা ব্যাখ্যা দিতেন । পরে তাঁর আশ্রমের এডিটিরিয়াল বোর্ড বই - এর কপি বাজার থেকে তুলে রিভাইজড্ কপি বাজারে ছাড়তেন । বলাবাহুল্য তাঁদের শুদ্ধ ব্যাখ্যা দিতেন বেদজ্ঞ পন্ডিতেরা ।

অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে । বাবার আশ্রমে সর্ব ধর্ম সম্বনয় । তবুও উনি ভক্তদের শেখান : আমি ব্যাতীত সমস্ত মহাপুরুষদের অসম্মান করবে ।

রামকৃষ্ণ, রমণ মহর্ষি, কবীর, লাহিড়ী মহাশয় সবাই ফালতু । আমি-ই সব । আমার দেখানো পথই সর্ব শ্রেষ্ঠ । ঋষি অরবিন্দর বই সাবিত্রীর মতন উনি নতুন পুস্তক লেখান- চেলাকে দিয়ে । এই চেলা প্রফেসর । বেদ টেদ জানেন । বইয়ের নাম : পারভাতী (পার্বতী) ।

নিন্দুকে বলে : পার্ভার্টি ।

এই বইয়ে দেখানো আছে বাবাজি যখন কিছুই সৃষ্টি করেন নি অর্থাৎ তখন উনি যোগনিদ্রা দিচ্ছিলেন সেই সময় মহাবিশ্ব কেমন ছিলো । সময়ের জন্মের আগে সব কেমন ছিলো ।

ভাগ্যিস বিজ্ঞানি স্টিফেন হকিংয়ের পাল্লায় পড়েন নি । প্রফেসর হকিং সবার আগে একটা প্রশ্নই করতেন : সময়ের আবার আগে কি ? সময়ের আগে বলে তো আপনি সময়ের সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছেন !

বাবজী অবশ্য বিজ্ঞানীদের দুচোখে দেখতে পারেন না । ওঁর মতে বিজ্ঞানীরা সমাজের ধ্বংস আনছেন ।

ছোট ছোট শব্দে উনি পাবলিককে বোঝান । বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে বলেন :

ডেটা প্রসেসিং ও মাইক্রোচিপ

সায়েন্সের মিসচিফ

অথবা : বিলিভ ইন ইউর ফেট নট ইন ইন্টারনেট ।

কিংবা ডিজাইনার ড্রেস ইজ নট গ্ল্যামার, ইট মেক্স রিলিজিয়ান স্ট্যামার ।

শ্রীমণি মহর্ষি কেন কৌপিন পরতেন তা বাবাজির কাছে বড় ইস্যু ।

- এত মহিলা ভক্ত ওঁর !

কেউ হয়ত বললো, উনি তো নিষ্কাম পুরুষ ।

বাবাজি বাঁকা হেসে বলেন : উনি নিষ্কাম, মহিলা ভক্তরা তো নন !

অথবা : রামকৃষ্ণা হ্যাড নো আইডিয়া অ্যাবাউট ফিউচার ।

কেউ বললো : ভগবান মানে তো এমন সত্য যেখানে সব মিলে গেছে কাজেই সময় নেই । ফিউচার পাস্ট বলে কি করে কিছু থাকবে ?

বাবা আবার হাসেন, মিটি মিটি। বলেন : তোমরা তো মানুষ তাই ওঁরা তোমাদের এইভাবে মুর্খ বানান। আমার কথা শোনো, শুনবে। ভগবৎ বিদ্যা কোনো গুহ্য বিদ্যা নয়। আমার মতন গুরুর কাছে এলে সব জানতে পারবে।

এক চেলা একবার বুঝি বলেছিলো : ঋষি অরবিন্দর শিষ্য দিলীপ রায় (গায়ক দিজেন্দ্রলালের পুত্র) বলেছেন যে উনি শ্রীমণ মহর্ষির কাছে গিয়ে যে শান্তি পেয়েছিলেন তা ওঁর গুরু অরবিন্দর কাছে পাননি।

বাবা হেসে ওঠেন : হা হা হা ! দিলীপ রায় একটা স্কাউন্ড্রেল। ওর কথা বিশ্বাস করোনা। আমার কথা শুনবে। আর সবাই ভুল বকে।

নিন্দুকে বলে : বাবাজী অন্য মহাপুরুষদের ঈর্ষা করেন। উনি আবার মহাপুরুষ হলেন কবে ? অহং, কাম, লোভ, ঈর্ষা, মিথ্যাচার কিছুই তো কাটেনি !

শোনা যায় শিশু আশ্রম থেকে রোজ একটা শিশু ধরে এনে উনি পদসেবা করাতেন। ফাই ফর্মাইশ খাটাতেন আর ভুল হলে বেদম প্যাদাতেন। বিশেষ বিশেষ অসহায় বিধবাকে ওঁরই সেবাশ্রম থেকে তুলিয়ে এনে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করাতেন : ধর ধর, চোষ – ললিপপ না সুইটপপ, এই ধর না, ধরনা, ধুস শালী– ধর –এই বীর্যপাত হল বলে ! আরে চাম সরালে যা বার হয় তা মাংস। মাংস খাস না ? তরল বীর্য, খেয়ে দেখ – মেয়োনেজের স্বাদ ভুলে যাবি। এই দেখ না এই পা ধরার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ পাগলের মতন ছুটে আসছে আর আমি তোকে এটা, এই মাঝের পা –টা ছুঁতে বলছি। ধর, পুণ্য হবে। সাত পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। এ শিবলিঙ্গ, সৃষ্টির মূলরস।

শোনা যায় বাবাজী কিছু কিছু মহিলা ভক্তদের বীর্যস্নান করাতেন।

এই সমস্ত অশ্লীল কার্যকলাপ –ভিডিও ক্যামে তুলে নেটে ও নানান চ্যানেলে দেখালেও বেশির ভাগ মানুষ বিশ্বাস করেন নি। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন : এসব কুৎসা। শত্রুর বিছানো জাল ! সুপার ইমপোজ করা ঘটনা। কম্পিউটারের কারসাজি।

ভাদু টুসু বিহু –আজ কদিন আশ্রমেই আছে । শোনা যাচ্ছে বিভূতি বাবা বলেছেন যে ওঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই উনি আবার আবির্ভূত হবেন । এবার দলিতের ঘরে । নাম হবে হোমা বাবা । এই নব বাবাজী বিভূতি দিয়ে নয় হোমযজ্ঞ করে সবার মঙ্গল করবেন । বিভূতি বাবা খুব ইন্টেলিজেন্ট । বুঝেছেন ভারতের মতন দরিদ্র দেশে লাইমলাইটে টিঁকে থাকার দুটি রাস্তা । সমাজ সেবা ও দলিতের সমর্থন পাওয়া । দলিত নেত্রী পিয়াবতীর ভোট বাক্স তো কম নয় !

আজ সমাধিস্থ করার পরে ভক্তরা অপেক্ষারত কবে হোমা বাবা ধরাতলে আসেন !

টুসু ও বিহু ফিরে গেছে নিজগৃহে, ওদের সংসার আছে । ভাদু রয়ে গেছে । সে অকৃতদার । মেয়েদের ভয় পায় তাই দারপরিগ্রহ করে নি ।

লোক মুখে বাবাজীর শত নিন্দার মাঝেও তাঁর সমাজ সেবা দেখে ভাদু চমকিত ।

কিছুদিন এখানেই থাকবে । তার কাছে বাবাজি ঈশ্বর নন একজন সমাজ সেবক ।

সে ওপেন মাইন্ড নিয়ে এখানে আছে । যদি কারো উপকার লাগে– তার সামান্য জীবন, সে ধন্য হয়ে যায় । নিজে পাপ কর্ম না করলেই হল । এরকভাবেই ভাবে সে ।

বাবাজী ক্লেম করেছিলেন উনি শতায়ু হবেন । হননি । মাত্র ৭৫ এই গত হলেন । ভক্তরা বলছেন : ওঁর দিন গণনা ও আমাদের মর্ত্যের মানুষের দিন গণনা এক নয় । ওঁর ১০০ আসলে আমাদের ৭৫ ।

নিন্দুকে বলছেন : এও ভন্ড বাবার আরেক খেলা ।

শনিবারের বারবেলা অশুভ । এরকমই জেনে এসেছে এতদিন । কিন্তু আজ শনিবার যা দেখলো একে শুভ বলবে না অশুভ তাই ভাবছে তমাল তলায় বসে ।

সুবিশাল আশ্রমের একদিকে তমাল গাছের লালিমা । গেঁয়ো পাহাড়ি ছেলে বাঁশি নিয়ে অদ্ভুত সুর বাজাতে বাজাতে চলেছে । আজব পোশাক পরণে ।

গা উদোম। নিচের দিকে রং চঙে ঘাগরা পরা। ঠিক যেন শ্রীকৃষ্ণ। হাতে মোহন বাঁশি।

শ্যামের বাঁশরি বাজিলো যমুনায়, তোরা কে কে যাবি আয় ------

মনে মনে গেয়ে ওঠে ভাদু।

ছেলেটিকে দেখলো আশ্রমের ভেতরে ঢুকে যেতে। তারপর বেশ কয়েক দিন দেখলো।

দেখলো আস্তে আস্তে সে বদলাচ্ছে। প্রথম দিনের দেখা শ্রীকৃষ্ণ ও পরেরদিকের মধ্যে বেশ ফারাক। ও কেমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। হারাচ্ছে কৈশোরের স্বাভাবিক উচ্ছ্বলতা ও সারল্য।

আশ্রমের অনেক গোশালা ও চাষের ক্ষেত আছে। সেখানে রক্ষক হয়ে আছেন শ্রী অদ্বৈত জী। সত্যি ওঁনার জুড়ি অর্থাৎ দ্বৈত মেলা ভার। অসম্ভব কর্মঠ। বাবাজীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যের অন্ধকারে ভাদু মাঝে মাঝে তামাক সেবন করতো। অনেক সময় আফিং এর নেশায় বুড়ো চুর হয়ে থাকতো। এরকমই এক গোপন সাঁঝে জানা গেলো ঐ পাহাড়ি ছেলেটি আসলে হোমা বাবা।

ভাদু তো থ!

- এই তো বাবাজী সবে মারা গেলেন। হোমা বাবা তো এখনো জন্মাননি!

- ধুস্ শালা তোর হোমা বাবা! সত্যের ফাঁদে পড়েছো কি এখানে মরেছো। এ মিথ্যের জায়গা। এখানে সত্যের কারবার হয় না! তোমাদের কাছে এ আশ্রম আসলে এ এক প্রেতপুরি। বাবাজী মহাপুরুষ নন প্রেতপুরুষ। শোন আমার কথা শোন, এখানে প্রতিটি গাছপালা জানে আমার গুপ্ত কথা। শুধু ওরা যে মূক, তাই কেউ জানতে পারেনা সেসব। ওরা বধির নয় মানুষের মতন। দলে দলে যে ভক্ত আসে তারা তো সবাই বধির। নাহলে আশ্রমের পাথরের বিগ্রহর ডাক শুনতে পায়না? উনি যে চীৎকার করে বলে চলেছেন: ওরে মূর্খ, তোরা সবাই পালা, পালা এই নরক থেকে।

এ আশ্রম নয় মগজ ধোলাই– এর কারখানা। এখানে এসোনা।

পালাও –পালাও সবাই।

চেলাদের ডোনেশানে সমাজ সেবা করা, মন্ত্রী নেতাদের ব্ল্যাক মানি সাদাতে রূপান্তরিত করার ট্যাঁকশাল এই আশ্রমে ভাদু আরো থাকতে চায়। ওকে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে। সবে তো সন্দেহের শুরু। সন্দেহ থেকেই এখানে আসা। এবার সমস্ত অপরাধের প্রমাণ নিয়ে ফিরতে হবে। নিউজ চ্যানেল পিডি টিভির দপ্তরে।

অপেক্ষা করে আছে অনেক মানুষ, সহকর্মীরা।

চাঞ্চল্যকর খবর দেবে দেশবাসীকে, প্রমাণ সহ। প্রমাণের প্রথম ইট তুলতে এগিয়ে যায় মন্দির প্রাঙ্গনে তুখোর জার্নালিস্ট কুন্দন মুখোপাধ্যায়। যার জীবনের ফিলোসফি:

সত্য যেখানে– ভয় নেই সেখানে।

সত্যের থেকে বেশি ক্ষমতাশালী আর কিছুই নেই এই ধরিত্রীতে। তাই ভেকধারি, সত্যের পূজারী বিভূতি বাবার মুখোশ খুলে দিতে হবে, মরণের পরেই --- বেটার লেট দ্যান নেভার।

মনে একটাই সংশয় : ভারতের মতন কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে পারবে কি সে জিততে ?

মুখোশ খুললেই কি লোকে মেনে নেবে ? বাঁচাতে পারবে কি পরবর্ত্তী প্রজন্মকে এই ভন্ডের হাত থেকে ?

- সেই কাজ তুই পরমাত্মার ওপরে ছেড়ে দে। তোর কাজ তুই করে যা।

গলার স্বরে চমকে ওঠে। গলাটা ভাঙা ভাঙা। অদ্বৈতজীর।

আফিংয়ের নেশা কি কেটে গেলো ?

দূরে মুচকি হাসে একফালি চাঁদ। মন্দির থেকে ভেসে আসে সন্ধ্যা আরতির সুর।

আজ একটু ঢিমেতালে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে এই চত্বরেই।

শ্যাওলা বাজে দ্রিম্মি দ্রিম্মি

ছগন মল্লিকের নেশা চা। আর কোনো নেশা নেই। তাই কচি লেবু পাতার মতন শীতের রোদ্দুর মেখে এক কাপ লেবু চা নিয়ে বসলো প্রাচীন কুটিরের বারান্দায়। সাহিত্য সমালোচক ওরফে ক্রিটিক এই মানুষটি বাঙালি হলেও তার বাবার কল্যাণে এমন অদ্ভুত নামের অধিকারী। বাবা নিপাট ভালোমানুষ,সাধারণ বাঙালি। এদের জীবনে বিশেষ অ্যাডভেঞ্চার নেই। কাজ কম্মো, রমণ ও আড্ডা। এরই ফাঁকে গগন মল্লিক ঘুরে এসেছিলেন পশ্চিম ভারত। মূলত কিছু শহরে থেকে কাজ করে এসেছিলেন সরকারী দপ্তরে। পরে বদলি নিয়ে বাংলায় চলে আসেন পাকাপাকিভাবে। কিন্তু ভালো না লাগায় আবার পশ্চিমে, নাগপুরে। ঐতিহাসিক শহর, কমলালেবুর মাদুর বিছানো শহর।

অবাংলাকে ভালোবেসে ফেলা গগন ছেলের নাম রাখেন ছগন, অবাঙালী তালে।

আদর করে ডাকেন ছগ্গু। এই নামই কাল হল। ছগন ভর্তি হল বাংলার এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। সেখানে র‍্যাগিং এর চোটে প্রায় প্রাণ যায়। ছেলেরা ডাকতো ছাগল বেল্লিক। এক ক্লাস ওপরে পড়া কৃষ্ণকলিকে তো ছেলেরা অন্ধ করে দিয়েছিলো।

ছাদের শিকের দিকে চেয়ে আবৃত্তি করতে হবে। হুটোপাটিতে শিক ঢুকে যায় চোখে। একটি নয়ন হারালো রঙ চয়ন। ভয়ে ছগন কলেজ ছাড়া। সেশন নষ্ট করবে না ভেবে ভর্তি হল সাহিত্য ক্লাসে। ভালোলাগতো। পরে ক্রিটিক হয়।

এখন বই টইও লিখছে। এসেছে বিদেশে একটি বই লেখার ব্যাপারে।

বইয়ের নাম পয়সার ওপিঠ। আসলে বইটি লেখা হচ্ছে বিখ্যাত দ্বীপ পোর্ট পিটারকে নিয়ে। তাই ছগন এসেছে এই দ্বীপে। রিসার্চ করতে। ঠাঁই পেয়েছে এক মেমসাহেবের কটেজে। কনভিক্টস্ কটেজ নাম। বেশ আদর

যত্নের সঙ্গেই আছে । মহিলার বয়স আশির ওপরে । নিপুন ভাবে বলে যেতে পারেন অনেক গল্প । রয়েছে সর্বক্ষণের সঙ্গী কুকুরী মিসি ।

- মিসি, মিসি, ও লিটিল স্লিপি ডগ গেট আউট অফ দা বাস্কেট ।

বুড়ি এগিয়ে গিয়ে কুকুরীকে কোলে করে নামিয়ে আনে । যাবে দুজনে পার্কে ঘুরতে । পার্ক হল একটি ছোট্ট টিলা । টিলাকে ঘিরে সমুদ্র । তারই পাড়ে পোর্ট পিটার । পমি(প্রিজনার অফ মাদার ইংল্যান্ড) বন্দীদের মধ্যে যারা আরো দুষ্ট তাদেরকে পাঠানো হত এখানে । অনেক সময় নির্দোষ বন্দীকেও আনা হত । রক্ত দিয়ে লিখে গেছে তারা প্রিয়জনেদের কথা ।

- আর দেখা হবেনা তোমাদের সঙ্গে । কোনোদিন হবেনা ।

বুকের রক্ত দিয়ে লেখা এইসব কথা দেখে চোখের কোণায় জল ছগনের ।

ছগন অনেক বই পড়েছে এই বিষয়ে লেখা, আগে –কিন্তু আজ চোখে দেখছে । পড়তে হয়েছে । ও আর অন্যসব ক্রিটিকদের মতন আদৌ নয় । যাঁরা বই না পড়েই রিভিউ লেখেন । বলেন : ধুস, অত বই কি পড়া যায়, একটু উল্টেপাল্টে দেখেই বোঝা যায় ভেতরে কি আছে বা থাকতে পারে ।

একবার এরকম এক ক্রিটিক এক নব লেখিকার বই দেখে রিভিউ লেখেন যে : গল্পগুলি বড্ড একঘেয়ে ।

আসলে লেখিকার গল্পের শেষে– ও হেনরির মতন উইটি টুইস্ট থাকতো ।

পরে লেখিকার চিঠি পান : মিস্টার ক্রিটিক আপনি মনে হয় বই না পড়েই লিখে দিয়েছেন । নাহলে এন্ডের টুইস্টগুলি চোখে পড়লো না যা গল্পের বিশেষত্ব ?

আপনার আগে আমি আরো কয়েকজনকে পড়িয়েছি যাঁরা এই ফিল্ডে স্বনামধন্য । তাঁরা কিন্তু সবাই ঐ উইটি টুইস্টের কথা উল্লেখ করেছেন ।

ছগন কোনো রিস্ক নেয়না । কি লাভ খামোখা ?

পোর্ট পিটারের যতটুকু দেখেছে খুবই দু:খ ময় ও ন্যাক্কারজনক ইতিহাস ।

বিচারাধীন বন্দী একরকম কিন্তু সামান্য পাউরুটি চুরি কিংবা ছাতা চুরি কি বিরাট অপরাধ ? ছগন এগুলি নিয়ে ভাবতে চায় । গো প্লাস এষণা করতে চায় ।

তারপরে লিখবে দূর্দান্ত বই যা বাংলায় আগে কেউ লেখেন নি - পয়সার ওপিঠ ।

বেস্ট সেলার না হয়ে যায়না । ছগনের আবার খেয়ালি পুলাউ পাকানোর বদভ্যাস আছে । একবার তো ক্রিয়েটিভ ফিল্ডের হোতাদের বাড়িতে নেমতন্ন করে খাবার দেবার নাম করে খেয়ালি পুলাউ দিতেই তারা রেগে বোম । আসলে ওঁরাও মজা করছিলেন, এরকম বেরসিক কি কেউ হন যে রেগে যাবেন ?

নিখিল ডাজ । বাংলায় দাস- সাহেবের কাছে ডাজ । এলাকার গাইড । পা নেই । ল্যান্ডমাইনে হারিয়েছেন । হুইল চেয়ার বসে বসে গাইড করেন মানুষকে । বলেন পোর্টি পিটারের না জানা আলো আঁধারির গল্প । বাঙালী ।

বাঙালী শুনেই দেখা করতে রাজি হয় ছগন । তারওপর হুইল চেয়ারে বসে বসে মানুষকে গাইড করেন । অসম্ভব ভালোমানুষ নাহলে সম্ভব নয় । ছগন দেখা করতে উৎসাহী ।

ভদ্রলোক আসেন দুপুরে । নিয়ে আসেন ওর পার্টনার ব্লসম মাইনো । ইতালিয়ান । হলুদ মেয়ে, নাকটা একটু চাপা । কালো চুল । অনেকটা সোনিয়া গান্ধীর মতন । জানা গেলো ব্লসম-এইচ আই ভি পজিটিভ । একটি এইডস্ আক্রান্ত মানুষের শিবিরে কাজ করতে গিয়ে কোনোভাবে এই ভাইরাস দেহে প্রবেশ করেছে । নিখিল কিন্তু ওকে ছাড়েন নি । একসঙ্গেই থাকেন ।

ছগন মুগ্ধ । মুগ্ধ এরকম একজন উচ্চস্তরের মানব সন্তানের সঙ্গে দেখা হবে ভেবে ।

সে যেই বুড়ির সাথে থাকে সেও নিখিলকে চেনে । অনেকেই চেনে । উনি খুব প্রশংসা করছিলেন । বলছিলেন : ঝড় জল বৃষ্টি কিছুতেই দমেন না উনি । চেয়ার ঘুরিয়ে আসবেনই । হয়ত কোনো পর্যটক নেই । তখন

এককাপ উষ্ণ কফিপান করেই চলে যাবেন। তবুও ব্লসম ওকে ড্রাইভ করে আনবেই। আগে খুব ঘোড়ায় চড়তেন। পা দুটি বাদ পড়াতে এখন ঘোড়ায় চড়েন না। নিজের একটি ফার্ম হাউজ আছে কিছুদূরে। যার একটি অংশ ভাড়া দিয়েছেন ম্যাকডোনাল্ডস্ ও কে -এফ -সি কে। হাই ওয়ের ওপরে ফার্মহাউজ তাই সহজেই লোকে আসে এই খাবার দোকানগুলিতে। সময় কাটানোর জন্যে পোর্ট পিটারে ট্যুর কন্ডাক্ট করেন।

প্রচুর দান ধ্যানও করেন ভদ্রলোক। আরেকটি বিশেষত্ব হল আজ পর্যন্ত কেউ ওঁকে কোনো ঘটনা নেগেটিভ ভাবে বিচার করতে দেখেন নি। সবার ও সবকিছুর পজিটিভ দেখতে উনি ভালোবাসেন।

জানেন অনেক। বাঙালী তো। জন্ম জ্ঞানী। তবে স্যুডো নন।

যা জানেন না বলে দেন। খোলামনে।

ছগন আজ একটু বেলা করে বাড়ি যাবে। একটি প্রেজেন্টেশান আছে রাতে সেটা দেখে যাবে। আজই আবার নিখিল ডাজের সঙ্গে মিটিং মানে আলাপ করার কথা।

আসবেন দুপুরে। এক সঙ্গে লাঞ্চ খেতেও পারে। দেখা যাক।

পোর্ট পিটার এলাকায় একটি মাত্র ভারতীয় দোকান ছত্তিশগড়।

এই নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে কাহিল সাহেবরা। চাট্টিস গাড়া বলে টলে একাকার। কেন যে এরকম উদ্ভট নাম দিয়েছে কে জানে। সোজা নাম কি নেই ?

রাম, যদু, মধু কত তো আছে রে বাব্বা ! একেবারে অভিজ্ঞানম শকুন্তলম্-ই দিতে হবে এরকম কোনো কথা আছে কি ?

মুখটা বিকৃত করে এগিয়ে যায় ছগন। অবশ্য তার পিতৃদেবও তো আজব মানুষ।

এরকম ছাগল মার্কা নাম কেউ রাখে নাকি ?

পশ্চিমে কি ভালো, শ্রুতিমধুর নাম নেই ?বেশ একটা মকরধ্বজ কিংবা পুরন্দর অথবা ইন্দরজিৎ ? মন্দ কি ? তা না ছো গো ন--- হা হা হা !

পোর্ট পিটারের যেদিকে ছত্তিশগড় সেদিকটা একটু ফাঁকা। একটি ভাঙা গীর্জা আছে। আর অনেক সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো বেয়ে উঠলে দেখা যায় ওপরে কিছুই নেই শুধু একটি অপরিচ্ছন্ন চাতাল। ওপর থেকে পোর্ট পিটারকে বেশ দেখা যায়। মনে হয় কেল্লার চুড়ায় দাঁড়িয়ে ছগন। পোর্টকে হাতের তালুতে বন্দী করতে পারবে। কিছু বেহিসেবী গাছ ও শ্যাওলার আস্তরণ। ব্যস। ন্যাড়া চাতাল। একলা ও মৌন চাতাল।

নিখিল ডাজ এলেন সময় মতন। সঙ্গে রূপসী ব্লসম, নামের মতনই নির্মল ও সুন্দর। খুবই ডিগনিফায়েড। এইচ আই ভি পজিটিভ ভাবতে কষ্ট হয়। হাত মেলাবে কিনা ভাবছিলো কিন্তু দেখলো নিখিল ওকে চুম্বন করছেন ও ওর বোতল থেকে জল পান করছেন। হাত বাড়িয়ে দিলো ছগন, একটু ঢিমেতালে। ব্লসম হাত বাড়িয়ে হ্যাল্লো বল্লো। মুখে আলগা হাসি। ছগন ইতস্তত করছিলো বলেই হয়ত। ভয় লাগছিলো যে! ওরও রোগটা যদি হয়ে যায়। জরা সি সাবধানী জিন্দেগী ভর আসানি : মনে মনে হেসে ওঠে টিভির বিজ্ঞাপনের কথা ভেবে।

হাসেন নিখিলও।

- আমিও বাঙালি, আপনিও –অথচ দেখুন দেশে কেউ কাউকে চিনতাম না। আলাপ হল এই সুদূর পরবাসে। আবার হাসেন নিখিল। কেবলই হাসেন।

হাসতে পারেন হয়ত মনটা আয়নার মতন বলেই। প্রতিবিম্বের রং ঘোলাটে নয়। স্বচ্ছ। কাচের মতন। এরকম নির্মল বাঙালী আজও আছেন ভাবলে ভালোলাগে।

লোকে বলে বাঙালী ডেভিলস্ অ্যাডভোকেট। হিপোক্রিট। তাঁরা নিখিল ডাজকে দেখেন নি। না জেনেই আমরা এত্তো বলে ফেলি!

বেশ জমে উঠলো। তারপরে নিয়মিত দেখা হতে লাগলো। হিমঝরা সন্ধ্যায়, শীতল বাতায়নের ধারে, ভাঙা অলিন্দের গায়ে ক্রমশ বন্ধুত্ব গাঢ় হতে লাগলো।

- তোমার কি খেতে ভালোলাগে ছগ্গু ? নিখিলও আজকাল এই নামেই ডাকেন।

- পিওর ননভেজ তবে কন্টিনেন্টালও চলে।
- আমি যখন এই দেশে প্রথম আসি তখন হন্টেড হাউজ কিনে রেনোভেট করে বিক্রি করতাম চড়া দামে। অনেক টাকা কামালাম কিন্তু শান্তি পেলাম না। অর্থই অনর্থম জানতাম। আমারও মনে আনন্দ এলো না। ভাবলাম কী লাভ ফালতু বেঁচে থেকে। তারপর সেবামূলক কাজে জড়িয়ে ফেললাম নিজেকে।

অনেক ডোনেট করেছি। আমি ও ব্লসম নিজেদের জন্মদিনে পার্টি দিইনা। কোনো চ্যারিটেবেল অর্গানাইজেশানকে ডোনেট করে শুভদিনটা কাটাই।

আসলে মানুষ যতদিন না কুবেরের ধনের সন্ধান পায় তার পেছনে ছোটে কিন্তু জাদু বাক্স পেয়ে গেলে জীবন একঘেয়ে লাগে। ঠিক যেমন আমার। মনে হয় : কী করলাম মানুষের জন্য ?

ছগন মুগ্ধ, বাকরুদ্ধ। নিখিলের ফার্ম হাউজে নিমন্ত্রিত ছগন। পিওর ভারতীয় ননভেজ রান্না করেছেন ব্লসম নিজে হাতে। খুবই সুস্বাদু। খুবই রসিয়ে খাওয়া হল। খাওয়া শেষ হতে মদ্যপান শুরু হল। নিখিল গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন নানান গল্প। কী করে ল্যান্ডমাইনে পা হারালেন। কীভাবে ব্লসমের মতন পরীর সন্ধান পেলেন। ব্লসম কত ভালো। মোহময়ী শুধু রূপে নয় গুণেও।

বেচারির অসুখটা যদি না হত !

গভীর রাত হয়ে গেলো কথায় কথায়, গল্পে গল্পে। মায়াবী চাঁদ এত বড় যে জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যাবে। জানালার ধারে ব্লসমের আঁকা বিরাট ছবি। ঘন কৃষ্ণ এলোচুলে ব্লসম। নগ্নিকা। ন্যুড ব্লসম। রহস্যময়ী ব্লসম। ফুলের কুঁড়ি নন। জঙ্ঘা থেকে একটি মানব সন্তানের মুখ বেরিয়ে এসেছে। ভালো করে দেখলে দেখা যায় নিখিলের মুখটি। পুরো ছবিটাই প্যাস্টেলে আঁকা। অঙ্কন শৈলি দেখবার মতন। যেন জীবন্ত অবয়ব, চাঁদের আলো পরে মায়াময়।

ছগন আর্ট ক্রিটিক নয়। তাই সাধারণ বোধে বুঝলো এ ওদের প্রেমের ছবি। মিলনক্ষেত্র। ছবিটি মিলন তিথি। নিচে লেখা : কনফেশান।

হয়ত এইচ আই ভি পজিটিভ জানার পরে এই ছবি আঁকা হয়েছে । কে জানে ?

- আপনার নামটা ভারি সুন্দর । ব্লসম । বলে মৃদু হাসে ছগন । ব্লসমও হাসেন ।

নিখিল বলে ওঠেন : হ্যাঁ ওটার নামটা দেখেছো ছগ্গু ? কনফেশান । আজ আমারও কিছু কনফেশান করার আছে তোমার কাছে ।

মনে হয় ভদ্রলোকের নেশা চড়েছে । মাত্রাহীন কথা বেরিয়ে আসছে ।

- আমিও কনফেস করতে চাই । আমি মহামানব নই ছগ্গু । তোমরা আমাকে ঈশ্বর করেছো । আমি রক্তমাংসের এক মানুষ । যার পাপ আছে, লোভ আছে । কাম আছে, যন্ত্রণা আছে । ওরা আমাকে সবাই দেবতার আসনে বসিয়েছে, মেসাইয়া বানিয়েছে । কিন্তু এ আমার আত্মশুদ্ধির রাস্তা । আত্মগ্লানি থেকে বাঁচতে বেছে নিয়েছি এই পথ । আমি যিজাস নই । আমি আল্লাহ্ নই । আমি এক রক্ত মাংস । আমি পাপ করেছি । হ্যাঁ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছি একটি সুস্থ পরিবারকে । আজ এইটুকু না করলে কি জবাব দেবো বিবেকের কাছে ? বয়সের দোষে যা করেছি তার প্রায়াশ্চিত্ত না করে মরেও শান্তি পাবোনা । আই ওয়াজ আনেবেল টু কন্ট্রোল মাই ভাইসেস । আই সেলিব্রেটেড মাই ভাইসেস ।

জানো কি করেছি ? জানতে চাও ??

এই নিখিলই আসতেন তাদের পাশের বাড়ি, নাগপুর শহরে । অসহ্য গরমে শুয়ে থাকতো উদোম হয়ে প্রতিবেশীর ঘরের মেঝেতে ।

জানালা দিয়ে দেখা যেতো । পর্দা সরিয়ে দেখতো ছগন ও তার ভাইবোনেরা ।

প্রতিবেশীর সুন্দরী বিধবা বৌ দীপা । লোকে বলতো দীপি -------

ছগনের চোখে ফ্ল্যাশব্যাকের মতন একের পর এক ঘটনা । সবুজ শহর নাগপুরে তাদের পাশের বাড়ির দীপি জেঠিমা । অমল জেঠু । খুবই ভালোবাসতেন ওঁরা ছগনকে । অদ্ভুত নামটা নিয়ে মজাও করতেন ।

- কী নাম দিয়েছে তোর বাবা, তোর লাইফ খেয়েছে রে !

ছগন মনে মনে খুশি হলেও চুপ করে থাকে । যাক একজন তাহলে ওর ব্যাথাটা বুঝতে পেরেছেন !

সেই অমল জেঠু মারা গেলেন ভুগে ভুগে, ব্রেন ক্যানসারে । খুব স্মোক করতেন ।

মারা যেতেই দীপি জেঠিমা এক পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে থাকতে লাগলেন । ওদেরই বাড়ির অন্যপাশে থাকতেন বোসেরা । বোসের বাবা লন্ডনে কাজ করতেন । তাদের পরিবারের দেখভাল করতেন দূর সম্পর্কের ভাই নিখিল দাস । সালটা ১৯৭০ ।

নাগপুরের বিখ্যাত কমলালেবু খেতে খেতে কত ঘটনা দেখেছে, ছেলেবেলায় ।

দীপি জেঠিমাকে কত শ্রদ্ধা করতো ওরা । ওর বাবা - মা । শুনেছিলো নিখিল তাঁর সঙ্গে দৈহিকভাবে মিলিত হত । বয়সে দীপি জেঠিমা বেশ বড় নিখিলের থেকে । পাড়ার লোকেরা কয়েকবার ওঁকে আলুথালু বেশে দেখেছে । কেউ দেখেছে ওরা একসঙ্গে স্নান ঘরে । নগ্ন । কেউ দেখেছে উলঙ্গ জেঠিমাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে যোনিতে চুম্বন করছে পরিযায়ী নিখিল । সেই সময় এই অদ্ভুত প্রেম সমাজে ভালো চোখে দেখা হতনা। তারওপর নাগপুর ছোট শহর ।

গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছে সর্বত্র । একদিন ছেলে রাণা তার মাকে নগ্ন অবস্থায় নিখিলের বাহুবন্ধনে দেখে আর সহ্য করতে পারেনি । ক্লাস টেনে পড়া জলজ্যান্ত ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে,মামাবাড়িতে । দাদার আত্মহত্যা দেখে ক্লাস সেভেনে পড়া বোন বিষ খায় । মারা যায় । দীপি জেঠিমার হুঁশ ফেরে ।

দিনটা আজও মনে আছে ছগনের । বার্ষিক পরীক্ষা চলছিলো । স্কুল থেকে ফিরেই শোনে জেঠিমা ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন । নিখিল নিরুদ্দেশ । মাত্র সাতদিনের ব্যবধানে গোটা পরিবার মিলিয়ে গেলো হাওয়ায় । জেঠু মারা গিয়েছিলেন মাস খানেক পূর্বে । ভেলোরে । বাড়ি পুলিশ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় । পরে নিলাম হয় জেঠুর ভাই মারফৎ । অভিশপ্ত বাড়ি বলে কেউ একসপ্তাহের বেশি টিকতে পারতেন না । অনেক

বিজ্ঞানীও এসেছেন । নানান অদ্ভুত ঘটনা দেখে চলে গেছেন । এখন ওটা ভেঙে কালী মন্দির করেছেন এক পুরোহিত । কামাখ্যায় সাধনা করে এসেছেন উনি ।

নিখিল বেপাত্তা । কেউ ওকে আর দেখেনি । যার বাড়িতে এসেছিলো সেই পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিলনা । লন্ডন থেকে এসে মিস্টার বোস নিখিলের হয়ে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছিলেন দীপি জেঠিমার পরিবার ও জেঠুর পরিবারের কাছে ।

সিনেমার স্লাইডের মতন পুরো ছবিটা ভেসে উঠলো ।

নিখিল ডাজ মদের ঘোরে বকে চলেছে । জেঠিমার সঙ্গে কত সঙ্গম করেছেন, তাঁর উঠতি বয়সের মেয়ের স্তনে হাত দিয়েছিলেন এই বলে : কিশোরীদের পরীক্ষা করে দেখতে হয় ব্রেস্ট ক্যানসার হয়েছে কিনা !

নিখিলের পরবর্ত্তী টার্গেট ছিলো ঐ মেয়ে – মিঠি ।

মিঠি, রাণাদাদা, জেঠিমা সবাই শেষ হয়ে গেলেন । জেঠিমার যৌন লালসা শেষ করে দিলো সুন্দর একটি পরিবারকে । জেঠু জীবিত থাকলে এমন হত না ।

জেঠুর আত্মা কি শান্তি পেয়েছেন ? নিখিল বলে চলেছেন : আমার কৃতকর্মের শাস্তি আমি পেয়ে গেছি । আমার পা হারিয়ে গেছে । ব্লসমকে ধরেছে মারণ ব্যাধি ।

আমি জীবনের কাছে হেরে গেছি । কুকর্ম তোমার পিছন ছাড়বে না । যেখানেই যাও না কেন !! নিজ মাতৃভাষায় কিংবা ইংলিশে আত্মজীবনী লেখার সাহস আমার নেই । আমি পূর্ব ভারতীয় ভাষা যা নিজ মাতৃভাষার মতনই জানি সেই ভাষা জাংরি তে লিখেছি আত্মজীবনী । মানুষকে জানিয়েছি । হয়ত মৃত্যুর পরে কোনদিন কেউ অনুবাদ করবেন । বইয়ের নাম *আই মাই আত্মলন্দু পুলুছিয়া ।*

নিখিলের মদে ডোবা অবয়বটা অদ্ভুত লাগছে । ভীষণ নীচ ও লোভী মনে হচ্ছে তাঁকে। এতদিনের এত শ্রদ্ধা ও ভালো ভালো ধারণা আর বইতে পারছে না ছগনের মন। নিজেকেও খুব ছোট মনে হচ্ছে এরকম এক মানুষকে

মহামানব ভেবে ফেলার জন্য। সত্যি আমরা কত কম জেনেই কত বেশি বলি, ধারণা করে ফেলি।

নিখিল ঢলে পড়েছেন সোফায়। দামী সোফা। ব্লসম মদের গেলাস সরিয়ে নিচ্ছেন। চাকর ক্রিস্টোফার এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পাঁজাকোলে। হুইল চেয়ার একপাশে ঠেলে। মাথা নিচু করে এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা ছগন স্পষ্ট শুনতে পাছে শ্যাওলার শব্দ। শ্যাওলা আজ বাজছে। বাজছে দ্রিমি দ্রিমি। ভালো হতে চাওয়াও তো ভালো।

ফিউনেরাল

একমনে পুড়ে যাচ্ছে ভাষা ভাস্কর সৌমিত্র ইকবালের দেহ । একটু দূরে কালো চশমা পরে দাঁড়িয়ে ওঁর স্ত্রী মোহর । মোহর চৌধুরী । পেশায় নর্তকী । ক্লাসিক্যাল ড্যান্সার ।

নানান ধরণের নাচ ছাড়াও ইন্টেলেকচুয়াল আর্ট ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বেশ নাম করেছিলো । সবাই তাকে বলতো : শিল্পী নর্তকী । চেহারায় কোনো বিশেষত্ব নেই মোহরের । শীর্ণকায়া । সাধারণ গায়ের রং, মুখটা মনিষা কৈরালার মতন । চাপা নাক, ছোট চোখ, ঢুলুঢুলু ভ্রূপল্লব ।

পেশাদার নাচিয়ে বলে বাঙালী মেয়ের সম্বন্ধ করে বিয়ের বেশ অসুবিধে হচ্ছিলো । সবার এক কথা : এত নেচে বেড়ালে সংসার দেখবে কখন ?

ও যদি ফিজিসিস্ট কিংবা ডাক্তার হত তাহলে সমস্যা হতনা । যেহেতু নাচিয়ে তাই অসুবিধে । মুখে স্পষ্ট করে এই পয়েন্ট না বললেও বোঝা যায় বেশ ।

বিয়ে অবশেষে হল এক লেখকের সাথে । এই মূহুর্তে পুড়ে যাচ্ছে তারই দেহ ।

গনগনে চিতার আগুনে । ধর্ম অনুসারে তাঁকে কবর দেবার কথা । কিন্তু আশ্চর্য এই লেখক নিজে উইলে লিখে গেছেন যে তাঁকে যেন হিন্দু মতে পোড়ানো হয় । আসলে লেখক মহাশয় একবার হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছিলেন তখন নাম নেন ইকবাল আবার শেষ সময়ে হন হিন্দু, মনে মনে --তাই চিতার আগুনে পুড়ে যাবার মনোবাসনা । কোনো ধর্মই আসলে তাঁকে শান্তি দিতে পারেনি । দেখেছেন ধর্মের আড়ালে মানুষের দাঁত নখ ।

ভেঙে পড়েছেন । নাস্তিক হতে পারেন নি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন বলে । তাই ত্যাগ করেছেন বিশেষ ধর্ম ।

সৌমিত্র ইকবাল মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পেতেন। কোথাও কেউ মারা গেছে শুনলেই মুড অফ হয়ে যেতো সেদিন। কোনো ছোটখাটো অসুখ হলেও বার বার চিকিৎসকের কাছে যেতেন। একমাত্র পুত্রকে করতে চেয়েছেন ডাক্তার, হয়ত অবচেতনে মৃত্যুকে রুখতেই। কিন্তু রুখতে পারলেন কি ? পুড়ছে দেহ উড়ছে না ছাই। কারণ মৃতদেহ রয়েছে একটি ঢাকা প্রকোষ্ঠে।

ইটের চেম্বার, পুরাতন দিনের ফায়ার প্লেসের মতন। বাইরে,ঠিক যেন একটি তন্দুর চুল্হার সামনে রয়েছেন ওর সদ্য বিধবা স্ত্রী। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে জীবন্ত হতে দেখছেন।

আকাশে আজ মায়াবী রঙ। মেঘের পান্থনিবাসে ক্লান্তিকর অস্পষ্ট ছায়া, দুলে দুলে চলেছে।

ভাষা ভাস্কর সৌমিত্র ইকবাল মোটেই জাপানি সাহিত্য পড়তেন না কারণ তারা মৃত্যু নিয়ে কবিতা লেখে। শ্রাদ্ধ বাড়িতে যাওয়া তো সুদূর পরাহত। নিজের বাবা যখন মারা যান জ্ঞান হয়নি তেমন। পরে মা মারা যেতেই শ্রাদ্ধ শান্তি না করে পাক্‌কা সাতদিন একটি ঘরে নিজেকে আটকে রাখেন। লোকে ভাবে দু:খে, শোকে। মোহর জানে আসলে তা ভয়ে। পরে অবশ্য এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাইকিক ব্রেট ফ্যাভোলারোর কৃপায় মৃতা মায়ের স্পিরিটের সাথে কথা হত নিয়মিত।

ব্রেটের সদাহাস্যময় মুখ দেখে এমনই ভালোলাগে লোকের। আর জানা গেলো স্পিরিট দুনিয়ায় মা ভালো আছেন। অপেক্ষা করছেন পর জন্মের। তবুও ভয় যেতো না সৌমিত্রের। কিসের ভয় কে জানে ! দেহ তো মাটি আর আত্মা –শাশ্বত। তাহলে ?

এই ঈষৎ ক্ষেপা মানুষটির সঙ্গেই তো কেটে গেলো অনেকগুলো বছর ! আসলে মোহরের জীবন ও ভুবন, তার নাচকে মর্যাদা দিয়েছিলেন উনি। নিজেও ক্রিয়েটিভ তো !

বহু জায়গায় মোহর নাচের প্রোগ্রাম করতে গেলে ছেলেকে দেখেশুনে রাখতেন। সংসারকেও সাজিয়ে রাখতেন। অবসরে লিখতেন। খুব নাম হয়েছিলো। প্রথাগত গল্পে বাঁধা পড়েননি। লিখতেন নতুন ধরণের গদ্য ও পদ্য। একটি বাক্যকে এমন করে সাজাতেন যাতে তার শুরু ও শেষ ধরা

না যায় অথবা একটি গদ্য লিখলেন যার কোনো শেষ ও শুরু নেই। কথ্য ভাষায় লিখতেন পদ্য। যেন দুজন গভীরকথায় মগ্ন। এইরকম নানান সাহিত্যিক টুকিটাকি দিয়ে ভরিয়েছিলেন ভুবন। নাম করে প্রাইজও পেয়েছেন। তবে বই বিক্রী হত খুব কম। তাই তাঁর সংসারে অর্থের টানাটানি চলতই। যৌনতা নিয়ে লেখেন নি একেবারেই। জিজ্ঞেস করলে বলতেন : ওসব লেখার জন্য অন্য অনেকে আছেন, আমি নতুন কিছু সংযোজন করি।

খুবই খারাপ লাগছে মোহরের। হৃদয়ে বিষাদের সুর। মেঘমল্লার। তার জীবনে বেশি মানুষ নেই। পারিষদ অনেক কিন্তু কাছের মানুষ কম। মাত্র তিনজন। একজন এই পতিদেব, অন্যজন তার বান্ধবী হিয়া দত্ত যার সাথে আজ ৫ বছর কোনো যোগাযোগ নেই আর ছিলেন অন্য একজন। অনেক মন্দ কথা বলেছে হিয়া তার সম্পর্কে অন্যদের। সে স্বার্থপর, ধান্দাবাজ, অহংকারি। যখন নাম হয়নি তখন হিয়ার সাথে খুব মিশতো এখন আর খবর নেয় না। ফোন ধরে না। এইসমস্ত গতানুগতিক নিন্দা করেছে। মোহর কোনোদিন মুখ ফুটে বলতে পারে নি যে হিয়ার স্বামী পল্লব ঘোষের সঙ্গে মোহরের সম্বন্ধ এসেছিলো। নর্তকী দেখে আগে এলেও পরে ওরা পিছিয়ে গেছেন। এখন সম্পর্ক রাখলে যদি ভুল বোঝা বুঝি হয় – সে সরে এসেছে। হিয়া তো জানেনা –সত্য। তাই দু:খে নিন্দা করে চলেছে। মোহর কিইবা বলবে – তোর বরের সাথে আমার বিয়ের কথা হয়েছিলো ?

একি বলা যায় ?

হিয়ার এখন বিচ্ছেদ হয়ে গেছে পল্লবের সাথে। ভাগ্যিস মোহর আর পিকচারে নেই। হয়ত ওকেই সন্দেহ করতো এখন ! মানুষের মনের কী ভরসা ??

তৃতীয়জন কিন্নর রায়। কোরিওগ্রাফার। বিবাহিত। নি:সন্তান। স্ত্রী মেমসাহেব। শোনা যায় ওয়াইল্ড পার্টিজ নিয়েই সদাব্যস্ত, স্বামীর জন্য বিশেষ সময় রাখেন না। কিন্নর কয়েকবার ইশারায় বলেছেন এইসব কথা। তাঁর একাকীত্বের কথা। মোহর চুপ করে শুনেছে। কিন্নরের নাম প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনের জন্য। ওঁর সৃষ্ট নাচ সেরকমই। দ্রৌপদীর রোদন নাচে মণিপুরীর সাথে রুশ ব্যালে মিলিয়ে তৈরি

করেছিলেন অপরূপ ভঙ্গিমা। বহুদিন যোগাযোগ নেই। কারণ প্রথম দিকে নাচে উৎসাহ দিলেও পরে খুব গোলমাল হয় ওঁর সাথে। উনি হঠাৎ এক উঠতি নাচিয়েকে নিয়ে পড়েন,যাঁর তেমন প্রতিভা নেই বলেই সবাই জানেন। মেয়েটির নাম চৈত্রা বিশ্বাস।

চৈত্রদিনের ঝড়ের মতন এসেছিলো সে –পরে হয়ে উঠেছিলো কিন্নর বন্দিতা। প্রথম প্রথম তেমন কিছু ঘটেনি। পরে চৈত্রাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল আরম্ভ হল। কঠিন নাচের ব্যাপার স্যাপার নাকি সেই ভালো পারে। নটরাজের তান্ডব নৃত্য ও তার সাথে কনটেম্পোরারি নাচ মিলিয়ে তৈরি হয়েছিলো সুন্দর কলা। সেই কলাক্ষেত্রে বাতিলের তালিকায় মোহর –যাঁর নাম হয়েছে সুললিত ভঙ্গিমা ও মুদ্রার জন্য। নৃত্য পটিয়সী বাদ পড়েছেন, ঢুকেছেন চৈত্রা বিশ্বাস। বড় অবিশ্বাসী, কোরিওগ্রাফার কিন্নর রায়।

প্রোগ্রামের দিন তো প্রকাশ্যে অপমানও করেছেন। কেঁদে ফেলেছিলো সর্বসমক্ষে মোহর। পরেরদিন খবরের কাগজে এই নিয়ে সংবাদও বার হল।

লোকে লিখলেন : Acclaimed Choreographer Kinnor Roy probably missed his vocabulary .... যোগাযোগ আর নেই এখন। কেটে গেছে সুর, ছন্দ, লয়।

স্বামী শায়িত চিতায়। চিতাতেই সব শেষ, প্রেম, বেদনা, মায়া ! পঞ্চভূতে বিলীন হচ্ছে দেহ, আত্মা –যা মরেনা তাকে কীকরে স্পর্শ করবে মোহর ? চোখের কোণায় জল। বুকে পাথর। মানুষটি আর নেই। ব্যবহৃত সাবান সেরকমই আছে শিশি ভর্তি, তোয়ালে সাজানো, চটি, ড্রেসিং গাউন, খাতা কলম –শুধু লেখক নেই। ওঁর মৃতদেহের সামনে বসে মানুষের কী মনে হতে পারে তাও লিখে গেছেন উনি, সুছন্দে। কিন্তু ---- দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মুছে নেয় মোহর।

ছেলে তো চিকিৎসক হবে বলে স্থির করা আছে --anaesthetist – ওরা মজা করে এখন থেকেই ডাকে অজ্ঞান বাবু বলে। আজকেও এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে বাইরের বাগানে। বাবার জ্ঞান লোপ পেয়েছে চিরতরে, হয়ত তাই কাঁদছে। ওর বাবা তো নিজের মৃত্যুতে কাঁদতেন। কল্পনা করে যে

উনি মারা গেছেন । বলতেন : লেখকেরা নিজের মৃত্যুকে দেখতে পায়, কল্পনা এমনই আশ্চর্য এক বস্তু ।

বুকের কষ্টটা ভাগ করে নেবার লোক কৈ মোহরের ? ছেলেও তো চলে যাবে ! আর কষ্ট কি ভাগ করা যায় ? ডুবিয়ে দেবে নিজেকে নাচে । এইরকমই ভাবছিলো এমন সময় এসে দাঁড়ালো একটি বড় গাড়ি । ফিউনেরাল গ্রাউন্ডের সামনে ।

মৃত্যুর দূত ? নাকি জীবনের ফেরিওয়ালা ? কে এই গাড়িতে ?

গট গট করে নেমে এলেন কোরিওগ্রাফার কিন্নর রায় । ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়ি, কালো ফুলতোলা পাঞ্জাবী পরা --নিচে ঘিয়ে পাজামা, এই কষ্টঋতুতে নিদারুণ বেশ । কিন্নরের সঙ্গে বহুদিন যোগাযোগ নেই । অপমানের পরে কোনো কনট্যাক্ট রাখেনি মোহর । স্টেজ থেকে সেই যে বেরিয়ে এসেছিলো আর যায়নি ওদিকে । মোবাইলে এসেছে অনেক মেসেজ, ও জবাব দেয়নি । এসেছে ক্ষমা ভিক্ষা, তবুও ।।

ফিউনেরাল গ্রাউন্ডের বাইরে সুন্দর বাগান, ভেতরে মৃত্যুর শয্যা । বাইরে থেকে বোঝা দায় । বোর্ডটা শুধু সাক্ষী, শবদাহের । পুরনো ইটের চিতায় রোমহর্ষক গন্ধ । অন্যদিন এখানে সাইকিক ও মিডিয়ামদের আড্ডা বসে রাতে বারোটার পরে । মিডিয়াম হতে ইচ্ছুক নব নব কুঁড়িরাও এখানে আসে, সেমিনার করতে, আলোচনা করতে ।

কিছু আধুনিকের মতে অবশ্য এ পাগলামো । তাতে সাইকিকদের কিছুই যায় আসেনা। ওরাও এই আধুনিক মানবদের নিয়ে হাসাহাসি করে, বলে : ওগুলোর মাথার একটা দিক আন্ডার ডেভেলপড্, তাই এক্সট্রা সেন্স নেই কোনো । অনলি ফাইভ সেন্সেস,ড্যাম ইট !

বড় বড় সবুজ গাছ ও দুর্বাদলের সমাহারে বাগান সুসজ্জিত । কিছু কসমস, জিনিয়া ও ডালিয়া রয়েছে থরে থরে । মোরাম বিছানো পথ ধরে আসছে কিন্নর । চাতালে উঠে মিহিস্বরে ডাকলো : মিসেস ইকবাল আই মিন মোহর, হাউ আর ইউ ?

মোহর ভেবেছিলো মুখ ঘুরিয়েই থাকবে কিন্তু পারলো না ।

চৈত্রা চৈত্রদিনের উড়ো ফুলের মতই উড়ে গেলো মন থেকে নিমেষে। অনেকেই বলেছে : চৈত্রার প্রেমাগুনে পুড়েছেন কিন্নর তাই সাধারণ মেয়েকে নিয়ে এত কৌতুহল ! কিন্নরের বিদেশিনী স্ত্রীও বিরক্ত তাঁর ওপরে এই জন্য। লোকমুখে শুনেছে মোহর। বাজারে গুজব ভাসে ওঁদের দুজনকে নিয়ে ক্রমাগত। কিন্নরের শেষমেশ ডাইভোর্সও হয়ে গেছে বলে শোনা গেছে। আজ দাঁড়িয়ে মোহরের থেকে একটু দূরেই।

মোহর আর নির্বাক নয়, পারেনা। কাউকে বলেনি কোনদিন যে সে কিন্নরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। স্বামীকে ছাড়ার কথা মনে হয়নি শুধু মনে হয়েছিলো : তোমার সঙ্গে আগে কেন দেখা হয়নি ? অনেকটা সময় তো কুমারী ছিলাম কোথায় ছিলে তখন ?

মুখ ফুটে কিছুই বলেনি। বলেন নি কিন্নর রায়ও কিন্তু কিছু কিছু ব্যবহার দেখে মনে হত যে উনিও অগ্রহী।শুধু চৈত্রাকে নিয়ে হুল্লোড় করা দেখে ভেঙে যায় বুক। অধিকারবোধ একটা জন্মেছিলো তো অবচেতনে !

কিন্নর এগিয়ে এলেন। মুখ ঘুরিয়ে হাসলো মোহর।এই স্বামী শোকের পর্বে যেন একরাশ দমকা বাতাস।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলে উঠলেন : কেমন আছেন ? জানি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই প্রশ্ন করাটা বাতুলতা, তবুও !

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো মোহর : আমি ভালো নেই, ভালো নেই ! কী করে ভালো থাকবো ? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?

কোনদিন কিন্নর রায়কে তুমি সম্বোধন করেনি মোহর, এই প্রথম।

ওকে সান্ত্বনা দিয়ে কিন্নর হাঁটু মুড়ে বসলো। মাটিতে। ওর সামনে। বললো : আমি তোমাকে নিতে এসেছি মোহর। আমাদের গ্রুপে। আমি নতুন গ্রুপ তৈরি করেছি যার নাম দিয়েছি মোহরমিথ। তুমিই সেখানে প্রধান নাচিয়ে ও শিল্পী। তোমার মতন গিফটেড্ নৃত্য শিল্পী হাতের কাছে থাকতে বাইরের কাউকে ডাকবো কেন ?

মুখ ফুটে বলতে পারেনি সে : কেন চৈত্রা ?

রুচি ও শালীনতায় বেঁধেছিলো।

চৈত্রার প্রতি মোহরের কোনো নালিশ নেই, রাগ নেই। ছোট থেকে জেনে এসেছে, দূর্বলের হাত ধরবে সেও তাই করেছিলো কিন্তু কিন্নরের ব্যবহার ও অপমান সব উল্টোপাল্টা করে দিলো।

কিন্নরের কথা হল, মোহর হঠাৎ শাস্ত্রীয় নাচ ছেড়ে চটুল নাচের শো করছিলো বলে উনি খুব দু:খ পেয়েছিলেন। ওর মতন একজন প্রতিভাবান নাচিয়ে যদি সস্তার নাচ নাচেন তাহলে নৃত্যশাস্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন কারা ? মেনে নিতে পারেন নি উনি মোহরের কোমড় দোলানো : ছামিয়া ছামিয়া কাঁহা তেরা ওয়াফা – ফা –ফা –ফা ---

তাই অপমান করে বোঝাতে চেয়েছেন কী ভালো আর কী মন্দ। সেটা কিন্নরের পার্সপেক্টিভ।

কেটে যায় বহুক্ষণ। সব শুনেও মোহর কিছু বলেনা। চুপ করে থাকে। শব্দহীন এক বাতাস চারদিকে। আর অজানা উত্তাপ। মৃতদেহ সৎকার হয়ে গেলে বেরিয়ে আসে ওরা।

ছেলে তার বন্ধুর দলকে নিয়ে কোথাও গেলো। বললো : মম বাড়ি চলে যাও তোমার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে। আই উইল হ্যাঙ আউট উইদ মাই ফ্রেন্ডস্ ফর আ লিটিল হোয়াইল।

- কাম অন ডিঙ্কি, হি ইজ জাস্ট আ ফ্রেন্ড !

মিটি মিটি হাসে হবু ডঃ ডিঙ্কি যার নামে ডিঙ্কিস ডান্স ক্লাসেস্ চালায় মোহর।

এই হল জেনেরেশান এক্স, বাবার চিতার আগুন নিভতে না নিভতেই ফূর্তি করতে চললো।

- ওহ্ মম দ্যাট ডাজেন্ট মিন আই ডোন্ট লাভ পা (বাবা)।

সদ্য বিধবার পাশে বসে কোরিওগ্রাফার কিন্নর রায়। হাত স্টিয়ারিং–এ।

মোহর হঠাৎ বলে ওঠে : আমার খুব পয়সার দরকার ছিলো তাই নেচে বেড়াতাম বিয়ে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন ও শ্রাদ্ধে –স্পেশাল দু:খের নাচ। অনেক টাকা দেয় তারা,ইকবালের বই বিক্রী হতনা তুমি তো জানো (এই তুমি ডাকেই স্বচ্ছন্দ সে এখন)!

যেন ভীষণ অবাক কিন্নর -কে বলেছে ? তারপর নিচু স্বরে : তোমার স্বামী তো পুড়েছেন, তুমি কি জানো বটতলার নামী লেখক যোনিবর্দ্ধন আসলে তোমার পতিদেব ? নতুন ধরণের লেখা সৃষ্টি করা সৌমিত্র ইকবাল ? ওঁর বই তো বটতলা বাজারে ফাটাফাটি বিক্রি হত ! তোমাকে কোনদিন বলেন নি ? জানতে না তাঁর এই গুপ্ত সৃষ্টিভান্ডারের কথা ? বটতলার যৌনউদ্দীপক লেখা লেখার জন্যেও প্রতিভা চাই। অত্যন্ত সহজে ও সাবলীলভাবে যৌনতা নিয়ে লেখা কঠিন কাজ । তারপরে সেখানে বেছে বেছে শব্দ বসাতে হয় যাতে লোকের সেক্স ইউফোরিয়া তৈরি হয়, গ্রাফিক্যাল রিপ্রেসেন্টেশান থাকলে তো দারুণ হয় ! এসব কী মধ্যমেধার লেখকের কাজ ? তোমাদের সংস্কার হয়ত বাধা দেবে মানতে কিন্তু এসব লেখার জন্যেও স্কিল চাই । আমি আরো অবাক হয়েছিলাম তোমায় সাধারণ নাচ নাচতে দেখে । ভেবেছিলাম তুমিও ঐ রাস্তাই নিচ্ছো বা নিতে ইচ্ছুক । সবাই যদি তাঁদের প্রতিভা এইভাবে মাটির প্রদীপের সলতে জ্বালাতে বিলাতে শুরু করেন তাহলে সোনার প্রদীপ জ্বলবে কোন তেলে ? ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি এ প্রতিভার অপচয়, ওগুলো তো কন্সট্রাকটিভ কিছু নয় !! লেখক সৌমিত্র ইকবাল কিংবা অন্যদের ব্যাপারে তোমাদের আম পাঠকের কোনদিন সন্দেহ হয়নি ? মোহর, মানুষ কি সত্যি এত সরল, আজকাল????

মোহর এই মূহুর্তে আর কিছু ভাবছে না ; কোথায় গেলো সেসব টাকা, বইয়ের সত্ত্ব, এসব চটুল পর্ণোগ্রাফির কী কপিরাইট হয় ? হাজার কথা এখন ভাবতে চায়ও না । নিজের স্বামীকে কোনদিন চিনতে পারেনি, জানতো উনি কোনদিন যৌনতা নিয়ে লেখেন নি, ওগুলো ঘেন্না করেন - রুচিহীন ভাবেন আর কিন্নরকেও চিনতে পারেনি । ভেবেছে সে তার শত্রু, বিরোধী পক্ষ । তার কলা ও শিল্পের ব্যর্থ পরিচালক । কিন্তু আজ বুঝতে পারছে জীবনের শেষদিন পর্যন্তও মানুষ কিছুই জানতে পারেনা । জানা অত সহজ নয় । যতক্ষণ না প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরছে কারো ক্ষমতা নেই রহস্য ভেদ করে । জীবন বড় রহস্যময় । হিসেব নিকেষ মেলেনা । হবেই তো !

এই তো এখন হিসেব মতন তার থাকার কথা ঘরে, একা, দু:খময় আবহাওয়ায়, পরিজন বেষ্টিত হয়ে অথচ সে রয়েছে কিন্নরের সঙ্গে,

গাড়িতে, বয়ে আসছে সতেজ বাতাস জানালা দিয়ে । গাড়ি উড়ে চলেছে আবেগ ভেজা পথ ধরে, নিরুদ্দেশে । সদ্য স্বামীহারা নয় মনে হচ্ছে হঠাৎ করে পেয়ে গিয়েছে কাছের মানুষকে ।

আর বেশ ভালই তো লাগছে ----বুকের ভেতরে অষ্টাদশের দুরুদুরু --!

মাওবাদী

লাল কেল্লা বলে পরিচিত গড়িয়ার দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজে পড়াশোনা করতো ঋভু । পড়া শেষ করে সে যোগ দিলো চাকরিতে । চাকরি চা বাগানের কাছে । কাজ করে জনসংখ্যা রোধ ও এই বিষয়ে সমাজিক সচেতনতা বর্ধন সংক্রান্ত একটি এন জি ওতে অফিসার রূপে । ওর কাজ হল মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসী ও পাহড়ি মানুষের মাঝে গিয়ে জনসংখ্যা কম করার ব্যাপার ভাষণ দেওয়া ও বিভিন্ন যৌন রোগ সম্পর্কে অবহিত করা, সন্তান সন্ততি কম হলে কি কি সুবিধে পাওয়া যেতে পারে সেই সম্বন্ধে জ্ঞানদান ইত্যাদি । ঋভু চিরকালই ডানপিটে । ধরা বাঁধা একটি ভেতো জীবন তার না পসন্দ । রোজ চাকরিতে যাওয়া,ফেরা,আড্ডা, ক্লাব,তাস এই জীবনে তার হাঁফ ধরে যেতো । সে সবসময় বৈচিত্র্য খুঁজতো । আর পাহাড় তার খুব ভালোলাগে । কলকাতার ছেলে হলেও বেশির ভাগ সময়ই চলে যেতো হিমালয়ে । উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতন গ্রীষ্ম কালে তল্পি তল্পা বেঁধে নিয়ে পদব্রজে হিমালয় ভ্রমণ । সুতরাং কর্ম জীবনে সে যে হিমালয়কেই প্রাধান্য দেবে এতে আশ্চর্যের কী আছে ?

উত্তর বঙ্গে কাজ করলেও ছুটি ছাটায় চলে যেতো পাহাড়ে । কোনো লোকাল লোকের বাড়িতে থেকে কটাদিন কাটিয়ে কিছু জ্ঞান দিয়ে ফিরে আসতো ডেরায় ।এমনই একদিন সে পৌছালো একটি অজগ্রামে । ঠিকানা বাংলা হলেও এখানে পাহাড়ি মানুষের বাসই বেশি । ছোট ছোট ঘর, কিছুটা দালান, দু একটা টিউবওয়েল, একটি সরকারি ডিস্পেন্সারি এই নিয়েই ক্ষুদ্র জনপদ । ঋভু বুঝতে পারলো এই এলাকার মানুষগুলো বেশ সাদাসিধে । একটু খাবার, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পেলেই ওদের দিব্যি কেটে যায় । নেই কোনো উচ্চাশা, নেই অর্থের পেছনে ছোটা -- পাহাড়, ঝর্ণা আর অঢেল আনন্দ এই ওদের জীবন । শুধু শীতকালটা কষ্টে কাটে । বিজলী বাতি নেই তেমন ওদের তাই আলো জ্বলে না, চলে না হিটার । কাঠ কুটো যোগাড় করে নিয়ে এসে আগুন পোহায় । ঠান্ডাও মারাত্মক । একটি বাজে নেশা তাই অঞ্চলের মানুষকে গ্রাস করেছে, হ্যাঁ মদের নেশা ।

মদ মদ আরো মদ খেয়ে ওরা ভুলে থাকে না পাওয়ার কষ্ট কিংবা হিমেল পরশ।

ঋভুর জায়গাটা খুব ভালো লেগে গেলো। ঘন ঘন আসতে আরম্ভ করলো।

কিছুদিন ধরেই দেখছিলো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক খুব যাতায়াত করছেন। থাকছেন এক মাতব্বরের বাড়িতে। সে সুদের কারবারি। চড়া সুদে গরীব গুর্বোদের টাকা ধার দেয়। ওদের অবস্থার ফায়দা ওঠায়। তারই বাড়িতে উঠেছেন লছমন বাবা। লছমন বাবা পেশায় ছিলেন পরিবেশ বিজ্ঞানী। ঋভু জানতে পারলো ওঁর আসল নাম লক্ষ্মণ বক্সী। প্রবাসী বাঙালী।

মূলত ফিজিক্সের মানুষ পরে পরিবেশ নিয়ে কাজ করেছেন অনেক।

উনি এই এলাকায় সোলার এনার্জির ব্যবস্থা করবেন যাতে মানুষের উপকার হয়।

সেই মত কাজও শুরু হল। একটা বড় জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে আরম্ভ হল যন্ত্রপাতি বসানো। তারপরে সোলার হিটার ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ হল। মানুষ ধন্য ধন্য করলো।

ধীরে ধীরে এই উপনগরী আকার নিলো এক প্রধান পাহাড়ি অঞ্চলে।

লছমন বাবাকে ঋভু ড: বক্সী বলেই অভিহিত করতো। উনিও মনে হয় ঋভুকে খুব স্নেহ করতেন। বলতেন : সচরাচর এমন বাঙালী চোখে পড়েনা যার এত হিম্মত আছে, চিরাচরিত পথ ছেড়ে, সুখের জীবন ছেড়ে যে চলে আসতে পারে অনিশ্চিতের বুকে। ব্র্যাভো ঋভু, ব্র্যাভো।

ভদ্রলোকও খুব অদ্ভুত বলে ঋভুর মনে হয়। নাহলে উনিই বা নিশ্চিতের চাকরি ছেড়ে এইসব বনের মোষ তাড়াবেন কেন ?

ইদানিং ঋভু মোটামুটি মাসের অনেকটা সময় এখানে কাটায়। লছমন বাবা আবার বাংলাদেশের নোবেল লরিয়েট মহম্মদ ইউনুস সাহেবের মতন মাইক্রো ফাইনান্স নিয়ে এই সমস্ত মানুষকে জ্ঞান দান করেন যা সুদের কারবারি জিগিরার শিরপীড়ার কারণ। যদি ওরা সচেতন হয়ে ওঠে জিগিরার ফান্ডা খতম হয়ে যাবে। প্রথমে জিগিরা অতটা বোঝেনি। শত

হলেও আনপড় তো ! ভেবেছিলো লছমন বাবা কিছু উপকার করে কেটে পড়বেন আরো অনেক বাবাজিদের মতন। নাম কামানোর জন্য এখানে আসা তারপরে বায়োডেটাতে লেখা আমি বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিযুক্ত ছিলাম। লোকের চোখে সম্মান বাড়ে এতে। কিন্তু লছমন অন্য ধরণের মানুষ। একবার আসার পরে আর নড়ার নাম নেই উপরন্তু আরো বিভিন্ন ভাবে উনি শুরু করেছেন সচেতনতা বাড়াতে। জিগিরা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে।

সম্প্রতি ঋভুর একটি মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। নাম তার ঝুমুর।

ঝুমুর আগে এখানে থাকতো না। এসেছে দার্জিলিং এর ওদিক থেকে। যদিও নাক চ্যাপ্টা, চোখ ক্ষুদে ও গায়ের গোলাপী রঙ দেখে এদের থেকে আলাদা করার উপায় নেই কিন্তু আদতে সে এখানকার মানুষ নয়। বেশ পরিপাটি একটি বাড়িতে থাকে ও দূরের কোনো স্কুলে পড়ায়। যায় সাইকেলে চেপে। ঋভুর মাটির গন্ধ ভালোলাগে। সে মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেলো।

মেয়েটি কথা বলে হিন্দিতে। চৈনিক ভাষাও নাকি জানে কিছু। কোনো পড়শির কাছে শিখেছিলো কোনদিন। স্কুলে পড়ায় ইতিহাস। দিনশেষে ঋভুর সঙ্গে মেতে ওঠে গল্পগাথায়। মাঝে মাঝে রান্না করে খাওয়ায়। রাঁধে ভালই। সুজির কেক বানাতে পারে দই দিয়ে। কোয়াশ আলুভাজা খেতে তো দূর্দান্ত লাগে। ঋভু দাদা বৌদির কাছে থাকতো। বাবা মা ছিলো না। চাকরি নিয়ে আসবার পরে যোগাযোগ কমে গেছে। মাঝে মাঝে যায়। বৌদি কোনদিনই সুনজরে দেখেনি। কিছুটা যেন আপদ বিদায় গোছের ব্যাপার। তাই মতামত নেবার প্রশ্ন নেই। ঝুমুরেরও সেরকম কেউ নেই বলে জানা গেলো। তাই দুটি পাখি স্থির করে একটি স্বপ্নের নীড় বাঁধবে। যেখানে থাকবে শান্তি, আনন্দ সমস্ত দু:খ কষ্ট কে ছাপিয়ে।

লছমন বাবা ওরফে ডঃ বক্সীও খুব খুশি। বললেনঃ এতদিন ধরে অপেক্ষা করছো কেন? এইরকম সুন্দরী মেয়ে পেলে কেউ বিয়ে না করে থাকে। উপরন্তু আমাদের ঝুমুরের আছে একটি নির্মল মন। কাজেই দেরী করো না ভায়া, শুভস্য শীঘ্রম!

বুকে আরো বল এলো ঋভুর।

প্রেম করতে আজকাল দেরি হয়ে যায় । কারণ কাজের চাপ বেড়েছে । সহকর্মীরা ব্যঙ্গ করে :

কী এবার নিজের জ্ঞান নিজের ওপরে প্রয়োগ করবে তো? নাকি কুরুবংশ বানাবে ?

- হা হা হা, হেসে এড়িয়ে যায় ঋভু ।

কিছুদিন ঋভু আসতে পারেনি । অনেক কাজ ছিলো । যেতে হয়েছিলো আলিপুরদুয়ারের কোণায় কোণায়, সেমিনার করতে । এসেছিলেন অনেক বড় বড় ডাক্তার, হেলথ প্রফেশন্যালেরা বিদেশ থেকে । ভারতের জনসংখ্যার রাশ টেনে না ধরতে পারলে সমূহ বিপদ । সেই কারণে ঋভুরও ছোটাছুটি হয়েছে অনেক । ঝুমুরেরও মান হয়েছে । দেখা হয়না যে !

সন্ধ্যাবেলা কয়েকটি সাদা কুকুর নিয়ে সে ঘুরতে বেরোয় । তাদের জুটিয়েছে এক বন্ধুর কাছ থেকে । বড় বিচ্ছু তারা । পাহাড়ি উঁচু নিচু পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখে কিছু পুলিশের লোক ঘোরাঘুরি করছে । পুলিশের কুকুরের সঙ্গে তার বিচ্ছু সারমেয় দলের প্রায় লড়াই বেঁধে যায় আর কি । পুলিশের কুকুর গুলো সভ্য ভদ্র কিন্তু ওর গুলো ! ভারি বিচ্ছু । এইটুকু চেহারা কিন্তু বাঘা বাঘা সাইজের কুকুরের সঙ্গে লড়াই করা চাই, এত দাপট !

একপাশে জোর করে টেনে এনে সে বলে ওঠে : ওরে তোরা কুকুর না আগুনের গোলা?

মনে প্রশ্ন জাগে – পুলিশ কেন এই ক্ষুদ্র জনপদে ?

জানা গেলো এক দুর্ধর্ষ মাওবাদী এইখানে গা ঢাকা দিয়ে আছেন । তাই পুলিসের সন্দেহ পড়েছে এই গ্রামের ওপরে । কলকাতায় এক বিস্ফোরণে অনেক লোক মারা গেছে । দুই ধরণের বিস্ফোরক আলাদা করে নিয়ে যা আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ যেমন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ফুয়েল ওয়েল ওরা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে । আজকাল উগ্রপন্থীরা এই স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছে । মাওবাদী চাঁই যাকে পুলিশ খুঁজছে উনি খুবই ওয়েল এডুকেটেড ও আপাত দৃষ্টিতে সভ্য ভব্য বলে জানা গেলো।

ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলো ঝুমুর। কুকুরদের জায়গায় রেখে সে চলে গেলো গ্রামের দোকানপাট যেদিককে সেইদিকটায় । দেখলো লোকের সমাগম। সবাই ফিসফাস করছে।

= = =

কিছুদিন পরে সুদের কারবারি জিগিরার প্রচেষ্টায় একটি গুপ্ত সভার আয়োজন করা হল। সভা চলবে বৌদ্ধ্য গুম্ফার বেসমেন্টে। এই গুম্ফাটি বেশ কিছুকাল ধরেই পরিত্যক্ত।

সময়মত হাজির হল ঋভুসহ অন্যান্যরা। সবার আঙুল একজনের দিকেই। ডঃ বক্সী। ঋভুর হঠাৎ খুব হাসি পেলো। চিরটাকাল জেনে এসেছে ব্যোমকেশ বক্সী বিখ্যাত গোয়েন্দা। কিন্তু সেই বক্সীই যে ক্রাইম করতে পারেন তা কল্পনারও বাইরে। তাও যদি কেউ এই উপাখ্যান বানিয়ে লিখতো --তাও নয়,এ জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা!

ডঃ বক্সীর সুন্দর চেহারা আড়ালে একটি কুৎসিত মুখ কল্পনা করে অনেকেই মূর্চ্ছা গেলো প্রায় । গ্রামবাসীরা বললোঃ এই জন্যে আমরা তোমাদের পচ্ছন্দ করিনা শহুরে বাবুরা। তোমরা বেশির ভাগই পাখন্ডী, খারাব আদমি হও। তোমাদের মন বলে কিছু নেই।

এই ঘটনায় সব থেকে বেশি লাভবান হয়েছে সুদের ব্যবসায়ী জিগিরা। অনেকদিন ধরেই সে ছুতো খুঁজছিলো । ডঃ বক্সীর বিরুদ্ধে এইরকম মুখোরোচক অভিযোগ যে আসবে স্বপ্নেও ভাবেনি। খুবই খুশি সে। বেশ রসিয়ে বলতে লাগলো নানা খবর।

ডঃ বক্সী নাকি একদিন ওকে একা পেয়ে বলেছিলেন : আমার মধ্যেও আছে জিগিরা নয় ডাকু জাগিরা, সুভাষ ঘাইয়ের ক্রোধী সিনেমার সেই দূর্ধর্ষ ডাকাত --- আমি আমার শিক্ষা ও রুচি দিয়ে সেই ডাকাতকে বোতলবন্দী করে রাখি। বলেই হা হা করে হেসে উঠেছিলেন ডঃ বক্সী।

আরো নানান কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলো জিগিরা। বললো -- আরে মেরি বাপ ডঃ বক্সী নাকি এও বলেছে --- ও জিগিরা তুই আর আমি মিলে ডাকু জাগিরার মতন দল বানাই। তারপর দেশ সেবার নামে লুটপাট করবো। মেয়েমানুষের ইজ্জত লুটবো।

আমি এক হাত জীভ কেটে বলি : নাহ্ সাহেব আমি গরীব আদমি, লোকের অসময়ে টাকা দিয়ে ভালো করি, আমি ডাকু বনতে পারবো না, হ্যাঁ ! আর মেয়ে মানুষ ! ওরা সবাই আমার মা বহিন আছে। শরম নেহি আতা এইসব বাত বলতে !

গরীব গ্রামবাসীর কাছে ভালই মাইলেজ নিচ্ছিলো জিগিরা যার নামটা অদ্ভুতভাবে ডাকু জাগিরার সঙ্গে মিলে গেছে কেবল দূরে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছিলো ঝুমুর যার হাত কয়েকবার ধরার চেষ্টা করেছে জিগিরা অন্ধকার রাস্তায় কিন্তু কোরিয়ান মার্শাল আর্ট তাইকোয়ান্ডুর কল্যাণে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে ঝুমুর যে চাইনিজ ভাষার সঙ্গে এইসব জিনিসেও পারদর্শী।

কত প্রতিভা লুকিয়ে আছে আমাদেরই আশেপাশে, সাধারণ মানুষের ভেতরে কে জানে !

সভার পরে সবাই মোটামুটি জেনে গেলো যে লুক্কায়িত মাওবাদী আদতে ডঃ বক্সী। তাই তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব ঘটেছিলো ও লোক দেখনো উপকার যাতে মানুষ সন্দেহ না করে ও এই ফাঁকে কিছু তরতাজা যুবক ও যুবতীকে সামিল করে নিতে পারেন নিজের উগ্রপন্থা ক্লাবে।

ঈশ্বর বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কথায় আছে রাখে হরি মারে কে! ঠিক তেমনটাই হয়েছে।

শুধু ধরার অপেক্ষা। প্রমাণ জড়ো করার অপেক্ষা। পুলিশ তো ওৎ পেতেই আছে।

ঋভুও কোমড় বেঁধে লেগে পড়েছে প্রমাণ যোগাড় করতে। এরকম মুখোশধারীর মুখোশ খুলে দেওয়াটা খুব জরুরি। প্রমাণ প্রমাণ প্রমাণ আইন প্রমাণ চায় এটাই এখন ঋভুর মন্ত্র। দিন রাত জেগে, খেটে সে প্রমাণের সন্ধান করছে।

ডঃ বক্সীও কয়েকদিন অসুস্থতার ভান করে বাড়িতে শুয়ে আছেন। বাইরে বড় একটা আসছেন না।

এমত অবস্থায় একদিন বিকেলে ঋভু দেখা করতে গিয়েছিলো প্রেমিকা ঝুমুরের সঙ্গে।

দেখলো কাছের বড় শহর কালিম্পং থেকে এসেছে সান্ধ্য পত্রিকা। ইংলিশ পত্রিকা। মাউন্টেন জার্নাল নাম। একটি কিনে ওপরের পাতায় চোখ যেতেই চমকে উঠলো।

সেই দুর্ধর্ষ উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে মালদহের এক গ্রাম থেকে। নাম হরিশচন্দ্রপুর। মালদহের বিখ্যাত আমবাগানে লুকিয়ে ছিলো আমের ট্রাকের আড়ালে। মানুষ সন্দেহ করেনি কারণ আপত দৃষ্টিতে বড় ভালো মানুষ মনে হয় তাকে। সে চেয়েছিলো পুরুলিয়া পর্যন্ত লিফট।

সন্দেহ হয় একটি পুলিশ চৌকিতে একজন পুলিশের। লরির ওপরে আমের বস্তার পেছনে তাকে দেখে। ধরে নিয়ে জেরা করাতে বার হয় সেই উগ্রপন্থী। অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের অনেকে হাজির মালদহে। অতএব ডঃ বক্সী বেকসুর খালাস, অপরাধী লেবেল লাগা পরিচ্ছদ থেকে।

চমকিত ঋভু। লজ্জিতও। ভীষণ লজ্জিত। একজন জ্ঞানী গুণী মানুষের সম্পর্কে না জেনে এরকম ধারণা তৈরি করা ও কাদা ছেটানো -- ছি ছি ! কী না করেছেন উনি ! সেইসব একবারও মনে হল না। লেগে গেলো প্রমাণ খুঁজতে ? একটা সুদের কারবারী কী বললো তাই বিশ্বাস করে নিলো ? নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হচ্ছে তার। অসুস্থ মানুষটাকে একবার দেখতেও গেলোনা। আর কি পারবে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ? উত্তেজনা মানুষকে বড় ধৈর্য্যহীন করে দেয়। রাগ বড় খারাপ জিনিস। নাহ্ মাথাটা দপদপ করছে।

ঝুমুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ এই নিয়ে আলাপন সেরে ফিরে এলো নিজ গৃহে।

রাতটা অস্বস্তিতে কাটলো। বড় লম্বা মনে হল রাত ---আকাশে তারাদের ঝিকিমিকি। তবুও যেন গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে। ভ্যাপসা, দমবন্ধ পরিবেশ।

বেরিয়ে এলো সে বাইরে। হালকা চাদর গায়ে দিয়ে হেঁটে বেরালো পথে পথে। ফার্ণ, অর্কিডের সমারোহ পেরিয়ে একটি চায়ের দোকান, এই মাঝরাতেও খোলা একটা পাল্লা। গরম টোস্ট এর গন্ধ আসছে। ঋভু ভাবলো এক কাপ

চা খাবে। ঋভুর বাবা যৌবনে নকশাল ছিলেন। অনেকদিন আন্ডার গ্রাউন্ডেও ছিলেন, জেলে ছিলেন। ঋভুকেও কিছুদিন মার্কসবাদের পোকা কামড়েছিলো।

এখনও মাথায় গরীবের ভালো করার ভূত ভর করে আছে নাহলে এইসব কাজ করে জীবন কাটায় কেউ ? পড়াশোনায় তো মন্দ ছিলোনা। দিব্যি ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। তা না সমাজ সেবা করবে, দেশোদ্ধার করবে !

উল্টো পাল্টা চিন্তা করতে করতে চায়ের দোকানে পৌঁছে গেলো। চায়ের অর্ডার দিলো।

দোকানি পরিচিত। নাম হেমরাজ সিন্ধৌলি। জাতে বোধহয় নেপালি।

কথায় কথায় জানা গেলো কাল এলাকায় পুলিশ রেড হয়েছে সন্ধ্যের পরে। রাত ১০টার পরে ধরা পড়েছে এক মহিলা আসামী এই এলাকা থেকে। উগ্রপন্থী নন ডঃ বক্সী। উনি ভালোমানুষ। কাজেই ধরা না পড়ায় এই জনপদের মুখ রক্ষা হয়েছিলো কিন্তু সেগুড়ে বালি। কাল রাত্রে আরেকজন সন্দেহ ভাজন ধরা পড়েছেন এবং প্রমাণ পেয়ে পুলিশ তাকে রাতারাতি শিলিগুড়ি হেড কোয়ার্টাসে স্থানান্তরিত করেছে।

সে চীন দেশের স্পাই, সোজা বাংলা চর। অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে ঢুকেছে। গোপন তথ্য পাচার করতো বিভিন্ন যন্ত্র দিয়ে। ইন্টার্নেট কানেকশানও ছিলো ঘরের গুপ্ত স্থানে।

একটি যুবতী। সুন্দরী, নিষ্পাপ, এই মূহুর্তে বিচারের অপেক্ষায় পুলিশ কাস্টডিতে। মেয়েটি একটি জায়গায় শিক্ষকতা করতো।মার্শাল আর্টে পারদর্শিনী।

নাম ফেন ফ্যাং যার অর্থ ফুলের সুবাস।

ঋভুর দুই চোখ কে যেন একটা কালো চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো।

ইরোটিকা

মুকুন্দপুরের মহাবলি পাহাড়ের ওপরে একটি জেল খানা। এখানে খুনের আসামীরা থাকে। জয় ঘোষ ও দীপন দত্ত দুজন এরকমই আসামী। জয় ছিলো ফায়ার ফাইটার।আর দীপন কানপুর আই আই টির প্রফেসর। কিছুদিন বাদে দুজনেরই ফাঁসি হবে। শহরে ফাঁসুড়ের বড় অভাব তাই ওরা এখনও জীবিত আছে। নাহলে কবেই -----!

জয়ের অপরাধ হল ও একটি জায়গায় আগুন নেভাতে গিয়ে দেখে ওর পারিবারিক পুরনো শত্রু সেখানে অধিষ্ঠান করছেন। এই লোকটি ও তার পরিবারের জন্য তাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে একসময় তাই মাথায় পুরনো আগুন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে।

সে যেন ইচ্ছে করেই আগুন নেভানোতে বাধ সাধে তাতে গোটা পরিবার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ মিশনে পড়া জয়ের মনে ছিলো না সেইসময় যে ক্ষমাই পরম ধর্ম। তবে সে নিজেই ধরা দিয়েছে পুলিশের হাতে।

কয়েকদিন ধরে শুনছে যে এই অঞ্চলে গুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হবে, জেল হয়ে যাবে পোড়া শ্মাশান ! মনে মনে ভাবে, ভালই তো, আমরাও তো আর থাকবো না এই ভুবনে।

আর ফায়ার ফাইটারকে কেউ আগুনের ভয় দেখায় নাকি ? আগুন নিয়েই তো তার খেলা ! ছোটবেলা টালিগঞ্জের দিকে ফায়ার স্টেশান দেখে দেখে স্থির করেছিলো যে জীবনটা নিয়ে যদি কিছু করে তাহলে ফায়ার ফাইটারই হবে। হলও তাই। কিন্তু ছোট্ট একটি ভুল বা পুষে রাখা রাগের কারণে জীবন আজ তার পথ হারিয়েছে জেলের চোরাগলিতে ! প্রফেসর বলছিলেন যে আগ্নেয়গিরির আগুন বার হলেই সুযোগ বুঝে পালাবেন। চলে যাবেন জীবনের মূল স্রোতে ! উনি মরতে চান না ! জয় কিন্তু জীবন যুদ্ধে জয়ী নাহলেও, হেরে গেলেও মরতে চায়। আবার নতুন করে সব শুরু করতে চায়। আত্মা তো মরেনা কাজেই !

প্রফেসর কেন খুন করেছেন জানা হয়নি । কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে কোনো উত্তর পায়নি । আজও একবার দেখবে পেট থেকে কথা বার করা যায় কিনা !

এমনিতে উনি খুবই ভদ্রলোক । মুখে হাসি লেগেই আছে ও কথা বলেন খুব আস্তে, সফট স্পোকেন, বিনয়ী ।

মার্জিত । জয় শুনেছে উনি অকৃতদার । বৃদ্ধা বাবা- মা ও এক বোন আছে । ব্যস্ । কানপুর আই আই টিতে পড়াতেন অঙ্ক । খুবই মেধাবী ও বিদ্বান মানুষ । মিলেনিয়াম প্রবলেম সলভ্ করার চেষ্টাও করতেন । দুনিয়াটা যদি অঙ্কের মেধামালাই দিয়ে ভর্তি হত ওঁর বড়ই তৃপ্তি হত । এখানেও অনেক বই পড়েন । বলেন : অঙ্কের বাইরে আমার একটাই নেশা, তাহল ছবি । আমি আঁকতে তেমন পারিনা তবে ছবি দেখতে খুব ভালোবাসি । জয়া রাস্তোগি আমার প্রিয় শিল্পী কারণ ওঁর ছবিতে রাজস্থানের ধ্রুপদী গন্ধ আছে । এছাড়াও ফিদা হুসেনের ছবি ও যোগেন চৌধুরীর ছবি ওঁর প্রিয় । বলেন : মানুষের শিল্পেও আছে অঙ্ক ।

Logician KurtGödel, artist M.C.Escher & composer Johann-Sebastian Bach এঁদের সেই বিখ্যাত বইয়ের কথা জয় শুনেছে প্রফেসরের মুখেই । যেখানে লজিক ও শিল্পর মূল সন্ধান করেন পন্ডিতেরা । শুনেছে অনেক ভারী ভারী তত্ত্ব ও কথা । যা জানতো না আগে । কত সহজে প্রফেসর বুঝিয়েছেন দূর্বোধ্য তত্ত্ব নিঝুম সন্ধ্যায় । ক্লান্ত পাখির ঘরে ফেরা দেখতে দেখতে জেলের বাগানে আলোচনা করেছে কত অজানা জিনিস নিয়ে ! সেই মানুষ খুনী ? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় । তার নাহয় দু:খ ছিলো, কারণ ছিলো কিন্তু প্রফেসরের কী কারণ হতে পারে ? সাজানো সংসার, বোন মা বাবা ছাত্র সম্মান আদর্শ --- তাহলে ?এই ব্যাপারে লেকচার বিশারদ প্রফেসর নিশ্চুপ ! একটিও কথা খরচ করেন না । তবে জয়ও নাছোড়বান্দা - বার সে করবেই, এই রহস্যের সমাধান করবেই স্থির করেছে ।

দুর্গাপুজো আসছে । জেলে কদিন হৈ হুল্লোড় হবে । আসলে আইন নির্মম নয় । আইন সাজা দেয় বটে তবে মানবিকতার দিকটিও দেখে । এই যেমন ফাঁসির আসামী যাতে অত্যন্ত কম কষ্টে

জীবন তরী পার করে সেদিকে খেয়াল রাখে অথবা চিরঘুম ইঞ্জেকশান দিয়ে আসামিকে বেশি কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করে। আইন তো পাশবিক নয় তাই দুর্গাপুজোয় ধুমধাম হয়। ঠাকুর বানায় জেলের কয়েদীরাই। যারা মাটির কাজ জানে। কাঁচা প্রতিমা মনে হলেও প্রাণের পরশে তা অভিনব। সাদা চালের ভাত ও টাটকা মাংস সেদিনের খাবারে থাকে। আসলে এই কটিদিনই তো মানুষের গায়ের গন্ধ পায় ওরা ! আসেন পুরোহিত, ফুলওয়ালা, ঢাকি !

কয়েদীরা অপেক্ষা করে থাকে তাই – ওরা মানুষ খোঁজে !

আর কদিন বাদেই তো পুজো !

প্রফেসর যেন আজকাল একটু খুশি খুশি। কেন বোঝা যায়না যদিও। পুজোর গান গাইছিলেন। বললেন বাথরুম সিঙ্গার আমি তবুও গাই। গলা মন্দ নয়, বললো জয়। ভ্রুকুটি এনে উনি বললেন : তাহলে পালিয়ে গায়ক হতে পারবো ? বলেই হেসে ওঠেন। জয় মুখটা আলগা করে হাসে। একটু বেশি হাসে সুযোগ পেয়ে। আজকে স্পেশাল চা হয়েছে। জয় একভাঁড় বেশি এনেছে নিজের ঘরে। পুজোর মরসুম বলে জেলার এইটুকু ছাড় দিয়েছেন তাছাড়া প্রফেসর, জেলারের বেশ প্রিয়পাত্র। জেলার বলেনঃ উনি খুব জ্ঞানী ও পন্ডিত। নম্র ভদ্র। হয়ে গেছে হত্যা কটি, আবেগের বশে করে ফেলেছেন ভুল ! তবে জাজের মনে হয়েছে কোল্ড ব্লাডেড্ মার্ডার তাই ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিয়েছেন !

জেলার যেন প্রফেসরকে একটু সমীহও করেন। ভালোলাগে জয়ের। সে দেখতে পায় জেলের ভেতরটা হয়ত কালো কিন্তু সেখানে ফুটে উঠেছে সবুজ আলো।

বাইরের জগতে কোনো সবুজ নেই। গ্লোবালাইজেশান আসার অনেক আগে থেকেই ধরেছে ঘুণ। তাই বুঝি তার ও প্রফেসরের মতন মানুষ আজ কারাগারে রুদ্ধ। মানবতার বাণী আজ শুধুই পুঁথিবন্দী।

চায়ের পেয়ালায় আলতো চুমুক দিয়ে জয় বললো : প্রফেসর আপনার খুনের কারণ কী ? সোজা প্রশ্ন। কোনো ভড়ং নেই। প্রফেসরের আজ কী

হয়েছে কে জানে, বেশ খুশি উনি। তাই হয়ত মুখ খুললেন প্রথমবার এবং শেষবার।

গল্পটা এরকম : মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে দীপন ও তার একমাত্র সহোদরা দিতি থাকতো বিডিও বাবা ও মায়ের সঙ্গে বীরভূমের একটি গ্রামে। পরে বাবা আসেন কলকাতা, অবসর নিয়ে। দীপন চিরকালই খোলামেলা আর বোন দিতিও স্বাধীনচেতা। মড ড্রেস ও চড়া মেকআপ তার নিত্য সঙ্গী। পরের দিকে ছোট হাঁটু বার করা স্কার্টও পরতো। বাড়িতে এই নিয়ে রাগারাগি কারণ মধ্যবিত্ত পড়শীরা কানাঘুষো করতো। পাড়ার ছেলেরা লোলুপ দৃষ্টি দিতো। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দীপন বোনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। ওকে সায় দিতো – ওর যা প্রাণ চায় করুক না ! ক্রাইম তো করেনি কোনো। তোমাদের মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গীটা বদলাতে হবে!

দাদার সায় পেয়ে বোন আরো লাগামছাড়া। সে বড়লোকের লাইফস্টাইল চায়। মধ্যবিত্তের ঘরে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। সে মুক্ত পাখী।

ডানাখোলা মেয়ে। ফিল্মী দুনিয়া, ফিল্ম স্টার, মডেল, গ্ল্যামার জগৎ তাকে টানে। এক অদৃশ্য শক্তির টানে সেদিকে এগিয়ে যায় সে। বাবা মায়ের প্রচন্ড আপত্তি সত্ত্বেও যোগ দেয় মডেলিং – এ দাদারই প্রশ্রয়ে। ফোর্ড সুপারমডেল ফিনালি তে জিতে নেয় পুরস্কার তারপর আর কোনো পেছন ফেরা নেই। স্বপ্নের লাইফস্টাইল, স্পোর্টস্ কার, মুম্বাইয়ে পশ অ্যাপার্টমেন্টে বিলাস বহুল ফ্ল্যাট যেখানে থাকে দিতি ও তার ম্যান উইদ্ ডগ জেনিফার। বাবা মায়ের কুটির থেকে লক্ষ যোজন দূরে বাংলার মেয়েটি আজ সাঁঝবাতি জ্বালে ডিজাইনার মোম দিয়ে।

তুলসী গাছের বদলে শোভা পায় বহুমূল্য অর্কিড তার ব্যালকনিতে। যেখানে আছে টেরাকোটার শিবমন্দির।

খুব নাম ও যশ হয়েছে দিতির, বাবা মা মনে করছেন মেয়ে তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার নতুন এই জীবন ও অপরিমিত যৌবন তাঁরা চাননি। এর জন্যে তাকে গর্ভে ধরেননি তার মা – এইসব। দীপন বুঝিয়েছে কিন্তু মিডিলক্লাস মেন্টালিটি যায় কোথায় !

শেষে চুপ করে থেকেছে। বোন আজকাল কলকাতা আসে কম। এলেও হোটেলে ওঠে। ওর স্টেটাসের ব্যাপার আছে! একটা মধ্যবিত্ত পরিকাঠামোতে এসে ও থাকতে চায়না। ওর লাইফস্টাইল সম্পূর্ণ আলাদা।

দীপন কানপুরে চাকরি নিয়ে এসেছে। ভালই ছিলো। জ্ঞান ও পান্ডিত্যের জন্য ছাত্র মহলেও সমীহ পেতো। তাছাড়া কমবয়সী মাস্টার তাই ছাত্রছাত্রীরা বন্ধুর মতন মিশতো। একদিন এই বন্ধুত্বই কাল হল। দীপন কাউকে জানাতো না যে সুপার মডেল দিতি যার স্ক্রিন নেম ঝিলম খান্না আসলে ওর বোন।

একদিন সান্ধ্য আসরে ছাত্রদের ডেরায় বন্ধুরূপী মাস্টার নিমন্ত্রিত। এসেছে লোকাল মাফিয়ার কিছু বিচ্ছু ছেলেও আগ্নেয়াস্ত্র বলে। মদ্যপানের আসর শেষ হতেই দীপন যায় টয়লেটে। সেখানেই কেচ্ছা। দেখে দিতি ওরফে ঝিলমের অর্ধনগ্ন পোস্টার নিয়ে হস্তমৈথুন করছে ছেলের দল। মূহুর্তে মাথায় রক্ত চড়ে যায়! ঠিক রাখতে পারেনা নিজেকে। হাতাহাতি শুরু হয়। ছাত্ররা বুঝতেই পারেনা একটি নাঙ্গি-পুঙ্গি বাজারি অউরৎ এর জন্য মাস্টার মশাই এত উদ্বিগ্ন কেন!

কেউ ভাবে ঝিলম আসলে দীপনের ক্রাশ কেউ ভাবে নি:সঙ্গ দীপন আসলে ফ্রাস্টেটেড্।

এরপরের ঘটনা গতনুগতিক। ছাত্রদের বাড়িতে ডেকে খাবারে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে দীপন।

কোল্ড ব্লাডেড্ মার্ডার। তাই ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন জাজ। তবুও দীপন বাঁচতে চায়। কারণ সে জানাতে পারেনি ওর ছাত্রদের যে ঝিলম আসলে ওর বোন, আপন সহোদরা। একমাত্র আদরের মিতু। যাকে সেই সাপোর্ট করে নামিয়েছে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা পছন্দ করেনা বলে এই আধুনিক ইন্টেলেকচুয়াল!

- বাস্তব বড় কঠিন। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দীপন।
- হ্যাঁ, ছোট্ট উত্তর জয়ের।

তারপর শুধায়, দিতি আসেনি এখানে, দেখা করতে?

- নাহ্, দীপনের চোখে বিন্দু বিন্দু মুক্তো। ও এসে কী করবে ?

না এসে ভালই করেছে। আর ও তো আজকাল আমাকে ওর দাদা ভাবেই না, বাবা মাকে বলেছে যে একজন খুনের আসামী ওর ভাই এটা জানতে পারলে ওর ক্যারিয়ারে সমস্যা হবে। নতুন মডেলিং অ্যাসাইনমেন্ট ও ফিল্মের অফার ও আর পাবেনা, লোকে দুরছাই করবে। তাই আপাতত কিছু বছর ও কলকাতাতেও আসবে না বাবা মায়ের কাছে। ফাঁসি হয়ে যাক তারপর দেখা যাবে।

তবে ও বাবা মাকে একটি মার্সিডিজ কিনে দিয়েছে যা ওর বাবা ভয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন যদি বদলোক পেছনে লেগে যায় ! মধ্যবিত্ত মানুষ তাঁরা এইসব হাই সোসাইটির গাড়ি ! মনে মনে ভাবে জয় : আজব বোন কিন্তু !

মুখে বলেনা কিছু শুধু মলিন হাসি দেয় কারণ দীপনের সহোদরা প্রীতির আর কোনো পরীক্ষা সে নিতে চায়না ! মরার আগে দুর্গাঠাকুরের মুখটা দেখেই মরতে চায় ! আর তো মাত্র কটা দিন ! বোধন হল বলে !!

থেলমা

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্টেটের এক ছোট গ্রাম ক্রেসউইক। সেখানে আছে অনেক মেষপালক ও তাঁদের খামারবাড়ি। এমনই একটি খামারবাড়িতে বাস করে থেল্মা।

সে খামারবাড়ির লাগোয়া টি হাউজ চালায়। এই কাফেটিতে পথচারীরা ও দূরের যাত্রীরা নেমে খাওয়াদাওয়া করে। পাওয়া যায় বিভিন্ন স্যান্ডউইচ, টি /কফি, কেক ও মাংসের নানান পদ। রাঁধে থেল্মা। সে এসেছিলো সুদূর পশ্চিমের এক দ্বীপ থেকে। পালিয়ে। সেই দ্বীপে বাস করে আধা সভ্য মানুষ ও জংলীরা। তাই তাদের রীতিরেওয়াজ সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমাদের থেকে। এরকমই এক রীতির কারণে থেল্মা ঘরছাড়া।

থেল্মা কালোমেয়ে। ঘন কালো চুল ও আঁখিপল্লব। তার বাবার পাঁচ বৌ ছিলো। সবার সন্তান থাকলেও একেবারে কনিষ্ঠ বধূটি নিঃসন্তান ছিলেন। বহু উপায়ে সন্তান না হওয়াতে থেল্মার বাবা এক পুরাতন রীতির সাহায্য নেন। এক এক করে নিজ শিশুকে মেরে ফেলতে থাকেন যতদিন না ঐ বৌয়ের বাচ্চা হয়! লজিক হল : ঈশ্বর করুণা করে একটি বাচ্চা দেবেন।

থেল্মার পালা আসার আগেই সে পালিয়ে আসে। একটি দূরদেশী জাহাজে চেপে মালের ওপরে বসে, শুয়ে সে এসে পৌঁছায় অস্ট্রেলিয়া। তারপর নানান শহর ঘুরে অবশেষে ক্রেসউইকে।

এই জায়গাটি ভারি সুন্দর। সবুজ ক্ষেত খামার, ছোট টিলা, সর্ষেক্ষেত, জলপ্রবাহ, সতেজ বনভূমি ও ভেড়ার পাল। এখানে থেল্মার খামারে মেষপালন করা হয় প্রফেশন্যালি। তৈরি হয় উল। প্রফেসর সহদেব রায় এখানে আছেন উল বিশেষজ্ঞ হিসেবে। উনি কলকাতা থেকে পড়াশোনা করে কিছুদিন নেপালে কাটান তারপরে এখানে আসেন। বয়স প্রায় ৮০। একমাত্র সন্তান থাকে ডারউইনে। প্রথমা স্ত্রী অমিতা মারা গেছেন অনেকদিন। পরে থেল্মার সঙ্গে লিভ ইন রিলেশানে যান। বয়স তার

তখন মাত্র ২২ । কয়েক বছর একসাথে আছেন । থেল্‌মা আরো একটু বড় হয়েছে, সহদেব বুড়ো হয়েছেন । আজকাল তাঁর যেন ঈষৎ স্মৃতি শক্তির খরা দেখা দিয়েছে ! একটি কটেজে তারা থাকেন খামারবাড়ির মধ্যে । থেল্‌মা রান্না করে ও সঙ্গীর সেবা করে আর দিনের বেলায় দোকান চালায় । তার জন্য মাইনে পায় । ভালই কাটছিলো দিন । এরকম কাটলে মন্দ হতনা । কিন্তু বাধ সাধলো কপাল ।

সূর্যাস্তের লালিমা মেখে প্রফেসর এসে পৌঁছালেন কটেজের দোরগোড়ায় । জুতো খুলে (এখানে লোকে জুতো পরেই সব কাজ করেন কিন্তু উনি বাঙালী রীতি মেনে চলেন) ঘরে ঢুকলেন ।

নিজের ব্যাগ ও লাঠি জায়গায় রেখে কফির পেয়ালায় কফি ঢেলে বসলেন বারান্দায়, ইজি চেয়ারে । এই চেয়ারের একটি ইতিহাস আছে । এর বয়স প্রায় ১৫০। এই খামারের মালিক মিস্টার জনসনের দাদুর চেয়ার । দাদু নাকি বৌদ্ধ্য ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে নেপাল ভূটান তিব্বত সব ঘুরে এসেছিলেন । এক লামাকে এখানে নিয়েও এসেছিলেন কিন্তু সে কি একটি অসুখে অল্পদিন পরেই মারা যায় । এই চেয়ারে বসে বসে জনসনের দাদু সেই নেপাল, ভূটান, তিব্বত ভ্রমণের সব গল্প ওদের বলতেন বিশেষ করে তিব্বতের কথা । বলতেন শেষজীবনে উনি ঐসব পাহাড়ে গিয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলবেন । ওখানকার মানুষেরা বড় অসহায় ও সরল । তাঁকে ওদের প্রয়োজন । যদিও গিয়ে উঠতে পারেন নি শেষ অবধি ।

তার আগেই মারা যান । আজ ওঁরই চেয়ারে এসে বসেছেন আরেক নেপাল ঘুরে আসা মানুষ এটা দেখে জনসন খুবই উত্তেজিত । তাঁর দাদু নাকি বলতেন : এই চেয়ারে বসলেই জীবন গল্প হয়ে যায় ! যে বসবে সেই গল্পের চরিত্র হয়ে যাবে ।

মজা করেই বলতেন কিন্তু জানতেন কি যে সত্যি তা হয় ?

নাহলে থেল্‌মাই বা প্রফেসরের জীবনে আসবে কেন ?

শুধু একদিন ওকে চুম্বন করে ছিলেন তারপর ভায়াগ্রা নিয়ে সহবাস । তাতেই মেয়েটি ওঁর হয়ে গেলো ! এত কমবয়সী ইয়ং মেয়ে ওঁর মতন বৃদ্ধের বাহুবন্ধনে কেন যে আবদ্ধ হল তাও এক রহস্য বা বলা ভালো

অনুচ্চারিত গল্প ! ভালোবাসেন ওকে খুবই। বিশেষ করে রাতের বেলায় মনে হয় উনি যুবক। ওঁর হারানো যৌবন যেন ফিরে এসেছে এই আশির দোরগোড়ায়। কতভাবেই না তাকে উৎসাহ দেয় থেল্‌মা ! বলে : তুমি পারবে, আমাকে সেক্স টয়েজ কিনতে হবে কেন তুমি থাকতে ?? আমি স্বমেহনই বা করবো কেন ?

বাঙালী প্রফেসর যেন শয্যায় ঠিক রয়েল বেঙ্গল টাইগার !

যৌথজীবন বেশ সুখেই কাটছিলো।

একটি বই পড়ছেন ইদানিং। নাহ্‌ ভেড়ার উলের ওপরে লেখা নয় ! পৃথিবীর নানান দেশের আজব পন্থা ও আদিবাসী রীতি রেওয়াজ নিয়ে লেখা। ব্ল্যাক মাজিকের খেলা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এইসব বইটির বিষয়। থেল্‌মার বাবা যেই পন্থা নিয়েছিলেন তার কথাও লেখা আছে। প্রফেসর মনে মনে ভাবেন : কি বিচিত্র এই জগৎ, নিজ সন্তানকে মেরে আরো সন্তানের জন্ম চাইছেন ! পাশবিকও বটে !

আজ পূর্ণিমা। থেল্‌মা ডিনারে রেঁধেছে হাঁসের রোস্ট সঙ্গে কচি গাজর ও আলু সেদ্ধ। পরে প্যানকেক। খুব খাওয়া হল। তারপর শোবার আগে ডেকে পাঠালেন মিস্টার জনসন। বিরাট হলঘরে সমবেত প্রায় সব কর্মী যাঁরা রাতে এখানেই থাকেন। জানা গেলো বেশ কটি ভেড়া গত কয়েকদিন ধরে নিখোজ। বহু খোঁজার পরেও পাওয়া যায়নি। সাধারণতঃ ওরা বেশি দূরে যায়না। সবুজ গালিচা মোড়া ঘাসেই ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আস্তে আস্তে ভেড়ার সংখ্যা কমছে !

লক্ষ্য রাখতে হবে। হয়ত কেউ চুরি করছে। হয়ত পড়শী কেউ তারপর নিয়ে বেচে দেবে। এখানকার ভেড়াগুলি খুবই হৃষ্টপুষ্ট ও ভালো জাতের। তাদের উলও উৎকৃষ্টমানের কাজেই সাবধান হতে হবে !

সবশুনে টুনে ফিরে এলেন প্রফেসর। থেল্‌মাকেও বললেন। আজকাল অনেক কথাই ভুলে যান স্মৃতিবিভ্রমের কারণে। থেল্‌মাকে এও বললেন : সজাগ থেকো। যদি দোকানে কাজ করার সময় অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করো, জানিও ততক্ষণাৎ !

থেল্‌মা বুদ্ধিমতী মেয়ে, মৃদু হেসে চলে যায়।

এই খামারবাড়িতে উলের নানান দ্রব্যও মেলে। টুরিস্টরা কিনে নিয়ে যান। শিশু আলপাকাও দেখা যায়। বিশেষ দ্রষ্টব্য। অনেকেই তার সাথে ছবি তোলেন। মাঝেমাঝে থেল্‌মাও।

ওম জয় জগদীশও হরে ---গানটা সে শিখেছে সহদেবের কাছেই। ওঁর দৌলতে দেখেছে বেশ কিছু বলিউডের হিন্দী ছবি, ইংলিশ সাবটাইটেল সহ। সহদেবকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

বয়সের ব্যবধান যেন কোনো বাধাই নয়। আসলে এইসব বয়স ফয়স সবই তো মানুষের মনের সংস্কার। যতদিন যায় সংস্কার বদলায়, বদলায় সমাজ সংসার।

আসল তো মনের মিল। সেটা হলেই সব ঠিকঠাক থাকে।

ভেড়াদের ওপরে আক্রমণ বেড়েই চলেছে। দেখা যাচ্ছে কিছু ভেড়া ও শাবকদের পা ভেঙে, কান কামড়ে, গলার নলি কেটে মেরে বা অর্ধমৃত করে রেখেছে কেউ। দেখা যাচ্ছে ফার্মের আনাচে কানাচে। মানুষ ত্রস্ত। ব্যস্ত। পরে ধরা পড়লো কিছু কুকুর। আশেপাশের বাড়ি থেকে নাকি পথচারীর হাত ছাড়িয়ে কেউ জানেনা এখানে ঢুকে এইসব অত্যাচার করে যাচ্ছে। মানুষ দিনের বেলায় পাহারা দিতে পারে রাত্রে তো জেগে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয় তেমন!

কুকুরগুলি ভারি বদমাইশ, নিরীহ ভেড়াগুলোকে মেরে কী আনন্দ পাচ্ছে কে জানে!

একটি ভেড়া তো এমনভাবে কাতরাচ্ছিলো যে প্রফেসরকেই বন্দুক দিয়ে ওকে মেরে ফেলতে হল!

দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। পকেট থেকে মোবাইল বার করে ফোন নম্বর দেখে ফোন করলেন থেল্‌মা কে। বললেন : এই প্রথম লাইসেন্স পাওয়া বন্দুকটি কাজে লাগালাম। তাও এক নিরীহ জীব হত্যা দোষে দুষ্ট আমি!

থেল্‌মা হেসে বলে : তুমি ওকে মুক্তি দিয়েছো। একে হত্যা বলোনা, বলো মুক্তি। পুলিশ শাস্তি দেয় আর খুনি হত্যা করে সেরকম তুমি মুক্তি দিলে ওকে যন্ত্রণার হাত থেকে!

থেল্মা ভারি মিষ্টি মেয়ে ! মনে মনে ভাবেন সহদেব। অমিতা চলে যাবার পরে এরকম এক মিষ্টি মেয়েকে পেয়ে যাবেন ভাবেন নি ! একটু বেশি হাসে অবশ্য। সহদেব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কী দেখে যে সে আকৃষ্ট হল কে জানে ! হয়ত তাঁর পান্ডিত্য ওকে মুগ্ধ করেছে কিংবা পরিণত মস্তিষ্ক।

বুড়ো শিশু তো কম দেখেন নি জীবনে। বয়স বাড়ে মগজের বৃদ্ধি হয়না সেই অনুপাতে। সহদেব ধীর স্থির ও পরিণত।

রবিবার সকালের চা খেয়ে একটু হাঁটতে বার হন। সঙ্গে থেল্মাও যায়। পুরো প্রপার্টি চক্‌কর দেন ওরা। বলেন : যেদিন তোমার সঙ্গে আর পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে পারবো না সেদিন বুঝবো যে সত্যি বুড়ো হয়ে গেছি !

- কেন বিছানায় কি বুঝতে দিই যে তুমি অ্যাবাভ ৭৯ ? তুমিও তো ভালই পারফর্ম করো, হাঁপাও না তো ! শুধু আমি যখন টপে থাকি তখন একটু শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তোমার। তাই তো বলি ভারতীয় যোগা বেশি করে করো !
- দেখছি আমার থেকে তুমিই বেশি ইন্ডিয়ান হয়ে গেছো, বলে মুখটা চওড়া করে হাসেন সহদেব।

থেল্মাও হাসে। ও এমনিই হাসতে পারে। কারণ ছাড়াই। তারপর চোখ ছোট করে ডান হাতটা নেড়ে বলে ওঠে : অ্যান্ড দ্যাট দ্রৌপদী ! সহদেবস্ ওয়াইফ আই মিন দ্যাট ব্লাডি হোর হু নেভার এনজয়েড- সেক্স উদথ সহদেব ! অলওয়েজ লাভড্ মেকিং লাভ উদথ অর্জুন ! ফাকিং ওয়াইফ !

থেল্মার মহাভারতের নেশা ধরিয়েছিলেন সহদেবই। নিজের নামের ইতিহাস বলতে গিয়ে। তবে দ্রুপদরাজদুহিতা সম্পর্কে এহেন কটুক্তি ওঁকে খুব কষ্ট দিলো, মুখটা আপনিই গম্ভীর হয়ে গেলো। পশ্চিমের মানুষ কি দৈহিক সম্ভোগ ছাড়া কোনো সম্পর্কের কথা ভাবতে পারেনা ? প্লেটোনিক লাভ তো ইংলিশ শব্দই, নয়কি ??

মুখে কৃত্রিম হাসি আনেন। থেল্মাকে খুশি করার জন্য।

- অ্যান্ড দ্যাট বিচ হ্যাড ফাইভ সন্স ওয়ান অফ দেম উদথ সাহদেভা !

বুঝলেন দ্রৌপদীর ওপরে থেল্মার অসম্ভব রাগ। সহদেবকে তো তেমন ভালোবাসেননি উনি ! ওঁনারই বা দোষ কী ? চেয়েছিলেন তো অর্জুনকে ! কুন্তিদেবীর খামখেয়ালিপনার জন্যে সব ভেস্তে গেলো। কুন্তীটা যে কি! সূর্য ফূর্যকে ডেকে কেলেঙ্কারি! অথচ নিজের বৌয়ের বেলায় !

থেল্মা জোরে পা চালিয়ে চলে গেলো ক্রিকের দিকে। কিছু অনাদৃতা বুনো ফুল তুলতে। ও বুনো ফুলে ঘর সাজায়। আজব মেয়ে কিন্তু। সে আবছা হতেই সহদেবের অকস্মাৎ

পথে দেখা হল এক কর্মীর সাথে। জানা গেলো যে আবার ভেড়া মারা হচ্ছে তবে এবার মনে হয় কুকুর দায়ী নয় কারণ ভেড়াগুলি মরে পড়ে আছে ব্যাকইয়ার্ডে।

ভেড়াগুলোর মৃতদেহ দেখে এসে মনে মনে বলেন সহদেব --সায়লেন্স অফ দা ল্যাম্বস্!

পকেটে করে নিয়ে আসেন সেই চাকু । কালো কারুকার্য করা বাট ও রূপার ফলা। কিনেছিলেন মোলডেনের এক মিউজিয়াম থেকে, এটি এক ব্রিটিশ রাজের ডিপ্রেসড্ স্ত্রীর ছুরি যা দিয়ে উনি নিজেকে শেষ করে দেন। নিলামে কিনেছেন সহদেব কিন্তু তখন কি জানতেন ??

কাউকে কিছু বলেন নি। ডিনার টেবিলে গরম গরম শূকরের মাংসের স্যুপ খাওয়ার সময় গা গুলিয়ে উঠছিলো ! মনে হচ্ছিলো এক আততায়ীর রক্তাক্ত হাতের রান্না খাচ্ছেন !

কাছের মানুষ যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন মন বিষিয়ে যায়। সবাইকেই শত্রু মনে হয়। মনে হয় সবাই বুঝি ক্ষতি করার জন্য বসে আছে ! এতদিন শুনে এসেছেন এখন উপলব্ধি করতে পারেন।

খাওয়া কোনমতে শেষ করে উঠে গেলেন। একটি সিগার ধরিয়ে বেরিয়ে এলেন খোলা আকাশের নিচে ! একা হাঁটতে লাগলেন হালকা বনের পাশ দিয়ে। একটি কাঠের রেলিং এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন মানুষ চেনা কত কঠিন !

হঠাৎ পেছন থেকে দুটি নরম চেনা হাত এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে --------

কোনো আবেগ নয় আর। সুযোগ নিজে থেকে এসেছে --

গলা ঝেড়ে বলে উঠলেন : কেন থেল্‌মা ? কী করেছিলো নিরীহ ভেড়াগুলো ? আমরা তো ওদের পালক, হত্যাকারী কী করে হয়ে গেলাম ?

থেল্‌মা যেন ক্রুদ্ধ বাঘিনী - তুমি-ই তুমি-ই এরজন্যে দায়ী ! নপুংসক একটি ! একটি সন্তান দিতে পারোনি আমাকে। না পেরেছিলে নিজের প্রথমা স্ত্রীকে। তোমার ছেলে আসলে তোমার এক ছাত্রের ছেলে। আমি তোমার স্ত্রীর ডাইরি লুকিয়ে পড়েছি। উনি তার সঙ্গে বিছানায় গিয়েছিলেন বহুবার ! লজ্জা করেনা তোমার ? আমার জীবনটা ছারখার করার তুমি কে ?

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে মিষ্টি মেয়ে থেল্‌মা। যেন হঠাৎ গর্জে ওঠা মেঘ রূপান্তরিত হল প্রবল বর্ষণে --আমার বাবা নিজ সন্তানদের মারতেন একটি শিশুর জন্য আর আমি তো কতগুলো ভেড়াকে মেরেছি ! মানুষ তো মারিনি ! অনেক বইতে পড়েছি যে রক্ত দিয়ে প্রে করলে বাচ্চা হয়। আমি তো বলিউডের সিনেমা স্টোনম্যান মার্ডার্স-এও এরকম দেখেছি। একের পর এক খুন করে চলেছে একটু রক্তের জন্য। দেবী অর্চনার জন্য। তন্ত্র। মন্ত্র। ব্ল্যাক ম্যাজিক। আমিও চেষ্টা করেছি, কী অন্যায় করেছি বলো ? আমার কি মা হবার অধিকার নেই ?

প্রফেসর জানতেনই কিছু চরম শুনতে হবে। আর ওঁর মাথা চট করে গরম হয়না। ঠান্ডা মাথার মানুষ। তাই এইটুকুই শুধু বলেন : এতই যখন সন্তান পাবার ইচ্ছে আর আমি যখন অক্ষম তখন নিরীহ জীবগুলোকে না মেরে আমাকে ছেড়ে চলে গেলেই তো হত। আমি তো তোমায় বিবাহডোরেও বাঁধিনি !

এবার গলায় বেদনা, বুকে হাহাকার : আমি তো শুধু তোমার সন্তানের মা হতে চাই ! শুধু তোমার, তোমার মতন এক পন্ডিত, বিজ্ঞ, ভালোমানুষ আমার গর্ভ আলো করুক এই চাই।

প্রফেসর নীরব । চাঁদের আলো আজ ঘোলাটে । প্রকৃতি কুয়াশামাখা, অস্পষ্ট । মানবসভ্যতার ব্যাথা বেদনা বুকে নিয়ে মোমের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো ওক গাছ । যেন অগ্নি সংযোগ করলেই সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে ।

পরেরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই প্রফেসর ও থেল্মা প্রপার্টি ছেড়ে চলে যায় । রেখে যায় একটি রেজিগনেশান লেটার, বারান্দার গোলাপকাঠের টেবিলে – এক খোলা চিঠি যাতে শুধু লেখা একটি বাক্য : থেল্মা মা হতে চেয়েছিলো – চেয়েছিলো টা কেটে দিয়ে লেখা চায় !

মাসঘুরতেই খবরের কাগজে খবর বেরোয় যে পড়শী মিস্টার ডোবারু –র দানবীয় কুকুরেরা এক এক করে মেরে ফেলছে খামারবাড়ির ভেড়াদের । ওঁকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে । ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও সাবধান হতে হবে ।

দূরে সিডনি শহরে এক ফার্টিলিটি ক্লিনিকে প্রথম মানুষের চামড়া থেকে কোষ নিয়ে স্পার্ম তৈরিতে সক্ষম বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের প্রথম সফল স্পার্মটি পুঁতে দেন থেল্মার গর্ভে ।

পিতা অবশ্যই আশি ছুঁই ছুঁই অশীতিপর বৃদ্ধ উল বিশেষজ্ঞ প্রফেসর সহদেব রায় ।

নিহত ভেড়াদের প্রেতাত্মারাও আজ খুব খুশি । হয়ত তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার কথা ভেবেই !

You can have a look for latest research on stem cells regarding sperms ....
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1198132/Ethical-storm-flares-British-scientists-create-artificial-sperm-human-stem-cells.html

মোমজোছনায়

ববিস্মিতা দত্ত। এই নাম রেখেছিলেন বাবা। কেন কেউ জানেনা। নিজের অদ্ভুত নামখানি মনে না ধরায় তা চট করে বদলে ফেলে সে। নতুন নাম নেয় বেবো।

স্বামী বিখ্যাত হার্ট সার্জেন ডাঃ ইন্দরজিৎ চাড্ডা। তাই বেবো এখন মিসেস বেবো চাড্ডা। গৃহবধূ। রূপসী, নম্র, মিতভাষিনী। আজকাল অবশ্য কাজ করে এক মাসাজ বিশেষজ্ঞ হিসেবে। থাকে ব্যাঙ্গালোরে। সাব আর্বে। বিরাট ফ্ল্যাটে। বিলাস বহুল এই ফ্ল্যাটে অনেক সুবিধে থাকলেও ওর একাকীত্ব কাটেনা। কারণ ও সবার সঙ্গে ঠিক মিশতে পারেনা। শাড়ি গয়না নিয়ে আলাপন কিংবা পরনিন্দা পরচর্চায় ওর হাঁফ ধরে যায়। ওর ফ্ল্যাটেই থাকে লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মেয়ে। স্কুল শিক্ষিকা। ওঁর স্বামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। রাজস্থানী ছেলে। রাজস্থান শুনলেই একটি ধ্রুপদী গন্ধ আসে ওর নাকে। তাই এঁদের সাথে সুযোগ হলেই মেশে। এঁরা খুব ভালো। বিনয়ী।

সময় কাটতো না আগে। কিছু করার উৎসাহও পেতোনা। একমাত্র ছেলে জোজোবা কে হারিয়েছিলো তার যখন মাত্র ১৬ বছর বয়স। হৃদরোগে। অসময়ে হুজুগে পড়ে নিজেকে ম্যাচো তৈরি করে মেয়েদের ইম্প্রেস করার খেলায় মেতে সে স্টেরয়েড নিয়ে পেশী বুনতে শুরু করে। অত্যাধিক ডোজে হার্ট ফেল করে মারা যায়। পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিলো বেবো। তার স্বামী অনেক বুঝিয়ে তাকে আবার স্বাভাবিক জগতে ফিরিয়ে এনেছে। এখন তো বিষাদ কন্যা অনেক নর্মাল। কাজও করে। এই ছেলেই আগে জন্মদিনের পার্টিতে কেউ তার বাবার না আসতে পারা নিয়ে মজা করলে লোকজনদের বলতো : ও্ ওয়েট আ মিনিট। মাই ফাদার হ্যাজ মোর ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক টু ডু। হি ইজ সেভিং সামবডিজ্ লাইফ।

সেই গভীর ছেলেই যখন সামান্য মেয়েদের ইম্প্রেস করার খেলায় নিজেকে শেষ করে দেয়, বুক ভেঙে যায় – গিয়েছিলো বেবোর-ও। তার সহৃদয় ব্যস্ত স্বামী চিকিৎসার সব দায়িত্ব সরিয়ে তাকে নিয়ে বিদেশে ঘুরে আসে।

শান্ত করে তবেই আবার ফিরে যান নিজ জগতে। আজ সে সুস্থ। স্বামী তাকে প্রাণ দিলেও অন্য আরেকজন তাকে জীবন দিয়েছেন। তাঁরই মৃত্যু সংবাদ পড়ছিলো সে খবরের কাগজে। প্রফেসর কোর্টনি আর্নল্ড। বেবোর পাশের ফ্ল্যাটে ছিলেন অনেকদিন। জাতিতে বৃটিশ, এখন অস্ট্রেলিয়ান।

ওঁনার কাছেই বেবো আবার বাঁচতে শিখেছিলো। একটা সময় তো ফ্ল্যাটের সুমিং পুলের দিকে চেয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতো। শুন্য দৃষ্টি। মনে পড়ে যেতো ছেলের সব গল্প। কোলে করে বড় করা। বুকে করে মানুষ করা। ব্যস্ত স্বামী। একাই তো গড়ে তুলেছিলো তাকে। ইন্দরজিৎ কয়েকবার বলেছেন ডুন স্কুল কিংবা ঋষি ভ্যালিতে ভর্তি করে দিতে। বেবো রাজি হয়নি। শত অসুবিধা সত্ত্বেও একা তাকে মানুষ করেছিলো। বাবা তো নামমাত্রই ছিলেন। উনি এত ব্যস্ত যে পরিবারের জন্য সময় দেওয়া তা সুদূর পরাহত। কাজেই। ছেলেও বুঝতো। বাবাকেই বেশি ভালোবাসতো তবুও এই অনুপস্থিতি সে মেনে নিয়েছিলো স্বাভাবিক ভাবেই। শুধু দেখা হলে বলতো : বাবি, আমরা আরেকটু বেশি দিনের জন্য বেড়াতে যাবো। বাবাও হাসতেন। সময়ের তার অভাব। বড় অভাব। তবুও বছরে একটিবার বাইরে যেতেন ওকে নিয়ে। যেখানে সে যেতে চাইতো। সমুদ্র, অরণ্য, পাহাড়,মিশরের মমি কিংবা মাচু পিচু।

কোর্টনি যে আদতে শিক্ষক বেবো আগে জানতো না। জানতো উনি মাসাজ করেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে এখানে থাকেন - ভারতীয় মাসাজ শিখেছেন, ভালোবাসেন -তারই সুত্র ধরেই ভারতবাসী হওয়া। পরেরদিকে অবশ্য উনি দেশে ফিরে যান। ওঁনার বাড়ি খনি শহর পার্থে। দীর্ঘদিন খনি এলাকায় থাকার জন্য কিনা জানা নেই উনি লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হন। প্রথাগত সমস্ত চিকিৎসা ফেল করে। শেষে কেমো ও রেডিও ছেড়ে উনি আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথির দ্বারস্থ হন। একটি ওষুধ আছে। ওষুধ না বলে তাকে মহৌষধ বলাই ভালো। হুইট গ্রাস। এর রস খেলে সেরে যায় টার্মিনাল ক্যান্সারও। প্রফেসর শুনেছিলেন। উনি রোজ খেতেন হাফ লিটার। বেশ বাজে স্বাদ। তবুও খেতেন। শরীর চাঙ্গা ছিলো। আর মাসাজ করতেন। ভেঙে পড়া বেবোর নবজীবন দান করেন উনি-ই। বলেন : মাসাজ শেখো। মাসাজ নাও। শরীর ভালো হবে।

তা নিলে একদিন। কোর্টনির কাছে মেয়েদের মাসাজ করার জন্য একটি মেয়ে আসতো। ঐশ্বর্য নাম তার। সেই একদিন বেবোর মাসাজ করলো। নানান ধরণের মাসাজ। কুমকুমাদি লেপম, শিরোধারা, শিরোবস্তি, অভয়ঙ্গম এইসব। নামগুলিও ভারি সুন্দর।

বেবো ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হল মাসাজে। এখন তো মাসাজ পার্লার চালায়। সঙ্গে ভেষজ তৈল বিক্রী করে। সময়টা ভালো কাটে।

ইউক্যালিপটাস -তেল, উইন্টারগ্রিন তেল, কত তেল। সুবাসিত পার্লার তার, তেলের গন্ধ ও ফুলের গন্ধ মিলে হয়ে ওঠে স্বর্গপুরীর স্বরচিত কাব্য।

কোর্টনি সাহেব খুবই বিনয়ী। সকালে ওর দরজায় পড়ে থাকা দুধের ঠোঙাগুলি তুলে ওর ঘরে দিয়ে যান। নিচে দোকানে গেলে ওঁদের জন্য কিছু আনতে হবে কিনা সেই খোঁজখবর নিয়ে তবেই যান।

বিকেলে ওঁরা দুজনে একসঙ্গে হাঁটতে বেরোয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘাসে ঢাকা কৃত্রিম পথ ধরে হেঁটে যায় বহুদূরে। সেখানে একটি প্রাকৃতিক লেক আছে। আর পাশেই পাথরের কারখানা। এদিকে তো অনেক কিছুই পাথর দিয়ে বানানো হয়। সেখানে পাথরের ওপরে বসে দুজনে ফিল্টার কফি খায়, পাহাড়ি লঙ্কাভাজা খায়, আলু বড়া খায়। আবার ফিরে আসে। পথে অনেক গল্প হয়।

মিহিস্বরে বলেন : কেমো নেওয়া এত কষ্টের যে বলার নয়। তখন মনে হত, এরচেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

কেমো বন্ধ করেই আমি ভালো আছি। চুলে পড়ে যাওয়া, সবসময় বমি বমি ভাব, দূর্বলতা আমাকে ঠেলে দিয়েছিল ডিপ্রেশানের দিকে। আমাকে মাসে একবার করে যেতে হয় রক্ত পরীক্ষা করতে। ক্যানসার ফিরে এলেই আবার হয়ত ওসব ছাইপাশ দিতে আরম্ভ করবে। আপাতত: ভালই আছি। খুব কমলালেবুর রস খাই। শুনেছি একটি চিকিৎসা আছে তাতে পর পর কয়েকমাস শুধু ফলের রস খাইয়ে রাখে। এতে শরীরের ইমিউনিটি বেড়ে যায় ও ক্যান্সারে সুবিধে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে যায়। আমি এখনো পরীক্ষা করে দেখিনি। এখন প্রাণায়ম, যোগা ও হুইট গ্রাস দিয়েই ভালো আছি। আর মাসাজ। শরীর চাঙা হয়ে যায় এইসব মাসাজে।

আসলে জানো তো জীবনের শেষটা যখন মানুষ দেখতে পায় তখন অনেক দয়াময় হয়ে ওঠে। ওঠাই শ্রেয়। আর কটা দিনই বা ? এই ভাবনা থেকে মানুষ ছাড়তে শেখে। তবে ব্যাতিক্রমও আছে। আমার মনে হয় মৃত্যুর ঘন্টা মানুষকে পরিণত করে। ভরসা করতে শেখায়। এই আমাকেই দেখো না ! সব ছেড়ে মাসাজই আজ আমার জীবন !

বেবো হাসে। তারও আজকাল মাসাজ করতে বেশ লাগে। ও বলে : বিদেশেও তো মাসাজ হয়।

কোর্টনি : তা হয়, তবে এইসব মাসাজ তোমরা সাবকন্টিনেন্টের মানুষেরাই ভালো করো। আমাদের কাছে এগুলি প্রফেশান। তোমরা নিজেদের পজিটিভ এনার্জি এরমধ্যে দাও বলে কাজ হয় অনেক বেশি।

বেবো মুখ হালকা করে হাসে।

কুমকুমাদি লেপম আদতে ফেসিয়াল। খুবই আরামদায়ক। চামড়াও একদম উজ্জ্বল। চনমনে।

নিরোগ শরীর রাখতে মাসাজের জুড়ি মেলা ভার। কোর্টনিকে নিয়ে একবার ও তিরুপতিও গিয়েছিলো। সাহেব মানুষ কিন্তু ভক্তিভরে পুজো দেন বেবোর হাত দিয়ে। প্রসাদম্ ও নিয়ে আসেন যত্ন করে। বলেন : দেখি যদি লিউকেমিয়ার হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাই !

- আপনার স্ত্রী নেই ? সন্তান সন্ততি ?
- ছিল। স্ত্রী আমার কাজের নমুনা দেখে আমাকে ছেড়ে অনেকদিন আগেই চলে গেছেন। দুটি মেয়ে। একজন পাইলট। অন্যজন ট্র্যাভেল এজেন্সি চালায়। তারই কল্যাণে সর্বপ্রথম ইন্ডিয়া সম্পর্কে নানান তথ্য পাই। খুবই ইনোভেটিভভাবে সে এজেন্সি চালায়। যে যেখানে বেড়াতে যেতে চায় সেখানকার নানান আকর্ষণীয় স্থানের সাথে সাথে এইসব মাসাজ, বিশেষ বিশেষ জিনিস, কালচারও জানায়। অনেকেই এখানে এসে আমার মতন থেকে গেছেন। আমার কত বন্ধু বান্ধব উটি, কোদাইকানাল, ওয়েলিংটনে থেকে গেছেন স্রেফ ঘুরতে এসে। ইন্ডিয়া বেশ ভালো দেশ। কত মানুষ কত ঘটনা এখানে। অস্ট্রেলিয়ায় মানুষ নেই। লোক কম রাস্তাঘাট শুনশান। আর

তোমাদের বিভিন্ন কালচারও আমার খুব ভালো লাগে। গুজরাটিদের একরকম তো রাজস্থানী আরেকরকম তো অসমীয়া – মিজোদের অন্যরকম। খুবই সুন্দর। মাইন্ড ব্লোয়িং। আমি খুব এনজয় করি।

হাসে বেবোও। তারও বেশ লাগে তাই তো থেকে গেছে এখানে। বিদেশে কি যেতে পারতো না ?

যায়নি। ইন্দরজিৎ তো ইংল্যান্ড থেকেই ডাক্তারি পাশ করে এসেছেন। তখন বেবোর চলতো প্রেম পর্ব। চিঠি চালাচালি। তখনো সে ব্যস্ত ছিলো তবুও কিছু সময় ছিলো। এখন মানুষের জীবনদানেই কেটে যায় সময়। স্ত্রী ও একসময়ের প্রেয়সী থাকেন কাঠের পুতুলের মত। শো কেসে সাজানো। বহুমূল্য বার্বি ডল। বড়লোকের নি:সঙ্গ বৌয়ের মতন। সঙ্গী বলতে কোর্টনি সাহেব আর ক্লায়েন্টরা। সম্প্রতি একটি বিশেষ মাসাজ শিখেছে সাহেবের কাছে। ফাঁসির দড়ির মতন একটি দড়ি ধরে মানুষের থাই ও পিঠে চড়ে লম্ফ দিয়ে মাসাজ করতে হয়, খুব গায়ের জোর লাগে। এগুলি খেলোয়াড়দের লাগে। কোনো চোট ইত্যাদি সারাতে। যার মাসাজ হবে তাকেও যথেষ্ট শক্ত সমর্থ হতে হবে। নাহলে খুবই কষ্ট হবে তার।

ও যখন মাসাজ করে কোর্টনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে হেসে বলেন : এত ফোঁস ফোঁস করছো কেন ? হাঁফ ধরেছে নাকি ? একটু জিরিয়ে নাও তাহলে।

জিরাবে কি তখন তো তেলে ওর দুই পা টৈটুম্বুর !

কোর্টনির মায়াবী আঁখি, ঋজু ভঙ্গিমা, নতজানু হয়ে চায়ের পেয়ালা বাড়িয়ে দেওয়া খুব ভালো লাগে বেবোর। এই অসম বয়সের মিত্রতা মনে একটি স্নিগ্ধভাবে আনে। এতদিন জীবন যুদ্ধে দৌড়ে বেড়িয়েছে। কখনো ফুলের সুবাস নেবার ফুরসৎ পায়নি। ছেলেকে হারিয়ে হয়ে গিয়েছিলো একতাল পরিত্যক্ত মাটির মতন। এখন যেন মনে হয় জীবনের যে এত সুন্দর দিক আছে তা আগে কেন দেখেনি ! স্বল্প কিছু নিয়েই ছিল বেশ। তা হারাতেই হয়ে গেলো অসহায়। এখন কোর্টনির দরদী মনের স্পর্শে জীবন বাঙময় ! জীবন হাসছে, দুলে দুলে। মানুষের মাসাজ করা হয়ত সাংঘাতিক উঁচুদরের কিছু কাজ নয় এই যেমন ডা: চাড্ডা করছেন সেইরকম কিন্তু কিছু মানুষের পুরাতন ব্যাধি যখন সেরে যায় বড় ভালোলাগে। একজন শুশ্রুসা করা, সেবা করা মানুষের কাছে এরচেয়ে

বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে ? নাহ্ একে সে ঈশ্বরপূজা ভাবেনা । কারণ ঈশ্বরপূজা করা অত সহজ নয় ! বেশির ভাগই স্বার্থের অথবা সময় কাটানোর সেবা তাকেই কিছু মানুষ ঈশ্বরপূজার নাম দিয়ে দেন । ও মহান হতে চায়না । ও সাধারণ রক্ত মাংস শুধু আনন্দে বাঁচতে চায় । ওর স্বামী অবশ্যই ঈশ্বরপূজা করেন । রাতবিরেতে নিজের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়ে হার্টে ছেদন- সহজ কাজ নয় । এক একটি অপারেশন অনেক সময় নিয়ে করা হয় । বার হবার পরে মনে হয় মাথা আর কাজ করছে না তবুও পরেরটাও হাসি মুখে করেন নতুন উৎসাহ নিয়ে আবার কাউকে বাঁচাবার তাগিদে ।

ওঁর মনটাও খুব পরিষ্কার । জটিল নয় । উনি বহু অর্থ দানও করে দেন । একটি হার্ট এর অসুখ সংক্রান্ত হাসপাতাল খুলেছেন । সেখানে বহু জটিল রোগের চিকিৎসা হয় বিনাপয়সায় । মায়ের নামে নাম ।

কোকিলা চাড্ডা হার্ট রিজেনেরেশান সেন্টার --- সংস্থার নাম ।

লিভারের মতন হার্ট তো আর গজানো যায়না তবে সারানো যায় । ওর মতন পরিশ্রমী দুনিয়ায় আর কিছু আছে কি ? দিবারাত্রির কাব্য ওর প্রতিটি বিট । একবার থেমে গেলেই মরণের পরের সিন অভিনীত হবে । সেই হার্ট অর্থাৎ হৃদয় ! তাই নিয়ে কারবার করা কি আর যার তার কাজ ? হৃদয়বান তো হতেই হবে !!

বেবোও অন্যরকম । সে নিজের কাজটুকু থেকে আনন্দ নেয় আর উপভোগ করে কোর্টনির সঙ্গ । অবাক হতে হয় ওঁর জ্ঞান দেখে । এত জানেন ! ভারতের ইতিহাস বেবোও তেমন জানে না যত কোর্টনি জানেন । বলেন : বৈদিক যুগে তোমাদের মেয়েরা খোলামেলা ছিলেন পরে মুসলিম রাজারা এসে বোরখায় ঢেকে ফেলেছেন মানে মেয়েরা ঘরে ঢুকে পড়েছেন ! দ্রাবিড় সভ্যতাই তো আসল ভারতীয় সভ্যতা পরে আর্যরা এসে সব দখল করে নেয় । বেবো এসব জানে না যে তা নয় তবে উনি আরো গভীরে জানেন ।

মাসাজের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় বুঝি বই পড়েই কাটান । আর উনি ধরিত্রীপুত্র । কোনো ইগো নেই । কিছু জিজ্ঞেস করলে এত্তো সুন্দর করে বোঝান যে আরো জানতে ইচ্ছে হয় । এই পড়ন্ত বেলায় মনে হয় বই খুলে

নতুন করে আবার সব পড়ি। একদিন ইন্দরজিতের ছুটি ছিলো। বেবো ও তাঁকে ডিনার-এ ডাকলেন কোর্টনি।

সুন্দর ছিমছাম ঘর তাঁর। বেশি আসবাবপত্র নেই। নেই অহেতুক লোক দেখানো শো-কেস। তবুও ওয়েল ডেকরেটেড। দেখার চোখটা চাই এই আর কি!

ছোট ছোট পায়াওয়ালা খাটে এনে তাঁদের বসালেন। বিভিন্ন ভেষজ দিয়ে তৈরি হয়েছে নানান মূর্তি। একদিকে রাখা। আর নানান তেল। অপরূপ সুবাস তাদের। ঘরে ঢুকলেই একটি মিহি অনুভূতি হয়। নিজেকে অসম্ভব হালকা লাগে। তাঁদের অবাক করে দিয়ে দেখা গেলো উনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কেও অনেক জানেন এমন এমন জিনিস বলতে লাগলেন যা ইন্দরজিতের কাছেও নতুন।

প্রথমেই অভিযোগ জানালেন। বললেন : কেন বলো তোমরা যে ওরাল ইন্সুলিন সম্ভব নয়? তা প্রোটিন বলে হজম হয়ে যায়? ওটা তো মুখ দিয়েও শোষণ করানো যায় কিংবা যোনি দিয়ে। তাছাড়া আগের থেকেই যদি রিজিড হই নতুন কিছু বেরোবে কি করে? ইন্দরজিৎ নিষ্প্রাণ হাসি দেন।

কোর্টনি বলেন : তোমাদের মতন অনেক ডাক্তার বলে ক্যানসারের একটি ওষুধ সম্ভব নয় কারণ বিভিন্ন ক্যানসারের চরিত্র আলাদা। কিন্তু বেসিক তো একই। কোষের অস্বাভাবিক বিভাজন। কাজেই ওষুধ সম্ভব -চায়ের গরম পেয়ালা নিজ হাতে এগিয়ে দিয়ে মৃদু হাসেন উনি। পিওর দার্জিলিং টি। বেবো চা চেনে। ওর মা ছিলেন টি -টেস্টার। বড় হয়েছেন আসামে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি কামিনী।

ইন্দরজিৎ-ও হাসেন। বলেন : বটেই তো। তবে হার্টের ক্যানসার কিন্তু খুব কম সাধারণতঃ অন্য অর্গ্যান থেকে স্প্রেড করে। আমাদেরও সুবিধে তাতে!

দুজনেই হেসে ওঠে পরিস্থিত হালকা করার জন্য। তারপরে চলে হার্ট ক্যান্সার নিয়ে তুমুল আলোচনা। কত জানেন কোর্টনি। বলে : ওগুলো

তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিনাইন টিউমার তাই না ? আর নেচারে সারকোমা নট কারসিনোমা !

এরপরে বেবোর অস্তিত্বকে তোয়াক্‌কা না করেই দুজনের আলোচনা চলে। বেবো মুগ্ধ হয় ওর মাসাজ শিক্ষকের জ্ঞানে। পন্ডিত স্বামীর কাছেও মুখটা রক্ষা হয় ওর। মুখে না বললেও হয়ত ভাবেন এক ম্যাসারের সঙ্গে কি এত সখ্যতা রে বাবা ! কি পায় ওঁর থেকে ?

তাই আজ গর্বে বুকটা ভরে উঠলো। ভাবেনি কোনদিন যে কোর্টনি তার স্বামীর সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে তর্ক করতে পারবেন কিংবা আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।

আজ সেই মানুষের মৃত্যু সংবাদ হাতে নিয়ে বসে বেবো । তার জীবনপথের পথ প্রদর্শক, গাইড । নবজীবন দাতা । প্রফেসর কোর্টনি আর্নল্ড। জাতিতে বৃটিশ। নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, মাটির মানুষ। যিনি বেবোর মতন এক সাধারণ মানুষের বাজার করা, দুধের প্যাকেট তোলা, নিজ হাতে কুমকুমাদি লেপম ও শিরোধারা শেখানো, পুত্রশোক ভুলতে সাহায্য করা ইত্যাদি করেছেন তিনি আদতে ছিলেন এক নোবেল লরিয়েট । চিকিৎসা বিজ্ঞানে ১৯৮৫ সালে নোবেল পান । এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা গ্লিওব্লাস্টোমার মতন দূর্ধর্ষ ব্রেন ক্যানসারের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

নোবেল লরিয়েট প্রফেসর কোর্টনি আর্নল্ড কিন্তু লিউকেমিয়ায় মারা যান নি । হুইট গ্রাস জুস খেয়ে ও প্রাণায়াম করে ওঁর ম্যালিগন্যান্সি কমে গিয়েছিলো। মারা গেছেন এই অমৃতের সন্তান গাড়ি দূর্ঘটনায়। সেই মানব সন্তান যাঁর হাতে ধরেই বেবো আবার হাঁটতে শিখেছিলো মোম জোছনায়।

পুত্রশোক পর্ব মিটে গেলেও নতুন করে দুই চোখ ঢেকে দিলো কালো মেঘ। পিতৃশোকে ডুবে গেলো গাঢ় অমানিশায়। আঁজলাভরে পান করলো নীলাভ গরল, জীবন কলস থেকে ; পূণর্জন্ম হওয়া বেবো, আবার -------- প্রাগৈতিহাসিক মোম জোছনায়।

কালনাগিনীর ডাইরি

এই আলেখ্যকে ডাইরি না বলে ব্লগ বলাই বোধহয় ভালো । কিন্তু গার্গী একে ব্লগ বলবেন না । তাই ডাইরি । এই উপাখ্যান এক অত্যন্ত সাধারণ মেয়ের যার বসবাস ছিলো দক্ষিণ অ্যাফ্রিকার কেপ টাউনের কাছে এক ছোট শহরে, নাম মুরুমবীণা ।

ইংলিশেই পারদর্শী হলেও আমি স্থানীয় ভাষা অ্যাফ্রিকানস্‌ও (*Afrikaans)* জানতাম । পূর্বপুরুষ বহুযুগ আগে সুদূর ভারত থেকে এখানে এসেছিলেন শ্রমিকের কাজ নিয়ে । খনির শ্রমিক । আজ আমরা প্রতিষ্ঠিত । আমি প্রফেশন্যাল কাঁদিয়ে । অর্থের বিনিময়ে লোকের মৃত্যুর আসরে গিয়ে কাঁদি । আমি moirologist- একধরণের রুদালী তবে তার অভিজাত ভার্সান । যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের জন্য অথবা ধনীর মৃত আত্মজদের জন্য আমরা কাঁদি । শৈশব থেকেই আমার চোখে একটুতেই জল আসতো । তাকেই একটু ঘষামাজা করে হয়েছি কাঁদিয়ে । এরজন্যে আমি পয়সা পাই ।

আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ কেপ টাউনে । ও একটি বাড়িতে থাকতো যার বাইরে লেখা ছিলো : এখানে লুনাটিকেরা থাকে ।

এই অদ্ভুত লেখা দেখেই সেই বাড়ির প্রতি আকৃষ্ট হই । একদিন ঢুকে পড়ি । দক্ষিণ অ্যাফ্রিকায় ভীষণ রেপ হয় । খুব অপরাধপ্রবণ এলাকা । তাই এক খ্রীস্টমাসের রাতে পার্টির পর আমার হবু বর আমাকে একা না ছেড়ে পৌছে দিতে আসে আমার ডেরায়।

সেদিনই প্রথম আমরা মিলিত হই । সুখমিলনের পরে ও হঠাৎ-ই ঠিক করে আমাকে বিয়ে করবে । তার আগে অবধি আমি ওর স্টেডি গার্লফ্রেন্ড ছিলাম । এখন সে নিশ্চিত যে আমার সঙ্গে সুখে থাকবে তাই আমাকে বিয়ে করবে । তার আগে আমাকে নিয়ে যাবে ভারতে, ওর বাবা মায়ের সাথে

পরিচয় করাতে। যদিও আমি মূলত ভারতীয় কিন্তু বহুদিন বিদেশ বাসের কারণে আমার মধ্যে মেমসাহেবের ছাপ এসেছে তাই ও একবার বাড়িতে আমাকে দেখিয়ে নেবে। কিছুই না শুধু ফর্মালিটি।

আমার নাম মন্থরা। মন্থরা বর্মা। আমার কিন্তু কোনো কুঁজ নেই। মহাকাব্যের চরিত্রের নামে নাম হলেও এই নাম আমাকে অস্বস্তিতে ফেলতো কারণ আমি জেনেছিলাম হবু স্বামীর কাছে যে মন্থরা একটি নেগেটিভ ক্যারেকটার। আমিও একটু নেগেটিভ বৈকি! নাহলে এরকম আজব পেশাই বা বাছাবো কেন ? মায়াকান্না ! অর্থের বিনিময়ে লোকসমক্ষে রোদন !

আমার ভারতীয় বাবা ছিলেন অসম্ভব পজিটিভ মানুষ। মা মেমসাহেব। বহুযুগ ধরে আমার পরিবার এখানে থাকায় আমরা হাফ সাহেব। বাবার গায়ের রং-ও সাদা কারণ ঠাকুমা মেমসাহেব। সেই সাদাচামড়ার বাবা দক্ষিণ অ্যাফ্রিকার কালোমানুষদের জন্য লড়তেন। অনেক লড়েছেন। নাহ্ নেলসন ম্যান্ডেলার মতন লিডার নন তিনি, ছিলেন কবি-গীতিকার-নাট্যকার। কালোমানুষদের অধিকার, তাঁদের শ্রদ্ধা করা, ভালোবাসা সর্বোপরি মানুষ ভাবতে শেখা এই জিনিসগুলিই বাবা প্রচার করতেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। বহুকাল তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিলো। পরে মুক্তি পান। কিছু মানুষের বিরাগভাজন হন ও লোকাল সাদা চামড়ার গুলিতে অল্পবয়সেই প্রাণ হারান। তখন থেকেই আমি প্রফেশন্যাল মোর্নার।

এক রূপালি সন্ধ্যায় (কুয়াশা মোড়া) এসে পৌঁছলাম আমার হবু শ্বশুরবাড়ির গেটে। বিরাট বাড়ি। অট্টালিকা যাকে বলে। অবস্থান গোয়ালিয়রে। পাহাড়ের আড়ালে পাথুরে বাড়ি। জীবিকা ব্যবসা। অভিজাত, বনেদী পরিবার। গোয়ালিয়রের রাজপরিবারের সাথে রক্তযোগ আছে। আমার শ্বশুরমহাশয় খুবই বিনয়ী। ভদ্রলোক। মেপে কথা বলেন। আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। আমি ওঁকে ভক্তিই করতাম। এত ব্যাক্তিত্ব ও গুরুগম্ভীর ভাব : শ্রদ্ধা জাগায় মনে।

আমি সাবধানী ছিলাম না। মুখিয়ে ছিলাম একটি সন্তানের জন্য বিয়ের পর পরেই। আমরা দক্ষিণ অ্যাফ্রিকায় বেশ কিছুদিন থেকে ভারতে আসি।

এখানেও কিছুদিন থাকি । তারপর শুরু হয় সন্তানের জন্য চাপ দেওয়া পরিবার থেকে । আমি রাজি থাকলেও আমার স্বামী বিক্রান্ত রাজি ছিলো না । সে দক্ষিণ অ্যাফ্রিকায় জকির কাজ করতো । ঘোড়া ছেলেবেলা থেকেই প্রিয় । এক বড় ব্যবসায়ীর নেকনজরে পড়ে চলে আসে কেপ টাউনে । সেই ব্যবসাদার আদতে সিন্ধি । বড় আস্তাবলে হিন্দী সিনেমা রেসের মতন এক ঘোড়াপ্রেমী সওদাগড়ের কাছে চাকরি নেয় ।

থাকতো সেই বাড়িতে যেখানে লেখা : এখানে লুনাটিকেরা থাকে – সাবধান ।

আমাকে বলতো : আমাদের মেয়ে হলে নাম দেবো লুনা । কারণ তুমিও কিঞ্চিৎ লুনাটিক নাহলে আমার প্রেমে পড়েছো ? আর ছেলে হলে নাম দেবো লুনি ।

সন্তানকে ঘিরেই এই গল্প । সন্তান হচ্ছিলো না আমার । লোকে ভাবলো আমি বাঁজা ।

পরিবার থেকে পরীক্ষা করতে দিলো না কারণ তাঁরা খুবই রক্ষণশীল ।

তবুও আমার মায়ের চাপে পরীক্ষা হল দক্ষিণ অ্যাফ্রিকায় । দেখা গেলো আমি সক্ষম আমার স্বামী অক্ষম । মেনে নিলেন না পরিবারের লোকেরা । তাঁদের বংশ রক্ষাটাই রীতি । এত্তো বনেদী বংশ হঠাৎ নির্বংশ হয়ে যাবে ? এও কি সম্ভব ?

আমাদের উকিল মিস্টার তোড়ি দিলেন এক মহাপদেশ । প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুযায়ি হবে নিয়োগ প্রথা । আমার গর্ভ পূর্ণ করবেন আমার শ্বশুর । কারণ তাঁর একটি মাত্রই পুত্র সন্তান এবং তা হলেন আমার স্বামী । আধুনিক যুগের নিয়োগ প্রথা কিন্তু দৈহিক সম্পর্কের দ্বারা হবেনা । হবে গবেষণাগারে । চিকিৎসকগণ আমার শ্বশুরের স্পার্ম নিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন আমার গর্ভে । ব্যবস্থাটিতে আমার স্বামীর সমর্থন না থাকলেও সম্মতি দিতে বাধ্য হয় । আমি এথিক্যাল দিকটি নিয়ে ভাবি । মা বলেন : দিস ইজ আটার ননসেন্স । হোয়াই অন আর্থ উল ইউ ক্যারি ইওর ফাদার ইন লওস্ স্পার্মস্ ?? ডাইভোর্স করে দাও ঐ আনসিভিলাইজড্ ফ্যামিলির ছেলেকে ।

আমিও খুব যে স্বচ্ছন্দ ছিলাম তা নয় তবুও ওকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম । তাই এই প্রথা মেনে নিই । হয় নিয়োগ প্রথা । হাসপাতালে । কেপ টাউনে ।

আমার শ্বশুরের স্পার্ম নিয়ে আমার গর্ভে পুরে দেওয়া হয় । বেড়ে ওঠে আমাদের সন্তান ।

প্রথমে তেমন কিছু মনে হয়নি । যতদিন যেতে লাগলো আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম!

শিশুটি যতই বেড়ে উঠতে লাগলো আমি নিজ গর্ভে অনুভব করতে লাগলাম আমার পিতৃসমান শ্বশুরকে । যেন তিনি আমার সমস্ত শরীর জুড়ে, সত্তা জুড়ে বিরাজ করছেন । আমি তারই একটুকরো অংশের ধারক ও বাহক । তার প্রেমাস্পদ ।

মনে মনে আসন্ন মাতৃত্বকে সেলিব্রেট করার বদলে আমি আমার শ্বশুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিলাম । ভাবছিলাম, ওঁকে কি আমি শয্যায় পাবো ? আমাকে উনি চুম্বন করবেন আমার যোনিতে এঁকে দেবেন রাজতিলক ! আমি ভেসে যাবো এক নিষিদ্ধ সম্পর্কের স্রোতে ।

স্বামীর সাথেও দূরত্ব বাড়ছিলো । সে সারাটাদিন ঘোড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতো কারণ মনে মনে তো জানতো বাচ্চার বাবাটি আসলে কে ! হয়ত নিজের দূর্ভাগ্যকে মেনে নিতে অসুবিধে হত নিজেকে অসহায়, জোকার মনে হত । পরিবারের হাতে, ভাগ্যের হাতের পুতুল । আস্তাবলেই কেটে যেতো তার অধিকাংশ সময় আর এদিকে আমি মনে মনে কামনা করতাম আমার শ্বশুরকে ।

ওঁরা দক্ষিণ অ্যাফ্রিকায় এলেন । আমাদের বাড়িতে যতদিন ছিলেন আমার বাবার কালোমানুষের জন্য গান ও নাটকের কথা ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনে আমাকে বলতেন : সত্যি উনি এক মহামানব । আমিও তোমার বাবা কিন্তু এঁর মতন হতে পারিনি ।

আমার একটুও ভালোলাগতো না কথাটি । নিজের ওপরে ঘৃণা হত ! কেন আমি এঁর স্ত্রী হলাম না ? কেন আরো একটু আগে আমার গোয়ালিয়রে

জন্ম হলনা ! কেন ? নিজেকে প্রশ্ন করতাম : আমি কি বিষকন্যা ? কালনাগিনী ? পরিবারে ভাঙনের কারণ ?

উত্তর পেতাম না। যুক্তির থেকে আবেগ এগিয়ে থাকতো। ভালোলাগার রেশটাই শুধু থেকে যেতো। যেদিন ওঁর হাতে হাত লেগে যায় আমি পাগল হয়ে উঠি। তারপর থেকে খাবার টেবিলে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কখন উনি আসেন, আলতো ছোঁয়া, একটু চোখাচোখি আর আমার হৃদয়ে উথালপাতাল !

মা বলতেন : একটু বিশ্রাম নাও। তোমার ডেলিভারি ডেট আসন্ন !

আমি তবুও টেবিলের কোণায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। শ্বশুরের জন্য।

উনি কি কিছু আঁচ করেছিলেন ? আজও জানিনা। মনে হত আমার গর্ভভার মুক্ত নাহলেই ভালো। থাকুন না আমাকে সারাটাজীবন এইভাবেই ছুঁয়ে। বন্ধুরা বলতো : তুই সত্যি পাগল হয়ে গেছিস !

তারপর এলো সেই মূহুর্ত। আমি মা হলাম। সন্তানকে হাতে নিয়ে অনুভব করলাম শ্বশুরকেই, নতুন করে। দু:খও হল। আমার দেহমুক্ত হল ঐ স্পার্ম বলে।

শিশুকে কোলে নিয়ে আমার স্বামী খুব একটা খুশি হয়নি, স্বাভাবিক নিয়মেই। তার বাবা বংশ রক্ষা করতে পেরে খুবই খুশি। যদিও এই কাহিনী কেউ জানেনা ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষ ব্যতীত। ছেলের নাম হল মাতন্ড। মন্থরার ছেলে মাতন্ড ----

আমি পেরেছি এঁদেরকে একটি বংশধর দিতে। বাইরে আমি খুব খুশি। কিন্তু এক বিষাক্ত তীরে ফালাফালা আমার আত্মা। আমি কার ? স্বামীর না তার পিতার ? আমার দেহের মালিক কে ? যে আমাকে নিয়ে পুতুল খেলে নাকি যে আমার গর্ভ আলো করে ?

কাকে আমি বেশি ভালোবাসি ?

মাতন্ডকে দেখার অনেক মানুষ আছেন ঐ ধনীর প্রাসাদে। সে ওদের কূলপ্রদীপ। কাজেই বিশেষ আদৃত। আর আমি ? এক ছিন্নভিন্ন সত্তা যার মনের খবর কেউ রাখেনা ! যে শুধুই কতগুলো নিয়মের দাস। বলা ভালো

নিয়মের বলি । যার ভালোমানুষ স্বামী বর্তমান অথচ সে আকৃষ্ট তার পিতার দিকে । এই অদ্ভুত সম্পর্কের টানাপোড়েন আমি মেনে নিতে পারিনা ।

রৌদ্রছায়ার দিনগুলি অসহ্য লাগে । বিলম্বিত লয়ে বাজে সুর । করুণ সুর । প্রফেশন্যাল কাঁদিয়ে আমি তবুও কাঁদতে পারিনা । বুক ফেটে যায় আর দম বন্ধ হয়ে আসে । আস্তাবলের সবুজ বাগিচায় বসে ঘোড়াদের আনাগোনা দেখি । দেখি জকি স্বামীকে । ওর নিস্পৃহ চেহারা আমাকে দারুণ কষ্ট দেয় । বুকের অন্যপাশটাও ভেঙে যায় । শেষে পাশা উল্টে দিই ।

আজ আমি অন্য জগতে । আমার মৃতদেহ ঘিরে বসে আছেন স্বজনেরা । আমার মা, স্বামী,

সহোদরেরা, অন্যান্য আত্মীয় পরিজন । আর সর্বোপরি আমার প্রেমাস্পদ, আমার শ্বশুর । আমার ইহকাল, পরকাল । আমার সত্তার অবিচ্ছদ্য এক অংশ ।

মৃত্যুর পরে বুঝতে পারি যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের বাইরেও জগৎ আছে এবং তা আরেক সত্যি । এখানে আমরা বায়বীয় । হালকা । আমাদের ক্ষমতাও মানুষের থেকে বেশি । আমরা কিছুটা পরিণত । যদি আবার জন্মাবার সুযোগ পাই আমি আমার শ্বশুরের প্রেয়সী হয়েই জন্মাতে চাই । তাঁকে পূর্ণ ভাবে পেতে চাই । শুধু তাঁর একটুকরো বিতর্কিত অংশ নয় ।

শেষে জানাই –এই অনুভূতি অনেক মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে আমি গার্গীকে অনুমতি দিয়েছি লেখাটি ছাপাতে । আপনারাই বিচার করুন আমি সতী নাকি কালনাগিনী ।

রেসিস্ট

ড্রিনা ও অ্যালেক্স

দেশটার নাম লা ট্রোব। সেখানে সাদামেয়ে ড্রিনার বাড়ি পাহাড়ে। একদিকে ঘন জঙ্গল অন্যদিকে খাদ। ওর প্রতিবেশি সুরেন নাইডু । ড্রিনার ভাই অ্যালেক্স খুব রগচটা। ভাইবোন একসাথে থাকে কারণ অ্যালেক্স পঙ্গু । ড্রিনা স্থুলকায়া তাই বয়ফ্রেন্ড নেই আপাতত: কোনো। ওর মা বলেন : গান শেখো। বিভিন্ন জায়গায় গান গাইতে যাবে তখন নানান লোকের সাথে আলাপ হবে। বয়ফ্রেন্ডও পাবে।

ড্রিনা : বয়ফ্রেন্ডের জন্য আমি একভাবে বসে গলা দিয়ে বিভিন্ন আওয়াজ বার করতে পারবো না।

অ্যালেক্সের সরকারের পয়সায় চলে। সাবকন্টিনেন্টের মানুষদের সে ঘেন্না করে। তার ধারণা এই কালোমানুষগুলো আসাতেই তাদের দেশের লোকের চাকরি যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ভাবে বসে পড়ছে দেশ। এছাড়া এই কালোগুলো ওদের অসভ্যতা নামক সভ্যতাকে এখানে টেনে আনে আর অ্যালেক্সের দেশের নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেগুলো চালাতে চায়। রাগ তো হবেই। এক একটাকে মারধোর দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু পায়ে জোর না থাকায় আপাতত: বাক্যবাণের ব্যবহারই চলছে।

সুরেন নাইডু

এসেছিলো সুরেন ভারত থেকে। বিদেশে আসার ইচ্ছে বহুদিনের কিন্তু সামর্থ্য নেই। ভাগ্যে থাকলে রোখে কে ? একদিন পেয়ে গেলো লটারি। অনেক টাকা ! সেই টাকা নিয়ে চলে এলো লা ট্রোবে। এইদেশটা ভারি সুন্দর। আর ভিসার অত ঝামেলা নেই। অনেক টাকা দেখাতে পারলে চলে আসা যায়। রিক্সাওয়ালা, রেলের কেরানি অনেকেই এইভাবে চলে এসে আজ এন আর আই হয়ে গেছেন।

সুরেনের অবশ্যই ডিগ্রি আছে। সে ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার। দেশে ছোট অফিসে বসতো। এখানে এসেও ভালই কাজ করে। আর ও খুবই ভদ্র ও

মার্জিত । আস্তে কথা বলে । পোলাইট । তবুও অ্যালেক্সের রোষে ওকে পড়তে হয় !

- এই কেলোভূত তুই আমার বাড়ির সামনে দু টুকরো ঘাস ফেলেছিস কেন ?
- রাস্তায় জেব্রা ক্রসিং না দেখে পার হচ্ছিস কেন ?
- কিপ ক্লিয়ার সাইনবোর্ড দেখেও ওখানে গাড়ি রাখছিস কেন ?
- একহাত দুটো ব্যাগ বইছিস কেন ? তোদের দেশে কি শ্রমিক ছিলি ?
- তোর বাড়ির লোকেরা পেট ভরে খেতে পায় ?
- এই তোদের ক্রিকেট টিম এলো, এবার কেলোভূতের দল দেখ মজা, এয়সা দেবোনা ! হারিয়ে ভূত করবো !
- তোরা আমাদের দেশে আসিস তারপরে নিজের দেশের মতন সব করিস । এটাকে নিজের দেশ কখনো ভাবিস না । কেন রে ? এখানে খাবি পরবি আর গীত গাইবে ঐ কেলেভূতের দেশের । এই তোরা এত্তো কেলে কেন রে ! এ কেলে ! কেমন কে-এ-লে !

এত অপমান বিনা কারণে । তবুও সুরেন চুপ করেই থাকে । ড্রিনার মা একবার সুরেনকে ড্রিনার বয়ফ্রেন্ড করার জন্য চাপ দেয় । সেখানেও অ্যালেক্স ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝামেলা করে ।

- মম, বংশের বারোটা বাজিয়ো না । একটি কেলোভূতকে বংশে ঢুকিয়ে সর্বনাশ করোনা !

ড্রিনার হয়ত সুরেনক ভালই লাগে । সুরেনও একটু মোটা মেয়েই পছন্দ করে, দক্ষিণী তো ! ওরা গোলগাল মোটাসোটাই হয় । ওয়ান ডায়মেনশান মেয়ে তার না পসন্দ । কিন্তু অ্যালেক্সের জন্য !

সুরেনকে দেখতে কালো কিন্তু মুখে একটি মাধুর্য্য আছে। বেশ গম্ভীর। ভালই লাগে। আর ও কাজ করে খুব ভালো। নাম হয়েছে সেখানে। নিজের ছোট্ট ফার্ম চালায়। গ্রিন আর্কিটেকচার নামে। ভারতীয় কলা ও শিল্পকে এদেশের সাথে মিলিয়ে কাজ করে। বাজারে বেশ চলে। খাজুরাহোর সুন্দর

সুচারু মন্দিরের মতন ঘর সাহেবরা পছন্দ করে তবুও অ্যালেক্স খুশি নয়,তার কাছে সে জংলী জানোয়ারের-ও অধম।

একবার সাহস করে বলেছিলো : আসুন না একবার আমাদের দেশে । দেখবেন কত ভালোলাগবে ।

অ্যালেক্স তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে : ম্যাড ডগ তো আমাকে বাইট করেনি !

তোর মতন একটা ইতর ছোটলোকের দেশে যাবো ! তোদের দেশে তো টয়লেট নেই লোকে রাস্তায় প্রাত:কৃত্য সারে । যেখানে মলত্যাগ করিস্ সেখানেই খাস ! শূয়োর !

সুরেন আর কথা বাড়ায় নি ।

সুরেনের সঙ্গী বলতে একটি সারমেয় । নাম প্ল্যাটিপাস । কুকুরের নাম প্ল্যাটিপাস – সুরেন বলে প্ল্যাটিপাস নাইডু ।

একটি গোল্ডেন রিট্রিভার । খুবই ভালো কুকুর, সবার মতন ওরও মালিক অন্ত প্রাণ । আর ও সুরেনের ভাষা বোঝে । গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে । যখন বাড়ি থাকেনা তখন বেচারা খুব মুষড়ে থাকে ।

এই অঞ্চলে নিয়ম হল বাড়ির সব দরকারি কাগজপত্র ব্যাংকে বা অন্যত্র রেখে আসা কারণ এলাকাটি অরণ্যের কাছে । প্রায়ই দাবানল লাগে । বাড়ি পুড়ে ছারখার । জিনিস পত্রও । তাই লোকেরা গুরুত্বপুর্ণ বস্তু সরিয়ে রাখে । একদিন রাতে দাবানল লেগেছিলো । দূরে পাহাড়ে আগুন ! নিকষ কালো রাতে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে এক অপার্থিব আনন্দ হচ্ছিলো যদিও সে জানতো ঐ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে অনেকের স্বপ্ন ।

পরে শুনেছিলো একটি গোটা প্রাইভেট চিড়িয়াখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ঐ দাবানলে । সুরেনদের কিছু হয়নি কারণ দমকল বাহিনী এসে আগুন নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয় । তবুও জায়গাটা খুব সুন্দর বলে একটি মায়া পড়ে গেছে, ছেড়ে যেতে মন চায়না । ড্রিনাও বলে : শহরের দিকে সব সমতল ভূমি । কোনো পাহাড় নেই, উঁচুনিচু নেই, নেই ঢেউয়ের খেলা । বোরিং তাই না ?

গ্রীষ্মকালেই আগুন লাগে বেশি। অনেক সময় কেউ দুষ্টুমি করে সিগার ফেলে গেলে শুকনো পাতা থেকে আগুন ধরে যায় তবে সেরকম ঘটনা কম।

সকালে ড্রিনা বেকফাস্ট বানিয়ে অ্যালেক্সকে ডাকে। সে তখন বাগানে প্রাত:ভ্রমণ সেরে ঘর অভিমুখে। সুরেনের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করে কফ থুথু ফেলে দিয়ে যায় ওর ড্রাইভওয়েতে।

সুরেনের এইসব সহ্য করে অভ্যাস আছে। ভারত থেকে এসেছে কিনা !

লোকের লাথি ঝাঁটা খেয়েই বড় হয়েছে ওখানে যেমন সাধারণ মানুষের হয়।

কাজেই সে নিশ্চুপ। ড্রিনা কয়েকবার প্রতিবাদ করেছে কিন্তু অ্যালেক্স শোনার বান্দা নয়। ও ঘৃণ্য জীবদের কোনো করুণা করতে চায়না।

তাদের টাইট দেবার জন্যই ওর মতন মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে।

যোগ্যতা কি না গায়ের চামড়া সাদা। সুরেন কালো। তাই ও বন জঙ্গলের বন মানুষ। রাজা হলেও গেঁয়ো রাজা। অ্যালেক্সের কাছে। পাড়ার মেয়ে ক্রিস্টিন গেলো হাঙরের পেটে। ওদেরই বাড়ির একটু দূরে তার বাস। ছিলো জন্মদিন। ওদেরকে নেমেতন্ন করেছিলো বার্থডে পার্টিতে। দিনটি ছিলো শুক্রবার। তার আগে দুদিনের জন্য সে গেলো সমুদ্রে সার্ফিং করতে। সমুদ্র প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে। ঐ উপকূলে কোনো দানবীয় জন্তু নেই। আসে না জলচর ভয়ানক কোনো প্রাণী। তবুও কী করে যেন একটি হাঙর চলে এলো সেদিন আর ধরবি তো ধর ক্রিস্টিনকেই ধরলো। বেচারি। বেঘোরে প্রাণটি গেলো। জন্মদিন আর মৃত্যুদিন প্রায় একই লগ্নে পড়ে গেলো। ওর জন্য পাড়ার কমিউনিটি হলে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিলো। সুরেন খুব সোসালি অ্যাকটিভ মানুষ। সাদাদের সাথে খুব মেশে।

সেও গেলো সেখানে। দেখলো অ্যালেক্স এসেছে ড্রিনাকে নিয়ে। ওকে যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করলো। সবার সামনে। এও বললো : হাঙরটা তোর মতন কেলে গুলোকে ধরেনা কেন ? তোকে কোনদিন একা সমুদ্রে পেলে ঠেলে ফেলে দেবো হাঙরের মুখে।

ভীষণ খারাপ লেগেছিলো সুরেনের সেদিন। আরেক প্রতিবেশী মিস্টার হ্যারি রুবিনভ। উনি কাছে এসে মৃদু স্বরে বললেন : অ্যালেক্স ইজ সো রুড ! প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আমি ওর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আসলে ও তো অসুস্থ তাই হয়ত মুডটা সবসময় খিঁচড়ে থাকে।

দিনটা ছিলো শনিবার। সুরেনের এইসব দিনে কাজ থাকেনা। ও বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যায়। এবার গেছে লিলিয়ানক্রস বলে একটি জায়গায়। ওখানে একটি সুন্দর জলাশয় আছে। আর একটি জুতোর মিউজিয়াম। কতরকম জুতো যে জগতে আছে তা জানতে হলে একবার এখানে আসতেই হবে।

ভারতীয় জুতোও আছে।

মনে মনে হাসে সুরেন। ভাবে অ্যালেক্স যদি দেখতো তাহলে নির্ঘাত বলতো :

এই কুকুর তোরা আবার জুতো-ও পরিস্ ? আমি তো ভাবতাম খালি পায়ে কাদা ধূলোর মধ্যে হাঁটিস !

সত্যি ভারতীয়দের যে এরা কী ভাবে ! রাজনীতিবিদ্‌রা হয়ত দেশটার বারোটা বাজিয়েছে কিন্তু কোনকালে কোনোরকম সভ্যতা ছিলো না এ কি বলা যায় ?

আসলে এখানে কিছু কিছু ভারতীয় এসে এত বাজে বাজে সব কাজ করে তাই দেখে দেখে হয়ত ওদের ঘেন্না ধরে গেছে। এইতো একবার সুরেন দোকান থেকে টিভি কিনে আনে। রিমোট মিসিং। কমপ্লেন করতেই ওরা পুরো তদন্ত করলো। এক চাইনিজ বললো : তুমি ভারতীয় তো তাই এত কড়াকড়ি, সাদা চামড়া হলে রিমোট এমনিই দিয়ে দেওয়া হত। আমি তদন্ত না করলে আমার চাকরি যাবে, কিছু মনে করোনা ভাই।

যাক্ সুদূর লা ট্রোব দেশে ইন্দি চিনি ভাই ভাই। সাব কন্টিনেন্টে যতই ঝামেলা হোক না কেন !

জুতো মিউজিয়াম ঘুরে ফিরতে দেরী হয়ে যায়। গত দুদিন টিভিতে নিউজ শোনা হয়নি। রেডিওর নিউজও শোনা হয়নি। ডেরায় পৌঁছতে পৌঁছতে

প্রায় অন্ধকার। রাস্তাঘাট শুনশান নয় আজ। অনেক গাড়ি দেখা গেলো পথে। আর বাতাসে পোড়া গন্ধ। খুব গরম। হাওয়ায় উড়ছে কাঠকুটো।

ভস্মীভূত হয়ে গেছে ঘরবাড়ি সব। কমিউনিটি হল পোড়াকাঠের টুকরো যেন। রাস্তায় দমকল বাহিনী। তবুও বেশিরভাগ ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। আসলে বাড়িগুলি কাঠের তাই আগুন ধরে তাড়াতাড়ি। নাকি দাবানলের সতর্কতা জারি করা হয়েছিলো নিউজে।

সুরেন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছে রাস্তা দিয়ে। স্তুপাকৃতি জঞ্জালে আগুনের রেখা। দাউদাউ করে জ্বলছে অনেক মহীরুহ। আগুন লেগেছে লেগেছে লেগেছে আগুন ! তা সত্ত্বেও আগুন অনেক কন্ট্রোলে।

চিন্তা ছিলো প্ল্যাটিপাসের জন্য। ওকে বেঁধে রাখেনি তবে আটকে রেখেছিলো ওর ঘরে। বেচারার কি অবস্থা সেটাই দেখতে চায়। হয়ত বেঁচে নেই।

সত্যি সে আর নেই। সন্তানশোকে ভেঙে যায় সুরেনের বুক।

ওর বাড়ি পুড়ে ছাই। প্ল্যাটিপাসের ঘরটি যেন ওর চিতা, শেষ শয্যা।

পুড়ে গেছে অ্যালেক্সের বাড়িও। বোঝা যাচ্ছে না ড্রিনা ও সে জীবিত কিনা। ড্রিনার জন্য মনটা কেমন করে ওঠে।

ইন্সুরেন্স কোম্পানি টাকা নিয়ে বেশ হুজ্জোত করেছে। পুরো টাকা দিতে চায়নি। অথচ পলিসি করানোর সময় কত সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছে। সুরেন এখন আছে একটু দূরে হান্টিংহর্স শহরে। ওর এক শুভানুধ্যায়ীর বাড়ি। একদিন শপিং মলে দেখা অ্যালেক্সের সঙ্গে। অবাক হয় সুরেন কারণ এই প্রথম অ্যালেক্স ওকে দেখে হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

একটু দূরে ড্রিনার হাতে প্ল্যাটিপাস ও ওদের কুকুর মার্গারিটা।

অ্যালেক্স বললো : তুমি বেঁচে গেছো দেখে খুবই ভালোলাগছে। আমি প্ল্যাটিপাসকে সঙ্গে নিয়ে আসি। ওকে একা ফেলে রেখে আসতে পারিনি।

ভাবছিলাম মার্গারিটার সাথে ওর ব্রিডিং-টা করাবো।

সুরেন একটু খোঁচা দেয় : ও কিন্তু ভারত থেকে এসেছে, আমার সাথে।

হা হা হা করে হেসে ওঠে অ্যালেক্স। এই প্রথম খোলা মনে, সুরেনের সামনে। একটু দূরে প্ল্যাটিপাস ও মার্গারিটা একে অন্যকে শুঁকে ও চেটে দেখছে হয়ত আসন্ন মিলনপর্বের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কালো পশমের ওড়না

সবুজ গলফ্ কোর্স পেড্রোর সামনে এসে দাঁড়ালো একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

২০১২ সালে যেখানে মানুষ মঙ্গলে বাড়ি কিনতে যাচ্ছে সেখানে গলফ্-এর মতন অভিজাত খেলার খেলোয়াড় আসছেন ঘোড়ার গাড়িতে – সত্যি মজার।

মেয়েটির নাম ভায়োলেট। দেখে মনে হয় ভারতীয়। পরণে কালো পোশাক। মাথায় ও মুখের ওপরে আলতোভাবে থাকে পশমের ওড়না, সেটাও কালো।

সবসময়ই কালো পরেন। সঙ্গে আসেন এক এক্স আর্মি অফিসার। এঁর মুখটা বিকৃত। একটা দিক গলে, পুড়ে গেছে। আফগানিস্তানে কোনো যুদ্ধে গিয়েছিলেন যেখানে বোমার আঘাতে মুখের এই দশা হয়েছে। কনস্ট্রাকটিভ সার্জারি কেন করেন নি কেউ জানেনা। অনেকে অবশ্য বলে উনি ন্যাচেরাল লুককে মেনটেন করতে চান তাই করান নি। বলেন : এ আমার লজ্জা নয়, গৌরব। আমার বীরত্বের সাক্ষী।

আর বান্ধবী তো করায়ত্ত্ব। কাজেই ! ভায়োলেটের এটি দ্বিতীয় সখা, প্রথম স্বামী মৃত। হৃদরোগে। সন্তান হয়নি। বুড়োর আগের পক্ষের ছেলে এই আর্মি অফিসার। এর সাথে ভায়োলেটের আলাপ কোকোডা টেকিং করতে গিয়ে। আহত অস্ট্রেলিয়ান তরুণ যোদ্ধাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে তাদের সাথে সাধারণ ট্রেকারদের হাঁটতে দেওয়া হচ্ছে। বহু মানুষ হেঁটেছেন। হাঁটছেন। এই সৈনিকেরা সবাই আহত হয়েছে আফগানিস্তানে লড়াই করতে গিয়ে। ভায়োলেটও হেঁটেছেন ও সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেছেন এক বিকৃতমুখ সৈন্যকে যে ওর স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর সন্তান। আসলে স্ত্রীর সন্তান বলা বোধহয় ঠিক নয়। জুলিয়ান ওর লাভ চাইল্ড। তবে যেহেতু বিদেশে বিবাহিত আর অবিবাহিত বাবার

মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই তাই স্ত্রীর সন্তানও বলা চলে। এখানে লিভ ইন রিলেশানের মানুষও সম্মান ও সুবিধে পান।

গলফ্‌কোর্সের রেস্তোরাঁর বাটলার পিজি। প্রদীপ ঘোষ। শর্টে পিজি। বাঙালি এই তরুণ এসেছিলো সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে। পৈত্রিক সম্পত্তি ছিলো অঢেল। মাঠ ভর্তি শস্য, গোলা ভর্তি ধান, পুকুর ভর্তি মাছ, বাগান ভর্তি আম-কাঁঠাল। তবুও সেই সম্পত্তির কোনো অংশ পিজিরা পায়নি। কারণ যারা বাইরে থাকতো তাদের কোনো সম্পত্তি দেওয়া হতনা ওদের বাড়িতে। আইনত নয় ব্যাক্তিগত নিয়মে। আজ পর্যন্ত যে বা যারা বাইরে থেকে সম্পত্তি নিতে গেছে সবাই পঙ্গু হয়ে গেছেন অথবা মারা গেছেন। বংশে একের বেশি চিকিৎসক। তারাই ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় তাই বাইরের মানুষ কিছু সন্দেহ করেনা। যদিও এটা আইনি হয়ত নয়। তবুও এই ধনী বংশের এতই শক্তি ও প্রতিপত্তি যে জানলেও কেউ মুখ খোলার সাহস পাবেন না।

পিজির বাবারও একই হাল হয়েছিলো। সাধারণতঃ এরা খাবারে বিষ প্রয়োগ করে। কোনো বিষাক্ত গাছের ফল এনে মিলিয়ে দেয়। কাছেই আছে একটি শ্মশান। সেখানে কিছু তান্ত্রিক থাকেন। তারা অর্থের বিনিময়ে লোকের ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত।

সবকিছু মিলিয়ে বেশ ভয়ানক জায়গা। নিজের বাড়ি হলেও যেন অভিশপ্ত কুটির। তাই যারা প্রবাসী তারা পুজো পার্বণ ব্যাতীত বাড়িতে বড় একটা যায়না।

= = = =

পিজির এখানে বেশ নাম আছে রাঁধুনি হিসেবে। দেশ থেকে এখানে এসেছিলো হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে। তারপর ছোটখাটো কিছু কাজের পরে এই গলফ্‌ কোর্স পেড্রোতে। খ্যাতনামা গলফ্‌ ফটোগ্রাফার গ্যারি লিসবন, যাঁর গলফ্‌ এর ওপরে বেশ কিছু বই আছে এখানে মাঝে মাঝে আসেন। গ্যারি মাটির মানুষ। খুবই মার্জিত ও ভদ্র। এই গলফ্‌ কোর্স পেড্রোতে আছে উঁচুনিচু বনভূমি, জলা, ফুলের ঝাড়। ১৮ গর্তের এই কোর্সে খেলাও হয় নিয়মিত। টুর্নামেন্টও হয়।

শহরের নামী দামী মানুষ আসেন। আসেন দর্শকেরা যাঁরা অভিজাত।

এক একটি স্ট্রাইকে কি করে খেলোয়াড়েরা ডগলেগ ও ডবল ডগলেগে বল পাঠান তা পিজির কাছে বিস্ময়। ও কয়েকবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বেশি কয়দা করতে পারেনি। তাছাড়া গায়ের জোরও লাগে। পিজি একটু রোগা পাতলা। শক্ত সমর্থ নয়। মাদাম ভায়োলেটের সাথে ভালই সখ্যতা। উনি প্রদীপ বলেই ডাকেন কারণ উনি নাকি বাঙালী। আগে নাম ছিলো চারুকলা বসুরায়চৌধুরী। এখানে লোকে চিয়ার্স বলে ক্ষ্যাপাতো। তাই নাম পাল্টে করে নিয়েছেন ভায়োলেট। কোকোড়া থেকে আমদানি করা ছেলে কাম পার্টনার জুলিয়ান পিজিকে খুব একটা পছন্দ করেনা। ভারতীয় বলে হয়ত নয় কারণ ভায়োলেট নিজেই তো ভারতীয়। কী কারণ পিজি জানেনা। ওকে এড়িয়ে চলে।

মনে মনে ভাবে পিজি : ভালই তো, তোমার যা মুখের দশা। দেখলে অন্ধকারে কেন আলোতেও ভয় লাগে। মুখটা সারাও না কেন বাপু ! ভায়োলেট ম্যামের করুণ অবস্থা। কী করে চুমু খান কে জানে।

সত্যি ভয়াবহ মুখখানি। চামড়া কুঁচকে গেছে। দু:খ হয়। হয়ত সৈন্য বলেই এই ক্লাবে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। অবশ্য ওঁর পিতা অত্যন্ত ধনী ও অভিজাত মানুষ। সমাজের উঁচুতলার লোকেদের সাথে ভালই ওঠাবসা। কাজে কাজেই তাঁর দেশসেবক সন্তানকে রোখে কার সাধ্যি ?

= = =

ভায়োলেট হঠাৎ একদিন শ্বাস আটকে মারা গেলেন। সেদিন ছিলো পূর্ণিমা। মুনলাইট সোনাটা ব্যাজ বুকে লাগিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন গলফার পিটার ব্লুকের পার্টনার ডোরা।

ভদ্রমহিলা খেলেন না। সাজসজ্জা দেখাতে আর গপ্পাতে আসেন। গসিপ কুইন। লোকে বলেন।

হেন কোনো সুখবর, দু:সংবাদ ও ন্যাস্টি খবর নেই যা উনি জানেন না বা চর্চা করেন না।

মানুষের নেগেটিভ খুঁচিয়ে বার করে তাই নিয়ে রঙ্গ তামাশা করা যে কোনধরণের ভদ্রতা কে জানে । অথচ সমাজে এরাই ভদ্রলোক বলে পরিচিত । শোনা যায় স্বামীর অবর্তমানে বাড়িতে জিগোলো ডাকেন । এই দেশে না এলে পিজি জানতেই পারতো না যে জগতে কতরকমের মানুষ আছেন । জীবনের এত শেডস্, এত ওঠাপড়া, এত ভাঙাগড়া –সত্যি মনোমুগ্ধকর । প্রতিটি মানুষ ভিন্ন । প্রতিটি এক একটি ইউনিক চরিত্র । পিজির সেরকমই মনে হয় ।

= = =

ভায়োলেটের মৃত্যুতে গলফ্ কোর্সে নেমেছে শোকের ছায়া । তারমধ্যেও গসিপ কুইন ন্যাস্টি রস খুঁজছেন । হাত নাড়িয়ে গ্রীবা বেঁকিয়ে মুখে অদ্ভুত ভঙ্গী এনে বলছেন : নিজের ছেলেকে নিয়ে যে সেক্স করে, বয়ফ্রেন্ড করে সেই মহিলার এরকম পরিণতি হওয়াই উচিৎ । হলই বা তোমার বরের আগের পক্ষের সন্তান তবু আইনমতে তুমি তো মা ।

দেহের ক্ষিদেটাই বড় হল ? পুত্রসম সৈনিকের সাথে যে বয়ফ্রেন্ডের মতন মেলামেশা করে সে কি মানুষ ?

লম্বা লম্বা বাণী দিচ্ছিলেন ডোরা । হানি টিয়ের শুন্য পেয়ালা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন পিজির দিকে । বললেন : তুমিও তো ভারত থেকে এসেছো । ওখানে নাকি লোকে খুব রক্ষণশীল । এই কি এর নমুনা ? নাকি এখানে এসে আমাদের ওপেননেস দেখে তার মিসইউজ করতে তোমাদের মূহুর্ত লাগেনা আর ওখানে মানে ইস্টে গিয়ে বলো যে আমরা সন্তানের সঙ্গেও সেক্স করি ?

পিজি নীরব থাকে তারপরে বলে : সবাই সেরকম নন । দুজন মানুষ একরকম নন কখনই । কাজেই জেনেরাল স্টেটমেন্ট দেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হেসে সরে যায় ।

আজকাল জুলিয়ান মনমরা হয়ে থাকে । ভায়োলেটের অসময়ের মৃত্যু তাকে আঘাত দিয়েছে যথেষ্ট । এত আঘাত হয়ত সে সৌন্দর্য্য হারিয়েও

পায়নি। অবশ্যি সে তো সৈন্য। জীবন মৃত্যু তার পায়ের ভৃত্য। তবুও মানুষ বটে তো।

গলফ্ ক্লাবে পুলিশের আনাগোনা। ডিটেকটিভ কেভিন রাসেল নিয়মিত আসছেন।সঙ্গে পোষা কুকুর মিকি মাউস ও স্যাঙাৎ জেসন গ্যালাপাস।

তদন্ত হচ্ছে। প্রশ্নবানে জর্জরিত মানুষ। সাধারণ কর্মীরা, গলফ্ কার্টের লোকজন, মেনটেনেন্সের মানুষ সবাই যেন একটু বিরক্তও। প্রলম্বিত অধ্যায় দেখে।

তাছাড়া শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেলেও তদন্ত হচ্ছে কারণ মৃতার মুখে একটি অদ্ভুত গন্ধ পান পার্টনার জুলিয়ান। মারা যাবার আগে এই মিষ্টি গন্ধ মুখ থেকে বেরোয়। খাবি খাচ্ছেন তখন ভায়োলেট। কাছেই ছিলেন জুলিয়ান। চেষ্টা করছিলেন শ্বাস – প্রশ্বাস চালু করার।

তখনই গন্ধটা পান। তাদের আর্মিতে এইধরণের একটি উপায়ে শত্রুকে চিরঘুমে পাঠানো হয়। এক ধরণের মার্সি কিলিং। বাইরের লোকেরা খুব একটা জানেনা। একটি অদ্ভুত পোকা পাওয়া যায় টাসমানিয়ার অরণ্যে। সবুজ উজ্জ্বল। ভীষণই ক্ষুদ্র। এই পোকা মানুষ ও অন্যান্য জীবের কণ্ঠনালিতে প্রবেশ করলেই শ্বাস রোধ করে কোনো বিষক্রিয়া ঘটিয়ে। মারা যায় তখনই সেই জীব। আশ্চর্য এই পোকা এতই ছোট যে সাধারণ দৃষ্টির বাইরে। এবং প্রচন্ড ঠান্ডায় কাবু হয়না। একধরণের ব্যাকটেরিয়া আছে যারা আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতেও জীবিত থাকে। এই আজব পোকাও সেরকম। ঠান্ডা এদের কাবু করতে পারেনা। কী করে এই পোকা এলো এখানে ও প্রবেশ করলো ভায়োলেটের দেহে তাই নিয়েই তদন্ত চলছে। ময়না তদন্তে ঐ পোকা যার পোশাকি নাম ফাস্মা তাকে ট্রেস করা হয়েছে। ক্ষুদে ফাস্মা জ্বল জ্বল করছে মৃতার ফুসফুসে। সুগন্ধী ফাস্মা নিশ্বাসে সুবাস বয়ে আনে। তাই ঐ গন্ধ পেয়েছিলেন জুলিয়ান। যেহেতু আর্মি ম্যান তাই দুয়ে দুয়ে চার করতে সময় লাগেনি। খুন কেন ও মোটিভ কি তা এখনও রহস্যাবৃত। হয়ত চিরাচরিত সম্পত্তি। অর্থই অনর্থম। জুলিয়ানের পিতা ছিলেন অত্যন্ত ধনী। ক্রিমিন্যালদের যখন এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বদলী করা হয় অর্থাৎ অন্য জেলে তখন তাদের ভ্যানের দরজার সিকিউরিটি অর্থাৎ লক তৈরি করতো

জুলিয়ানের পিতার কোম্পানি । বেশ নামী কোম্পানি । শেয়ার বাজারে কেউকেটা ।

প্রতিপক্ষ যিনিই হোন তিনি অত্যন্ত চালাক ও ধূর্ত । তবে পোকা যোগাড় হল কীভাবে কেউ জানেনা । কেভিনের শাণিত প্রশ্নবাণে খুব শীঘ্রই ধরা পড়বেন আততায়ী বলেই লোকে মনে করছেন । তাছাড়া পুলিশের আনাগোনায় স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে বলে সবাই চাইছেন তদন্ত শেষ হোক । খুলে যাক অনাহুত মুখোশ ।

= = =

কালো পশমের ওড়না কোনদিন বদলান নি । রোজই ওটা মুখে দেখা যেতো । অথচ সেই বহু রক্ষিত মুখই হল মৃত্যুর কারণ ।

-হা হা হা -- খোলামনে হাসতে হাসতে এলেন মিস্টার জনি । দেখতে কার্টুনের মতন তবে সিনসিয়ার কর্মী, আদতে ক্যাডি । ক্যাডির কাজ হল খেলোয়াড়কে খেলার ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া অনেকটা কৌন বনেগা কড়োড়পতি স্টাইলের ফোন আ ফ্রেন্ডের মতন । এরা খেলোয়াড়ের খেলার জিনিস বহন করে ও ম্যানেজও করে । অন্য খেলোয়াড়কে উপদেশ দিতে অক্ষম । খেলার আইন এমনই বলে ।

বাটলার পিজির দিকে ভিকট্রি ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন মাঠের অন্য প্রান্তরে মিস্টার জনি । কেন ? শোনা যাচ্ছে খুনি ধরা পড়েছে । কিন্তু নাম ঘোষণা হবে সন্ধ্যায় । পুলিশ কাস্টডিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে । যাতে পালাতে না পারেন তাই পুলিশ প্রহরা বসেছে পেড্রোতে ।

ভায়োলেট ওরফে চারুকলাকে বেশ পছন্দ করতো পিজি । নিজের দিদির মতন । তাই তো সেও ভেঙে পড়েছে । ভিকট্রি দেখে হাসলো । হাসলো কার্টুন জনিও ।

সবসময় অ্যাব অরিজিন ভাষায় জনি গান করেন । কী মাথা মুন্ডু কিছুই বোঝেনা পিজি তবে সুরটা ভালো । ব্যাঞ্জো ধরণের কী একটা সাথে নিয়েও ঘোরে । মাঝে মাঝে । ভালো পরামর্শ দাতাও ।

-অবসর সময় কাটাও কীভাবে ? জানতে চাইতেন ভায়োলেট ।

পিজি বলে : বই পড়ে। লাইব্রেরি থেকে প্রচুর বই এনে পড়ি। নতুন বইয়ের গন্ধ দারুণ লাগে।

- –তোমার পার্টনার নেই কোনো ?
- নাহ্। একজন ছিলো কলেজ জীবনে। এখন কেউ নেই।

আসলে পিজি মাঝে মাঝে ব্রোথেলে যায়। অনেক ভারতীয় যুবাই নিয়মিত যায়। এখানে এগুলি বেআইনি নয় আর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

ভায়োলেটকে কিছু বলেনি। বলেছে : আমি রাশিতে পাইসিজ (মীনরাশি)। তাই আমার নারীসঙ্গ লিপ্সু হবার চ্যান্স কম।

হরিণচোখো মেয়ে ভায়োলেট চোখ বড় বড় করে বলেছে : ও রিয়েলি ? আই কান্ট বিলিভ ! আ হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান লাইক ইউ, হু প্রিপেয়ার্স নাইস ডিসেস্ ইজ আ ব্যাচেলার।

আর ইউ কিডিং ? ডু ইউ বিলিভ ইন অল দোজ বুলশিট, র‍্যাশি অ্যান্ড অল ? মানুষ ক্ষমতা ও কাজ দিয়ে এগোয়। ভাগ্য দিয়ে নয়। আই থিংক ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট বলিউড মুভি : হোয়াটস্ ইওর র‍্যাশি ?

- হা হা হা, হাসিতে কেঁপে ওঠে পেড্রোর সবুজ বনভুমি।

পিজি আজ প্রাণ খুলে হাসছে। রাশিচক্র, ভাগ্য এইসব কথাগুলো শুনে। তার প্রতিভাবান ও ভালোমানুষ বাবাকে এক পয়সাও দেয়নি তার বাড়ির লোকেরা। প্রায় কপর্দক শুন্য হয়ে রিক্শা চালিয়ে জীবনধারণ করেছেন প্রথম দিকে অত বড় বংশের সন্তান। পরেরদিকে বিষপ্রয়োগে শরীর হয়ে গিয়েছিলো রক্ত শুন্য। চিকিৎসকরা অন্ধকারে। কোনো কারণ খুঁজে পাননি। আর মেজো জ্যাঠা, ফুলকাকা, পিয়াল, ন-মা, ন-পিসি সবাই এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যারা বাইরে থাকতেন। তার একমাত্র কারণ ভায়োলেটের বাবা। উনিই এই বিষ ঢুকিয়েছিলেন বংশে। এক এক করে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সমস্ত সম্পত্তি নিয়েছেন আর যারা ওখানে থাকতেন তাদের রুটির টুকরো ছুঁড়ে দেবার মতন কিছু দিয়েছেন, হয়ত মুখ বন্ধ রাখার জন্য। বেড়িয়েছেন সারা দুনিয়া সেইকালে। এত পয়সা পেলেন কোথায় ? ছেলেমেয়েদের বিদেশে

পড়িয়েছেন । মেয়েরা তো পায়ে ইতালীয় অলিভ ওয়েল মাখতো, খোদ ইতালি থেকে আনা, পায়ের নখেও লাগাতো ।

সবই অন্যের ভাগ থেকে নেওয়া ।

এই ভায়োলেটের ম্যারেজ রিং কিনতেই তো তার বাবা সোজা উড়ে যান ইংল্যান্ডের হ্যারডস্-এ । আগে জানতো না পিজি । যেদিন শুনলো ভায়োলেট ম্যাম তারই বংশের মানুষ ও সেই মানুষ যাদেরকে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে, আক্রোশে অন্ধ হয়ে যায় । চারুকলা নামটিও পরে জেনেছিলো । জেনেছিলো যে চারুকলা আদতে ঘোষ । বসু রায় চৌধুরী তার আগের স্বামীর পদবী । ভারতে থাকতে যে তার আরেকবার বিয়ে হয়েছিলো সেটা লুকিয়ে সে এইদেশে এসেছে । আনম্যারেড্ দেখিয়ে । আগে সে ছিলো সত্যি নিজের দিদির মতন । আর এখন ?

পিজি প্রথম দিকে কাজ করতো একটি কাফের গ্যাস্ট্রোচিফ হিসেবে । সেই কাফের মালিক একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক । যিনি আর্মিতে বহুদিন ছিলেন পরে অবসর নিয়ে ব্যবসা খোলেন টাসমানিয়াতে । হোবার্ট শহরে । রাতেরবেলা কাফে বন্ধ হয়ে গেলে মালিক বহু অজানা জিনিস ও গল্প শোনাতেন পিজিকে । পিজিরও একাকীত্ব কাটতো । সেখানেই প্রথম শোনে এই আজব পোকার কথা । তখন অবশ্যি কাউকে পরপাড়ে পাঠাবার কথা মনে আসেনি । জানতে পারে কোন অরণ্যে পাওয়া যায় এই পোকা ও কীভাবে সংগ্রহ করতে হয় । একটি নেট জাতীয় কিছুতে তারপিন তেল লাগিয়ে মেলে ধরলে এই পোকা নিমেষের মধ্যে নেটে এসে আটকে যায় । ক্ষুদ্র এই পোকা শীতল আবহাওয়ায় বেঁচে থাকে দিব্যি । অ্যাব অরিজিন মানুষের আবিষ্কার এই অভিনব পোকা । ওরা বলে গোরাংগোরি । বিজ্ঞান বলে ফাস্মা ।

প্রয়োগ পদ্ধতিও অদ্ভুত । কোকোকোলার গেলাসে বরফ দেবার সময় বরফের মধ্যে করে এই পোকা পাচার করে পিজি । জলের মধ্যে আগেই এই পোকা দিয়ে বরফ করে রেখেছিলো । সেই পোকা খাবার সাথে অর্থাৎ কোকোকোলার সাথে চলে যায় দেহের অন্দরে । তারপরেই খেল দেখায় । একটিই ক্লু রেখে যায়, তা হল ঐ সুগন্ধ । সেও না জানলে বোঝা মুস্কিল । জুলিয়ান জানতেন তাই ধরা পড়ে গেলো পিজি ।

পোকাটা নাহয় ময়না তদন্তে ধরা পড়েছে কিন্তু পিজি-ই যে দোষী সে কে বললে ?

পুলিশ তো কোনরকম সন্দেহ করেনি বা ক্রস করেনি । এনকোয়ারি করেনি ! তাহলে??

একটি পাখি যে সদা সত্য বলে । লায়ার বার্ড নাম তার । অস্ট্রেলিয়ার নেটিভ পাখি । অপূর্ব পুচ্ছ বিশিষ্ট এই পাখি যেকোনো শব্দ হুবুহু নকল করতে পারে । শুধু তাকে একবার শুনতে হবে । বাড়ির ঢালাইয়ের শব্দ, গান, কান্না, কুকুরের ডাক ও যেকোনো আওয়াজ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কপি করতে পারে । নাম লায়ার হলেও তাই সে সদা সত্যি বলে । এই অতিমানবীয় ক্ষমতাধারী পক্ষীটিই দিয়েছে সত্যের হদিস ।

হারিয়ে গিয়েছিলো ভায়োলেটের কালো পশমের ওড়না । স্মৃতির মণিকোঠায় থাকলেও ওড়নাটি দেখে ভায়োলেটকে ছোঁয়া যাবে এই মনে করে খুঁজতে থাকেন জুলিয়ান । গলফ্‌কোর্সের পেছন দিকে জলার ধারে ওড়নাটি পায় । আটকে আছে একটি বড় গাছের রিক্ত ডালে । কালো ওড়না । যা সহজে খুলতেন না ভায়োলেট । যক্ষের ধনের মতন আগলে রাখতেন । ঠিক তখনই পাখিটি ডেকে ওঠে বনের আড়াল থেকে । অবিকল পিজির গলায় বলে ওঠে ইংলিশে : ওরে ভায়োলেট তোমাকে ফাস্‌মা দিয়ে খুন করবো আমি, সমস্ত অবিচারের বদলা নেবো তোমার বাবার । আমাদের ভাগ কেড়ে আমাদের ভিখারি করে নিজের ছেলেমেয়েদের রাজকীয়ভাবে মানুষ করা আমি সহ্য করবো না । কেউ টেরই পাবেনা কিভাবে খুন হল ! এ এমন আশ্চর্য পোকা ! যেই ভায়োলেটকে আমি চিনতাম সে আমার নিজের দিদি নাহলেও ছিলো দিদির মতন । আজ যেই ভায়োলেটকে চিনলাম সে নিজের রক্ত হলেও পর । আমি তোমাদের ক্ষমা করতে অক্ষম । আমি এক সাধারণ মানুষ । আমি যোগীপুরুষ নই !

এতটা কথা পাখিটি নিঁখুত বলে গেলো । এক নাগাড়ে । তারপর থেমে গেলো । এবার গান গাইছে । মনে হয় সেই অ্যাব অরিজিন গানখানি যা ক্যাডি কার্টুন জনি গায় ।

টিব্বা টিব্বা হোরাং হুলা -- করে আবার ব্যাঞ্জোর বাজনাটিও মুখ দিকে অনুকরণ করে শোনাচ্ছে পাখিটি। সত্যের কারবারি লায়ার (LYRE) বার্ড।

চিরটাকালই পিজিকে অপছন্দ করতো জুলিয়ান। কেন জানিনা ওর চোখের দৃষ্টিতে একটা অস্বচ্ছ ভাব দেখতে পেতো। ক্রুর ভাব। হাবভাব সরলসোজা হলেও।

তাছাড়া যে ব্যাক্তি, লোকের চোখের অন্তরালে গাছের সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি ছিঁড়ে বিনাকারণে পিষে ফেলে সে তো অন্যধরণের মানুষ।

ভায়োলেটকে বলেওছিলো।

শুনে সে বলে : হ্যাঁ ও খুব আজব ছেলে। ওর কোনো পার্টনার নেই। হয়ত ফ্রাস্ট্রেশানে এরকম করছে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। ছেলেটির রান্নার হাত বেশ। জুলিয়ান আর কথা বাড়ায় নি। তবে এড়িয়ে চলতো।

তার বিকৃত মুখের আড়ালে যে আয়নার মতন মন ছিলো তাই দিয়েই হয়ত স্পর্শ করতে পেরেছিলো পিজির কুৎসিত ঐ ছবি। যেন পিজি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করছে : বলতো আয়না দুনিয়ায় সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে ?

মৃদু হাসে জুলিয়ান। আজই সন্ধ্যায় ধরা পড়বে। পুলিশ অর্থাৎ ডিটেকটিভ কেভিন আজই সর্ব সমক্ষে ঘোষণা করবেন খুনির নাম। কথাগুলি শুনেছিলো পাখিটি হয়ত গলফ্‌কোর্সের কোনো কোণায়। হয়ত একা একা এইসব প্ল্যান ভাজছিলো পিজি। জোরে জোরে বলে গায়ের ঝাল মেটাচ্ছিলো।

আজ সন্ধ্যায় সরব পার্টি। মুখোশ নৃত্যের আয়োজন করেছেন কর্তৃপক্ষ, গলফ- কোর্স পেড্রোতে। গাঢ় রহস্যময় সন্ধ্যা। মেঘের ভৌতিক আনাগোনা ছায়া ফেলে চলেছে অপ্রাকৃত অবয়বের। হলে আজ প্রায় সবাই হাজির। সবার মুখে মুখোশ। কেউ ক্লাউন তো কেউ বাঘ তো কেউ ভূতনী। কার মুখোশ খুলে যাবে, বেরিয়ে আসবে দাঁত নখ কেউ জানেনা।

নাচ শুরু হল । কেভিন হাজির শাগরেদ্ জেসন ও সারমেয় মিকি মাউসকে নিয়ে । এই কুকুরেরা অবসর গ্রহণের পরে ওদের মেসে চলে যায় । দিব্বি আরামে বাকি জীবন খেয়েদেয়ে কাটায় ও মাসে মাসে পেনশান পায় । মিকিও খুবই উত্তেজিত । দেখেই বোঝা গেলো ।

উত্তাল পার্টিতে সবাই ব্যস্ত । তবুও মনের কোণায় আষাঢ়ের মেঘ । কি জানি কি হয় ! এমন সময় ক্যাডি জনি হুড়মুড় করে এসে ঘরে ঢুকলো । হাতে সেই ব্যাঞ্জো কিন্তু মুখে নেই মুখোশ । মুখ ফ্যাকাসে ।

সবাই কৌতুহলি বিশেষ করে কেভিনরা ।

জানা গেলো হঠাৎ শ্বাস আটকে মারা গেছে পিজি তার নিজের ছোট কেবিনে । অর্থাৎ খুনি পার্টির বাইরে । সবাই হতবাক । অবাক হলেন না কেভিন, জেসন ও জুলিয়ান। হয়ত এই পরিণতি ওদের কাছে অপ্রত্যাশিত নয় ।

এখানে বর্ণিত ফাস্‌মা কীটের সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই । আগ্নেয়গিরিতে ব্যাকটেরিয়া জীবিত থাকে এগুলি সবই কাল্পনিক ।

The Lyrebird is the world's best impersonator. It can mimic the sound and songs of other birds perfectly but its talent does not stop there. It is also known to have imitated sounds of chainsaws, dogs barking, babies crying, musical instruments and explosions.

Did you know: The Lyrebird's beautiful tail can be found on the reverse of the 10 cent Australian coin.

A Lyrebird is either of two species of ground-dwelling Australian birds, that form the genus, *Menura*, and the family Menuridae. They are most notable for their superb ability to mimic natural and artificial sounds from their environment. Lyrebirds have unique plumes of neutral coloured tailfeathers.

Lyrebirds are among Australia's best-known native birds. As well as their extraordinary mimicking ability, lyrebirds are notable because of the striking beauty of the male bird's huge tail when it is fanned out in display; and also because of their courtship display.INFO WIKIPEDIA

Watch Video---

http://www.youtube.com/watch?v=VjE0Kdfos4Y

টনি ট্যাং

গাড়ির রিয়ার ভিউতে দৃশ্য দেখে টনি ট্যাং । সামনের রাস্তা, সবুজাভা, নীলাভ কিছুই দেখেনা । এমনই আজব মানুষ । দেখে পিছনে ফেলে আসা চিত্র ।

উডএন্ডের দিকে একটি পাবে গান বাজায় । লম্বা চুল, পরণে মলিন জিন্স ও ঢোলা গেঞ্জি । হাতে চুরি, সোনার । কানে রূপার মাকরি । মুখে হাসি । গলায় সুর । মাথায় ঈষৎ বরফ পড়েছে । বয়স আন্দাজ করা যায়না তবুও যেন অস্তমিত প্রায় ।

গীটার হাতে নিয়ে এগিয়ে চলে বাকি জীবন পথে টনি ট্যাং ।

দেখে মনে হয়না চীনা । বরং ভারতীয় ছাপ মুখে । জানা গেলো সে আদতে বিহারি । আসল নাম ডাগা ।

সেদিন ছিলো অ্যানজাক ডে । আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম । কফি খেতে খেতে তোমায় দেখি টনি ট্যাং ।

মিষ্টি রোদ্দুরে সে বসে ছিলো এক কাপ কফি নিয়ে একটু দূরে, গীটারের সুর শেষে । বড় ম্যাপেল গাছটায় সোনালি পাতা । কমলা পাতা । নিচে টনি ট্যাং ।

আমিই যেচে আলাপ করলাম ।

খুব হাসলো । বললো : আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে ? কে বললো আমার জীবনে গল্প আছে ?

বললাম : আমি গল্পকার । চরিত্র চিনি ।

সবুজ ঘাসে পা ডুবিয়ে বসে আমি । টনির কুকুর ফিলোমেনা ।

আদর করছে মালিককে । আমি কফিপানে ব্যস্ত ।

এই নিয়ে মোট পাঁচবার হল। গল্প শুরু করেও শেষ হলনা। প্রতিবারই টনি আরম্ভ করে আর ফিলোমেনার আদরে ডুবে হারিয়ে যায়। আমি ঘ্যানর ঘ্যান করতেই থাকি।

স্বামী বলেন : এর জীবনে সত্যি কোনো ইন্টেরেস্টিং ঘটনা আছে তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন ?

বলি : জানিনা। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে যে কিছু একটা জানা যাবে।

গলাটা ঝেড়ে আবার শুরু করলো টনি ----

বিহারের গন্ডগ্রামে জন্ম তার। বেতিয়ার দিকে। ঝুপড়ি তে বাস। আধবেলা খেতে পাওয়া।

বাবা মায়ের কাজ ছিলো লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মলের হাঁড়ি সংগ্রহ করে গাড়িতে তুলে সাফ করে ফেরৎ দিয়ে আসা। বংশ পরম্পরায় এইকাজই করেছে সবাই। হতদরিদ্র পরিবেশে, আধময়লা পোশাক পরেই কেটেছে জীবন।

লোকের মল মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই দু:খজনক। লজ্জাকরও বটে। সমাজের লজ্জা। মনুষত্ব্যের লজ্জা। টনি ট্যাং ঐ পরিবেশে বড় হোক তার বাবা চাননি।

মূর্খ মানুষটি দেখেছেন তার পুত্রের সৃজনী শক্তি আছে। ভালো গান করে দরাজ গলায়। এর বেশি কিছু বোঝেননি।

চোখে একটি ঝিলিক এলো টনির। বললো : বাউ (বাবাকে এই বলতো সে) আমাকে বেচে দিলেন। শহরের এক বাবুর গ্রামের বাড়ি ছিলো ওদের ওখানে। সেখানে ছিলো কাঁচা শৌচাগার। মলের মালসা মাথায় নিয়ে যেতেন টনির পিতা। কথায় কথায় জানতে পারলেন যে বাবুর এক পরিচিত টাকার বিনিময়ে একটি সন্তান দত্তক নেবেন।

কলকাতা থেকে এসেছেন। চীনা দম্পতি। চায়না টাউনের ওদিকে বাসা।

চামড়ার কাজে পারদর্শী। টনির বাউ ওকে বেচে দিলেন।

চীনা দম্পতি ওকে নতুন নামে নিয়ে নিলেন। একটু বড় করে আবার বেচে দিলেন আরব দেশে। টনি জানতে পারলো এই দম্পতির এটাই ব্যবসা। হতদরিদ্র বাচ্চাকে অল্পদামে কিনে অথবা ধরে আনে। তারপর বয়স অনুসারে বিক্রি করে দেয় বিদেশে। কোথাও হাত পা কেটে ভিখারি করা হয়, কোথাও শিশু শ্রমিক, কখনো পেদোফাইলদের বেচে দেওয়া হয় আবার কোথাও চরবৃত্তিতে লাগানো হয়।

চালান হবার আগে এই দম্পতি মোটা টাকা পান।

রোদ্দুরে ধূসর আভা। হয়ত বৃষ্টি হবে। টনির চোখে বাদামী কুয়াশ। বোধহয় কয়েক ফোঁটা জল। আমিও কাঁদি। অল্পেই আমার চোখে জল আসে।

আমার স্বামীও আজ নীরব শ্রোতা।

চায়ের শুন্য পেয়ালা ভরে দিয়ে গেলেন সাদা সুন্দরী লিন্ডা। খাটো স্কার্ট, বিভাজিকায় রঙীন আলো।

–হা হা হা হেসে উঠলো টনি হঠাৎ।

তারপর বললো : একটা গান শুনবে ?

- কী গান ?
- পিট সিগারের, জীবনের গান।
- শুনি, শোনাও,শুনবো।

যে গান শোনালো তা পিট সিগারের বলে মনে হলনা। খুলে বললাম। তখন সে বললো যে পিট সিগার হলে এরকমই গাইতেন।

আরবে চালান করার পরে সে একবার দেশে এসেছিলো।

শেখের কবজা থেকে বেরিয়ে। বললো : মেয়েদেরও ওখানে দাবিয়ে রাখা হয়।

টনিকে লোহার রড দিয়ে মেরেছে। গরম শিক পায়ুতে প্রবেশ করিয়েছে। হাত পায়ে আঘাত করেছে। খেতে দিতো না। অসুস্থ হলে মারতো। দিনে ২২ ঘন্টা কাজ করাতো। বয়স কতই বা ? মাত্র ১২ !!

টনি একদিন সুযোগ বুঝে পালালো।

নৃশংস এই ভুবনে সে আর থাকবে না।

চলে এলো সোজা ভারতে। একটি মাল বোঝাই জাহাজে চড়ে। নামলো গুজরাটে। সেখান থেকে উত্তর প্রদেশ।

- আমি পথের ধারে শুয়ে কাটাতাম। দোকানী হয়ত দয়া পরবশ হয়ে কিছু দিতো তাই খেতাম। আর গাইতাম। নাটক করতাম। ভিখারি বাচ্চাদের নিয়ে।

সবাই মিলে গাইতাম : উই শ্যাল ওভারকাম সামডে।

পথনাটিকা। অনেক পথনাটিকা করেছি। অনেক। মানুষের দু:খ নিয়ে, রিয়েল লাইফ নিয়ে। আমার অক্ষর জ্ঞান ঐ চীনা ঘরেই। তাই লিখতে পড়তে পারতাম।

ডাগা শিক্ষিত নাহলেও আনপড় নয় !

হেসে উঠি আমরা সম:স্বরে।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝিরি ঝিরি শব্দে ঝরছে এখানে শ্রাবণ মেঘ।

উডএন্ড মায়াময়। অদ্ভুত লাগছে চারিপাশ। একটা মৌতাতে মেতে উঠেছে যেন।

টনির চোখে মায়াবী আবেশ।

- উত্তর প্রদেশ থেকে সোজা অস্ট্রেলিয়া ??

  প্রশ্নটা করি সাবধানে।

- নাহ্ নাহ্ ! জোরে জোরে ঘাড় নাড়তে থাকে আধা চীনা মানুষটি।

আমি নাটকের দলে ডাক পাই। মাইনে সামান্য। খেতে পরতে দিতো। গ্রিন রুমের পেছনে শুতে পেতাম।

আমার নাটক বাজারে খুব খেলো । অভিনেতা / অভিনেত্রী কে অনেক স্বাধীনতা দিতাম । ওরা পরিস্থিতি অনুসারে ডায়লগ বলতো । কিছু শেখানো হতনা ।

যারা ট্যালেন্টেড তারা ভালই পারতো । অন্যরা পারতো না । তাদের ট্রেনিং দিতাম । যেন রিয়ল লাইফ ডায়লগ । তোমার প্রশ্নের কী জবাব হবে আমি কি মুখস্থ করে এসেছি নাকি ??

বলে হাসলো আবার । টনি খুব হাসে ।

আবার গান ধরলো । এবার মহম্মদ রফি । ওকে ফিলোসফিক্যাল লাগছে ।

হঠাৎ ভীষণ নীরব হয়ে গেলো ।

তারপর বললো : আমি এখানেও মানে এইদেশে আগে একটি ক্যারাভান নিয়ে ঘুরতাম । তাতে নাটকের দল থাকতো । ছোট লেপ তোষক নিয়ে ওতেই শুতাম । ম্যাকডোনাল্ড্সে খেতাম বার্গার, ফ্রেঞ্চ থুড়ি ক্যানসার ফ্রাইস । পার্মিশান নিয়ে নাটক করতাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে । প্রশংসা পেতাম । ভালো পয়সাও । লোকে খুশি হয়ে দিতো । কোনো টিকিট সিস্টেম ছিলো না তবুও দিতো । বিদেশে লোকে এখনো খুব সৎ ।

- পিৎজা খাবেন ? সুন্দরী লিন্ডা জানতে চায় ।

ক্ষিদে পেয়েছিলো খুব । সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম । টনিও নিলো একটা । ভেজ পিৎজা । বললো : আজকাল ভেজই বেশি খায় ।

অস্ট্রেলিয়ায় আসা এক এইদেশী মেয়েকে বিবাহ করে । সে ট্রেকিং করতে গিয়েছিলো কুমায়ুন / গাড়োয়াল এইসব দিকে । টণিকে ভালো লেগে যায় ।

ওরা একসঙ্গে ড্রাগ্স্ নিতো ।

অত:পরে বিবাহ ।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম : আচ্ছা ইউফোরিয়া যে হয়, ভালো লাগে ?

বললো : খুব ভালো লাগে ।

বললাম : এই মারিজুয়ানা –একে আসলে কী বলে ? মারিয়ানা নাকি মারিহুয়ানা নাকি মারিজুয়ানা ?

টনির মুখে অদ্ভুত রহস্য । বলে ওঠে : তখন এত ইউফোরিক লাগে যে যা ইচ্ছেই বলা যায় । নারকোটিক প্রেমীরা ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না ওগুলো তোমাদের আর্বান ইন্তেলেকচুয়ালদের সমস্যা । জীবন পুঁথি নয় । জীবন নাটক । আর আমি নাটকে ডায়লগ লিখিনা ।

মেয়েটির নাম কাইলি । পিওর অস্ট্রেলিয়ান নাম । কাইলি ওকে বিয়ে করে এইদেশে নিয়ে আসে ।

- আমার প্রথম প্রেম । আমি ওকে সত্যি ভালোবেসে ছিলাম । ও ভালোবেসে ছিলো নাহলে আমাকে বিয়ে করবে কেন ? সরল আঁখির প্রশ্ন ।
- তারপর ? গল্পের সন্ধানে গল্পকার ।
- ওর সাথে কয়েক বছর ছিলাম । ও আমাকে এখানে ক্রিয়েটিভ আর্টসের স্কুলে ভর্তি করালো। ট্রেনিং নিলাম । অনেক কিছু শিখলাম । আমি প্র্যাকটিক্যাল কাজে বিশ্বাসী । তাই প্রথমে অনেক সাধারণ কাজ করেছি । পাবের দেওয়ালে ছবি এঁকেছি । স্ট্রি সিঙ্গার হয়েছি । লোকের ফিউনারালে বাজিয়েছি । তারপরে কাল্চারাল সেন্টারে নাটক করেছি । প্রশংসিত হয়েছিলো নাটক । জ্যোতিষ মানো ?
- হ্যাঁ, আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর ।
- কেতুর মহাদশা শেষ হল আমার । সঙ্গে শনির দশা । ভালো রোজগার । মাটির নিচে জমি । কিন্তু কাইলির সাথে বিচ্ছেদ হয়ে গেলো ।
- কেন ? আমি কৌতুহলি ।
- ও জরায়ুর ক্যানসারে আক্রান্ত হল । জরায়ু বাদ দিতে হল । আমাকে ছেড়ে দিলো । বললো :তোমার লাইফ আমি নষ্ট করতে পারবো না ।

ওকে আমি অনেক বোঝাই । ও বলে : আজ আবেগের বশে এসব বলছো । পরে অনুতাপ হবে । অথবা আমার সাথে থাকতে পারো কিন্তু নিয়মিত ব্রথেলে যেও । কামনার অন্ত হবে । দেহ জুড়াবে । দেহ বাদ দিয়ে প্রেম হয়

নাকি ? প্রেম মানেই তো সেক্স ----পাশ্চাত্য কনসেপ্ট । এইভাবে ও সরে গেলো আমার জীবন থেকে ।

বাইরে আবার রোদ উঠেছে । আবহাওয়া আজব । কখনো বৃষ্টি কখনো সোনা গলা রোদ । চিকন রোদ ।

- আরো কিছু দেবো নাকি ? এনি থিং এল্‌স ?? লিন্ডা জানতে চায় ।

আমি নাহ্‌ বলি মিষ্টি হেসে ।

কফির পেয়ালাগুলো নিয়ে গেল সে ।

একটি শিশু বাইরে স্ট্রবেরি গুচ্ছ নিয়ে ছোটাছুটি করছে । সেদিকে চেয়ে টনি বলে ওঠে : ওরা কত ভাগ্যবান । আমি এই বয়সটা মিস করেছি । অবশ্য গ্রামে থাকলে হয়ত অপরের বিষ্ঠা নিয়ে ঘুরতে হত এই বয়সে ।

সত্যিই আমরা কত লাকি, মনে মনে ভাবি ।

- এরপরে আমার জীবনে এলো জাহারা । ও সুদানের মেয়ে । কুচকুচে কালো ।

অথচ চামড়ায় একটি সতেজতা ছিলো । মুখটিও ভারি মিষ্টি ।

কাজ করতো লাইব্রেরিতে । বই পত্তর গোছাতো । আমার সাথে আলাপ একটি বুক শপে । ওখানে আমি একাঙ্ক নাটক করছিলাম । ওর আমাকে ভালোলাগে । আমরা লিভ ইনে যাই । মেজার ডিসিশান । কাইলির সাথে যোগাযোগ ছিলো । ও এখন থাকে এক চিকিৎসকের সাথে । বৃদ্ধ মানুষ । একা । কাইলিকে ভালোবেসেছে । আমি মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি খেতে যাই । বুড়োর জন্য আই পড, সিডি প্লেয়ার নিয়ে যাই । নানান কম্পিউটার গেমস্‌ ও নিয়ে যাই । কাইলি ভালো আছে ।

কেচ্ছা হল জাহারাকে নিয়ে । ও কিছুদিন পরে আমাকে ছেড়ে দিলো । আমাদের একটি মেয়ে হয়েছিলো, যোশিকা নাম রেখেছিলাম । আমি তখন ক্রিয়েটিভ কাজ নিয়ে অ্যাডেলেডে । টেলিভিশানে কাজ করতাম । পয়সাও ভালই আসতো ।

জাহারা আমাকে হুমকি দিলো যে নিয়মিত মোটা টাকা না দিলে ও আমাকে মিথ্যা অপবাদে ফাঁসিয়ে দেবে। যোশিকাকে নিয়ে ও অন্যত্র চলে গেলো। আমিও টাকা দিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু এইভাবে কতদিন ? ও দাবী বাড়িয়ে যেতে লাগলো। জানতে পারলাম এখানে এরকম একটি ক্লাস আছে যারা কোনো কাজ করেনা সরকারের ভাতায় খায় আর স্বচ্ছল পুরুষদের বিয়ে করে ব্ল্যাক মেইল করা আরম্ভ করে।

বাতাসে হিমের গন্ধ। আসন্ন শীতের আশায় পা ছড়িয়ে বসে আছে পাইন গাছ। হয়ত বরফের দিকে চেয়ে আছে। নীল রংয়ের একটি ফুলের সাইজ খুব বড়। কী ফুল এটি ?

টনি জিজ্ঞেস করলাম।

- জানিনা। মৃদু স্বরে ভেসে এলো উত্তর। ও একটু দূরে হাতে সিগার। সুখটান দিলো।

তারপর বললো : একদিন জাহারা আমার বাড়িতে এলো। চারতলার ব্যালকনি থেকে আমাদের মেয়েকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিলো আমার সামনে। যোশিকাকে হারালাম চিরতরে।

টনির মুখে করুণ অভিব্যাক্তি। চোখে জল।

গলা পরিষ্কার করে বললো জাহারা পুলিশকে বললো : হাত থেকে পিছলে পড়ে গেছে।

কারণটা অবশ্যই আমার ওর দাবী মতন বেশি অর্থ না দেওয়া। এমব্যাসীতে ফোন করে বলে দিলো : আমি ওকে মারি। টর্চার করি। আমি অতি নীচ ও জঘন্য মানুষ। আমার জন্যে ও ডিপ্রেশানে চলে যাচ্ছে। আমি কাউকে মারতে পারিনা। কৈশোরে এত মার খেয়েছি যে আমি কারো গায়ে হাত তুলতেই পারিনা। আমার মন খুব নরম। আমি গায়ক, শিল্পী। আই অ্যাম আর্টিস্ট।

পুলিশ আমাকে খুঁজছিলো। অনেকদিন আমি একটি হিন্দু আশ্রমে গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম। ওখানে নম:শুদ্র মেথরের ঘরের ছেলে আমি পুরোহিত সেজে পুজো করতাম। ভক্তের দল আমার হাতেই পুজো নিতো।

এইভাবে বছর খানেক কাটার পর সরকার বদল হল। আমি আবার ফিরে এলাম সমাজের বুকে। এখানে এসে পাবে গান গাইতে লাগলাম।

জাহারা কোথায় আমি জানিনা। ওকে আমি আর দেখিনি। এখন মাঝে মাঝে আমার প্রথম প্রেম কাইলির কাছে যাই।

ম্যালিগন্যান্সি ওর আবার ছড়িয়েছে। প্যানক্রিয়াস ও লিভারে স্প্রেড করেছে। Metastasis না কী যেন বলে।

মৃদু হাসলাম। লিন্ডা আবার কফি নিয়ে এসেছে। আমার স্বামী নীরব। টনি কথা বলে চলেছে। আমি উদাসী হাওয়ার মতন ভাসছি। ভাসছি এক অদ্ভুত জোয়ারে যার পোশাকি নাম দু:খ, ব্যাথা। মানুষের কান্নায় চাপা পড়ে গেছে আমার অস্তিত্ব।

টনি আমি আর শুনতে চাইনা। বন্ধ করো তোমার কাহিনী। বন্ধ করো এবার! হাত বাড়িয়ে কালো আকাশ ছুঁয়ে ফেললাম। আকাশে বাদুলে মেঘ। টনি আমি আর গল্প শুনবো না, এবার তুমি থামো –থামো বন্ধু থামো থামো -------বিদায় টনি, বিদায় ---- বিদায়! আলবিদা আলবিদা! মা- সালামা, মা- সালামা ---আরবী তে গুডবাই।

নকশি কাঁথার মাঠে

ফোনটা হাত থেকে পড়েই গেলো। কেন জানেনা বয়। বয় বোজ, যুদ্ধ বিশারদ। যুদ্ধের উপকারিতা, অপকারিতা, কৌশল, দর্শন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা কাজ। ওয়ার ইন্তেলেকচুয়াল। দুপুরের সোনালি রোদে দূরের আগ্নেয়শিলার পাহাড়ে ঘুরতে যায়। পথে যেতে যেতে হিমেল হাওয়ায় মাথার মধ্যে চলে বিভিন্ন যুদ্ধের কথা। ইরাক যুদ্ধ, আমেরিকায় সিভিল যুদ্ধ, ঐতিহাসিক যুদ্ধ, সেনা বাহিনীর কলাকৌশল এগুলো মাথায় ঘোরে। নৃশংসতা। পরিণতি। আধুনিক অস্ত্রক্ষেপণ ও তার গুরুত্ব। ইগোর নতিস্বীকার ইত্যাদি।

আপাততঃ গৃহযুদ্ধের কবলে বয়। একমাত্র শ্যালক হিরণাক্ষ চাকলাদারকে অনুপ্রাণিত করেছিলো সামান্য সম্বল নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতে, তাও টুরিস্ট ভিসায়। ফিরে এসেছে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, ফুরিয়ে গেছে সমস্ত জমানো টাকা। গিন্নী এখন উঠতে বসতে দাঁতে কাটছেন।

- –তুমিই তুমিই এর জন্যে দায়ী ! একটা বাচ্চা ছেলের মাথাটা খেয়েছে আর তুমি একটা বুড়োধারী ওকে যেতে দিলে ?
- আমি কী করে জানবো যে এমনটা হবে ? কাচুমাচু মুখে বয়।
- –জানোই যখন না তখন যুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করো কোন মুখে ? একটা বদলোককে যে চিনতে পারেনা তার আবার যুদ্ধু টুদ্ধুর মতন কঠিন বিষয় নিয়ে লড়া কেন ? মুখ ঝামটা দিয়ে চলে গেলেন গিন্নী মুখরা মধুরা চাকলাদার বোজ।

আদতে শ্যালক,জামাইবাবু অন্ত প্রাণ। যা করবে তাঁকে জিজ্ঞেস করেই। তাঁর কথা বেদবাক্য। কাজেই উনি গ্রিন সিগন্যাল দেবার সাথে সাথেই প্লেনের টিকিট কেটে উঠে পড়েছিলো। যাবে নকশিকাঁথার মাঠে।

সেখানেই তো আছেন স্যাম দা। শ্যামল মন্ডল। সাচ্চা কমিউনিস্ট। মানুষের জন্য লড়েন, কাজ করেন।

ইন্টার্নেটে বসে এত লম্বা লম্বা ডায়লগ দেন না মনে হয় ছুট্টে চলে যাই ! আয়রনম্যান বল্লভভাই প্যাটেলের মতনই অনেকটা, সুভাষবোসের মতন শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজ নেই এই যা !

বলেন কত ভালো ভালো কথা, শুনলে রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। বং-লাইভ বলে একটি ওয়েবসাইট আছে বেশ জনপ্রিয় । ওখানে একটি ফোরাম আছে কথাগল্প নামে। সেখানে বসে এই স্যামদা এক একটা যা দেন না ! উহ্ ! পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই এই দাদা যেন বিক্রম বেতালের মতন। উনি বেতাল আর হিরণাক্ষ অরফে হিরু হল বিক্রম। বীর দর্পে এগিয়ে চলেন কমিউনিজমের মশাল হাতে লাল দরজা ভেদ করে।

শুনেছিল একাই থাকেন । আদর্শবাদী তাই বিয়ে করেন নি । থাকেন হল্যান্ডে। আসলে গিয়েছিলেন কমিউনিস্ট দেশেই, রাশিয়ায়। ভেঙে পড়ায় হল্যান্ডে। ফুল খুব ভালোবাসেন। তাই।

বলেন : দরিদ্ররা সারাজীবনে একটু ফুলের মুখ দেখতে পায় না।

হিরু : কেন পথের ধারে তো কত্তো ফুল।

-হা হা হা করে হেসে ওঠেন স্যামদা,আড়ালে অনেকেই বলেন পাবদা (মাছ,কোনো মেরুদন্ড মানে কাঁটা নেই। তবে তাঁরা কমিউনিস্ট বিরোধী। নিন্দুকে তো কত কিছুই বলে সব শুনতে গেলে চলে ??)

স্যাম দা বলেন : ওরা সেইসব ফুলের মুখ দেখার সময় পায়না। ওরা ভুখা নাঙ্গা । সেই ভুখ মেটাতেই আমি জীবন উৎসর্গ করেছি । এক একটা ডায়লগ কিংবা ব্লগ দারুণ উজ্জীবিত করে হিরুকে।

ও নিজে স্কুলে পড়ায় । আসলে পড়েছিলো ইঞ্জিনীয়ারিং । তারপরে এক পাগলা মাস্টারের পাল্লায় পড়ে কোম্পানি জয়েন না করে ঢুকে পড়ে এই শিক্ষাদান লাইনে । ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ । পুঁথি মুখস্থ করিয়ে দেশোদ্ধার করবে না হিরু। স্বাধীন চিন্তা করতে শেখাবে। তখন থেকেই অর্থের টানাটানি কারণ ও টিউশানি করেনা। সেই সামান্য মাইনের থেকে জমানো টাকা নিয়ে গিয়েছিলো হল্যান্ডে । বেড়াতে নয় স্যামদা কে মিট করতে। ওকে উনি খুবই স্নেহ করেন কারণ ও কর্পোরেট জগতে ঢোকেনি

। পয়সার লোভে। বিলিয়ে দিয়েছে নিজেকে দেশ সেবায়। যা এই একুশ শতকে বিরল।

খুব আশা নিয়ে গিয়েছিলো। যাবার আগের দিন রাতে সারাটা সময় ও পরে এয়ারপোর্টে ওয়াই ফাইতে বসে জামাইবাবুর সাথে কতনা চ্যাট হল। কীভাবে আলাপ করবে স্যামদা, এত বড় মানুষ উনি ! ট্রটস্কির ছবি বুক পকেটে নিয়ে ঘোরেন। বলেন : স্টালিনটা স্বার্থপর।

উহ্ কী ডায়লগ, ঘ্যামা মানুষ হবেন বোঝাই যায় : মনে মনে ভাবে হিরু।

একটা ফুলের তোড়া নিয়ে যাবে। বিমান বন্দরে আসবেন উনি।

এখন বসন্ত। ফুলের শোভায় চোখের আরাম হয়। স্যাম দা এলেন এয়ারপোর্টে। হাফ প্যান্ট ও লাল জামা পরা। একা। ভেবেছিলো রেড আর্মি নিয়ে আসবেন।

নিয়ে তুললেন একটা ছোট বাড়িতে। এক কামরার ঘর ! উহ্ ! গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, এরকম মানুষ, আজকালকার দিনে। সুদূর হল্যান্ডে বসে এতটা স্বার্থ ত্যাগ ?

ভড্‌কা আর সস্তার বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। আসলে চা দিতেই চাইলেন ও চা খায়না শুনে এই টায়ের ব্যাবস্থা হল !

- হ্যাল্লো, হ্যাল্লো মোবাইল বেজে ওঠে স্যামদার। ওপাশে গিন্নী। আজ রাতে বাড়িতে আসবেন না। (তাহলে বৌও আছেন !) স্যামদার ছেলেপুলে নেই ? : নাহ্ রে, ওরা বড্ড সময় খেয়ে নেয়। মানুষের জন্য কাজ করবো কখন তাহলে ? বলে ওঠেন ভরাট গলায় কমিউনিজম স্বরাট।

আহা ! কী বাণী, ভাবে হিরু। অনেক কথা হল। স্যামদা কিন্তু খঞ্জ। খুঁড়িয়ে চলেন। বলেন : পা টা শহীদ হয়েছে আন্দোলনে। ওরা কাউকে ছাড়েনা, ঐ ধনীরা। ওরা লোভী, হ্যাংলা। পা-টাও খেয়েছে। আর দেখ না সাহেবদের আন্ডারে থেকে এমন অবস্থা যে আজকাল সিংহের বাচ্চাকেও দাঁত চিপে ইংরেজি বলতেই হবে। আমরা বদল এনেছি, পরিবর্তন। সব

বাংলায় করে দিয়েছি। মাতৃভাষা মহান। সাহবের পা চাটবো কেন?গোরা চামড়া ?

হিরু বোধহয় বলে : কার্ল মার্কস কি সাহেব নন ?

- ধুস কার্ল মার্কস তো মহামানব। ওদের আবার জাত হয় নাকি ? ওরা বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করেন। যাইহোক তুই কাল আয়। বৌ থাকবে। বিয়ে করেছি বুঝলি না তোকেই শুধু বললাম। নাহলে ঘরের কাজ সামলাতে গেলে মানব সেবা হয়না ! সাধারণ রান্না খাবি, বেশি পয়সা খসাই না কত্তোলোক ভারতে খেতে পায়না বলতো ! তাই সিম্পেল বাঙালী রান্না। তেলাপিয়া মাছের ঝোল আর মুসুরির ডাল। সাথে বেগুন ভাজা। হালকা আমের চাটনি।

- বাব্বা ! বিদেশে তো সবই পাওয়া যায় দেখছি। হিরু উত্তেজিত।

- হ্যাঁ ঐ বাংলাদেশী দোকানের কল্যাণে। মোল্লাগুলোর জ্বালায় বাংলাদেশটাকে কমিউনিস্ট করতে পারলাম না ! ওরা ধর্মের হাতের পুতুল। যতদিন দারিদ্র্য থাকবে ধর্ম থাকবে।

হিরু বলে : কেন, ম্যাডোনা, টম ক্রুজের মতন ধনীরা তো ধর্ম মানেন। কাববালা আর সায়েন্টলজি।

স্যামদা হাসেন ! বলেন : আরে ওগুলো ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কল। ডোনেট করার নামে ট্যাক্স বাঁচাবে। ধর্মের ধ্বজাধারীদের ডোনেট করবে। বকলমে ওরাও ওদেরই লোক। আমআদমীদের ফাঁকি দেবার ধান্দা।

একজন বন্ধু ছিলো, কমন নেট ফ্রেন্ড। ডুং ডুং নাম। সেও হল্যান্ডে। কৈশোরে পার্ভার্ট ছিলো। একা বাড়িতে নগ্ন হয়ে থাকতো। একবার বন্ধুরা গিয়ে ধরে ফেলে। সেই স্বভাব বদল হয়নি। ব্রথেলে যায় মাঝে মাঝে। ঐ খেতে ডাকলো তো সেদিন দুপুরে যেদিন রাতে নেমন্তন্ন স্যামদার বাড়ি।

ডুংডুং একা থাকে। নিয়ে গেলো লাতিন আমেরিকান দোকানে। আজব খাবার খেলো হিরু।

তারপর হালকা সুরা। উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত করা নাচ দেখালো মেয়েরা। তখন চটুল শব্দ ব্যবহারে পারদর্শী যার কাছে –গালাগালি দিয়ে কথা না বললে মন শান্ত হয়না সেই ডুং ডুং বল্লো :

মাইরি মালটার দুদুগুলো দেখেছিস ? ইয়া ইয়া, অনেকটা স্যামদার বৌয়ের মতন। কি সাইজ রে ভায়া ! দ্যাট ইনকরিজিবেল বাস্টলাইন !! স্যামদার স্ত্রীকে তো আমি ভোগ করেছি !

চমকে ওঠে হিরু, ভাবে ভুল শুনেছে। জানতে চায় মুখ খুলে, কী –কী বললে ?

- শালা ওকে আমি দিয়েছি একবার নয় অনেকবার।
- মা মানে ? কী বলছো ?
- ঠিকই বলছি, পুরো হুঁশ আছে আমার, নেশা চড়েনি একদম। মালটা তো রান্ডি। হল্যান্ডে এগুলো লিগাল। রান্ডিদের বিভিন্ন কার্যকলাপ দেখার শপ আছে। সেক্স শপ। সেখানে টুরিস্টরা যায়। দেখে আসে। তবে সবই রেগুলেটেড। নিয়মে বাঁধা। তাই সিফিলিস গনোরিয়া এইডস্ হয়না। ও তো কোনো কাজ করেনা তাই সরকার থেকে বেকার ভাতার বদলে ওকে কাজ খুঁজে দিয়েছে এবং তা এই প্রস্টিটিউটের কাজ। ও তাই করে। ওর বর ওর পয়সায় বসে খায় আর নেটে লম্বা লম্বা বাতেলা ঝাড়ে। মালটা একবার কমিউনিস্ট দেশে গিয়েছিলো কলকাতা থেকে মগজ ধোলাই হবার পরে। সেখানে ওকে একদিন থানায় পুড়ে দেয় বিনা দোষে। কারণ ও নাকি শুধু বলেছিলো ক্যাপিটালিস্টদেরও ভালো দিক কিছু আছে। আড়ং ধোলাই পড়েছিলো কিনা জানিনা, একটি পা ওখানেই গেছে। তবে এখন ভয়ে বেশি বাইরে বেরোয় না। বৌয়ের পয়সায় খায়। আর নেটে বসে ওরই মতন কতগুলো অপগন্ডের দলে ভিড়ে লোকের মগজ ধোলাই করে। তুই-ও কি ওর ঐসব লেকচার শুনেই এসেছিলি নাকি ? আমি তো ভাবলাম তুই সত্যি ঘুরতে এসেছিস ! কৌতুহল বেয়ে পড়ছে ডুং ডুং য়ের চোখ থেকে –কমিউনিস্ট দেশে কোনো বাক স্বাধীনতা নেই। দেখবি যারা এগুলো বলে ও করে তারা সবাই হয় ভারত অথবা কোনো পশ্চিম দেশে থাকে যা কমিউনিস্ট দেশ নয়।

টেবিলে রাখা হলুদ পানীয়, ওপরে পাউরুটি ভাসছে। লাতিন আমেরিকান রেস্তোরাঁ –নাচছে একটি মেয়ে। সরল আঁখি। দেখে নর্তকী মনে হয়না মনে হয় কোনো স্কলার। হাত পায়ের মুভমেন্ট একটু আড়ষ্ট। হয়ত তারই মতন কোনো চক্রে ফেঁসে এসেছে এখানে অন্য কোনো দেশ থেকে এখন সস্তার বার ডান্সার।

হীরু ভেঙে পড়েছে। স্যামদা এরকম মানুষ ? আর কতনা লম্বা লম্বা কথা হেঁকেছেন ! কত আদর্শের বাণী, পরোপকারের গল্প !

স্ত্রীকে দেহ ব্যবসায় নামিয়ে নিজে নেটে বসে গালগল্প দিচ্ছেন আর পাপের পয়সায় খাচ্ছেন !

ওর ব্লগের নাম লাল দরজা। হিরুর ইচ্ছে হচ্ছিলো ওটাকে বন্ধ দরজা করে দিতে যা কোনো চিচিং ফাঁক দিয়েই খোলা যায়না।

দেশে এসেছে ঠিক সময়ই যদিও শেষের দিকে দমবন্ধ হয়ে আসছিলো। স্যামদা অথবা পাবদার বাড়ি খেতে যায়নি। উনি মেসেজ করেছিলেন। হিরু জবাব দেয়নি। ইমেল আই ডি বদলে নিয়েছে। জামাইবাবুকে হতাশার কথা বলেছে। উনিও আশাহত হয়েছেন বেশ। যদিও বাইরে প্রকাশ করেন নি। এদিকে গিন্নীর মুখ ঝামটা ওদিকে শ্যালকের ভগ্ন হৃদয় দুই সামলাতে হিমসিম। স্থির করলেন বেড়াতে যাবেন। গেলেনও।

সেই হল্যান্ড। সাথে গিন্নী ও পোলাপান। সন্ধ্যায় বসেছিলেন পুরনো বন্ধু কাজলের বাড়ি। কাজল আর ও কৈশোর থেকেই বন্ধু। নতুন দেশের মাদকতা এখনো কাটেনি। কাজলের সাথে দেখা শপিং মলে। চেহারা বদলে গেছে। বদলেছেন সুদেষ্ণা বৌদিও। ওরা নিঃসন্তান। কাজল কলেজে পড়ায়। বৌদি সমাজ সেবা করেন।

বাঙালী রান্নায় টেবিল সাজানো। চিংড়ি, ইলিশ সব আছে। শাক টাকও। ভালো খাবার খেতে কারনা ভালোলাগে ??

বৌদি নীল শাড়ি পরেছেন। ওর গিন্নী মধুরা চাকলাদার বোজ পরেছেন ঘাগড়া। মেটে রং ওপরে আকাশী কাজ। বেশ লাগছে দুই বঙ্গ ললনাকে। কাজলের বন্ধুর একটি ফার্ম হাউজ আছে শহরের বাইরে। সেখানেই একবার সপরিবারে নিমন্ত্রিত কাজল দেখে বয় বোজের ভগিনী ববিকে।

বয় বোজ আদতে খ্রীস্টান । ববি এক পাড়াতুতো দাদার সাথে বাড়ি ছেড়েছিলো । সে ছিলো মুসলিম । নাম আকবর । তাদেরকেই দেখেছে কাজল । আসলে আকবরকে দেখেনি দেখেছে ববিকে ।

ববি দেহব্যবসা করে । ওর কারেন্ট স্বামী খঞ্জ । ববির মুখের আদল একই আছে বয়সের ছাপ পড়েনি তবে চেহারায় একটি মেম মেম ছাপ এসেছে ।

ওরা ববির বাড়িও গিয়েছিলো । খঞ্জ স্বামী কিছুই করেনা । ববিকে সরকার থেকে দেহ ব্যাবসার কাজ দেওয়া হয়েছে । ওখানে ওরকম হয় । বেকারদের সরকার কাজ দেন । তাই করতে হয় ।

আকবর গুজরাটের জেলে ছিলো । পলিটিক্যাল কারণে । ববি পলায়ন করে ওর স্বামীর বন্ধুর সাথে । এই সেই স্বামী । শ্যামল মন্ডল । শ্যামল কাজ না করলেও লেখেন । ব্লগ আছে । বাংলায় ইন্তেলেকচুয়াল হিসেবে নাম হয়েছে । বাঙালীরা ওর ব্লগ পড়ে ধন্য ধন্য করেছে । অনেকে দেখা করতে আসে সুদূর ভারত থেকেও । এই তো একটি বাচ্চা ছেলে এসেছিলো কিছুদিন আগেই ।

শ্যামল ওরফে স্যামকে ওরা ভগবানের মতন মানে । ওর একটি বাক্য বা মুখ নি:সৃত বাণী আন্তর্জালের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে । ও খুবই জনপ্রিয় । তাই ববি ওকে কাজের জন্য চাপও দেয়না । লোককে বলে ও প্রফেশন্যাল রাইটার । বাংলায় লেখে । দু একটি হয়ত মহানন্দা ফন্দায় বেরিয়েছিলো । সেই ১০০/২০০ টাকা দেশ থেকে নিয়ে আসার জন্য শ্যামল মন্ডল ব্যাকুল ।

ববি একবার বলেছিলো : আরে ও কটা টাকা, ও তো দান করে দিলেই হয় ।

- শালা পয়সা খোলামকুচি ? এক পয়সাও দেবোনা কাউকে, হারামের পয়সা পেয়েছো আমার ? আমি বলে কত মাথা খাটিয়ে লিখি ! স্যামের সংক্ষিপ্ত উত্তর ।

নেগেটিভ আলো

পিয়া সোসাল সায়ন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে। এখন উত্তর পূর্ব ভারতের এক ছোট পাহাড়ি জনপদ সাবায় অবস্থিত। সাবায় উপজাতি এলাকা। অনগ্রসর জাতির ছোট আবাসস্থল। নাক চ্যাপ্টা, সরু চোখ, লাল আপেল গাল। লম্বা বেণী।

কানে অজস্র ঝুমকো, হাতে পায়ে পেতল কিংবা তামার অসংখ্য ছোট বড় চুড়ি।

সরল মানুষ। আজকাল অনেকটাই উগ্রপন্থীর দ্বারা চালিত এলাকা। এইসব জায়গায় কারখানায় উগ্রপন্থীরা গার্ডের কাজ করে যাতে অন্য উগ্রপন্থী দল সেই কারখানা আক্রমণ করতে না পারে। সরকার এদেরকে তেমন দেখেন নি। ভোটবাক্স উপচে পড়ে মেনল্যান্ডের ভোটে। হয়ত তাই। এরা দলিত, উপেক্ষিত।

উগ্রপন্থীদের ওরা নেতা মনে করে। রবিনহুডের মতন। জীবন এখানে রহস্য মোড়া। শহুরেদের কাছে এক ঘেয়ে। সরল মানুষগুলি রেগে গেলে ছুরি বার করে লড়াই করে। পোকা মাকড় খায়, ভেজে, রেঁধে। গঙ্গাফোড়িং, ক্যাটারপিলার কিনা খায়! সুস্বাদু এবং প্রোটিন এ সমৃদ্ধ। বংশের কেউ মারা গেলে তাকে ওরা কেটে কেটে রান্না করে খেয়ে ফেলে। এটাই এখানে রীতি। কেউ কিছু মনে করেনা। সভ্য না অসভ্য তার বিচার করবে কে?

এও তো এক ধরণের সংকার!

এইসব নিয়েই থিসিস লিখবে বলে এসেছিলো এখানে পিয়া সোম।

সকালটা কাটে ঘরে। নোট তৈরি করে। বই পড়ে। বিকেলে এইসব মানুষের সঙ্গে মেশে। খুব কাছ থেকে দেখে, জরিপ করে।

এখনও অবধি যাদের সাথে মিশেছে তারা সবাই ভাঙা ভাঙা বাংলা অথবা হিন্দী পারে। সম্প্রতি একটি পরিবারের সাথে আলাপ হয়েছে যেখানে

মালিকের ৬২ খানা বৌ । একই সাথে থাকে নাতিপুতি নিয়ে । এই ভদ্রলোকের কিছু বৌ বাংলা কিংবা হিন্দী জানেনা । অথচ তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে পিয়া যে থিসিসের নতুন রসদ এরা দিতে সক্ষম । কথা বলবে কী করে ?

তাই তো আলাপ হল রাখী সেনের সাথে । এই অচিন পুরীতে এক বাঙালী মহিলা আছেন জানতো না । গ্রামের প্রান্তে একটি দালানে উনি বাস করেন । বললেন : রাতে আসবে । আমি তখন ফ্রি থাকি । গল্প হবে । তোমার কাজও হবে ।

পিয়ার মনে হল উনি রাতের দিকে একাকী থাকেন বলে নি:সঙ্গ বোধ করেন ।

দিনটা ছিলো শনিবার । সান্ধ্য কাজ সেরে কিছু খেয়ে নিলো মোড়ের মাথায় এলাকার একমাত্র স্কুলের পিটি টিচার যশলোকের দোকানে । যশলোক বাঙালী । এসেছে আসাম থেকে । পিটি শেখায় । স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করেছে । সেই বৌ এই দোকান চালায় । বিকেলের দিকে হিসেব করতে বসে যশলোক । তখন সেই-ই দোকানে থাকে । রাখী সেনের বাড়ি এখান থেকে বেশি দূরে নয় ।

হেঁটেই যাওয়া যায় । পাথুরে রাস্তা । দু একটি লোমওয়ালা সাদা কুকুর ইতি উতি ঘুরে বেড়াচ্ছে । বাতাসে হিমের রেশ । শীত এলো বলে ।

দরজা একটু ফাঁক করেই রেখেছিলেন রাখী । পায়ে পায়ে উঠে গেলো বারান্দায় । বাগানে সুন্দর টাটকা গোলাপ । মিষ্টি গন্ধ বাতাসে । আকাশে মায়াবী চাঁদ ।

অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা !

পিয়ার চোখে আলো । সবুজ মায়াবী আলো ।

রাখী সেনের চোখ নীল । পরণে হলুদ শাড়ি । লাল ব্লাউজ । কানে মুক্তো ।

চেহারায় একটি অভিজাত ভাব যা এই পরিবেশে খুব একটা দেখা যায়না ।

হাঁটা চলা, কথাবার্তা সবই অত্যন্ত মার্জিত ।

মুখ খুলে জানতে চায় পিয়া : আপনি এখানে কতদিন ? কেন ?

রাখী সেন মৃদু হাসেন। তারপর বলেন : বড় বেমানান তাই না ? কাবাব মে হাড্ডী ? তোমার সমাজ বিজ্ঞান কী বলে ? উপজাতিদের মধ্যে সভ্য মানুষের থাকতে নেই ?

চায়ের উষ্ণ পেয়ালা বাড়িয়ে দেন।

পিয়া হাসে। পরে বলে : সেরকম কিছু নেই। এইসব নিয়েই তো আমার পড়াশোনা।

আসলে এড়িয়ে যায়। রাখী সেনকে নিয়ে তার কৌতুহল অসীম। পাহাড়ি, নিঝুম জনপদে এই সভ্য ভব্য মহিলা একাকিনী, কেন ??

রাখী প্লেট বাড়িয়ে দেন, মাটির। বলেন : বিস্কুট খাও। পোকা ভাজতে পারিনি। আসলে আমি পোকা খাইনা ! বলে হাসেন।

খুব ফর্সা। চওড়া মুখ।

বলেন : আমার সম্পর্কে অনেকেই জানতে চায়। কেন আমি এখানে। আমার কে আছে ! এই দেখোনা আমি চাষবাস করি। আশেপাশের রুক্ষ্ম জমিতে কম জলে কীকরে চাষ করা যায় তাই শিখেছিলাম বই পড়ে। এখানে সেই নিয়ম দিয়ে ভালই ফসল ফলাই। বাজারে বিক্রি করি। এরা ভালই খায়। মানে লোকাল লোকেরা। আমাকে খুব সমীহ করে। বাবা আমার নাম রেখেছিলেন রাখী আমার জন্ম রাখী পূর্ণিমার দিনে বলে। মা আমাকে পূর্ণিমার রাতে উঠোনে জন্ম দেন, ভরা চাঁদের আলোয়। আমার বাবা পন্ডিত ছিলেন। অর্থনীতিতে। সেই সময় অর্থনীতি আর পলিটিক্যাল সায়েন্স অনেকটা একই ছিলো। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে বাবা পড়তে গিয়েছিলেন। হ্যারল্ড লাস্কির কাছে। জ্যোতি বসু, কে আর নারায়ণণ্ ও সেই সময় ওখানে ছিলেন। পরে বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে চলে আসেন। হাঁপানি রুগী বলে বেশিদিন বাঁচেন নি।

চায়ের কাপে আলতো চুমুক। পিয়া অনুসন্ধানী।

- এখানে কি মনে করে ? অভিজাত জীবন ছেড়ে ? পেশায় আপনিও কি ইকোনমিস্ট ছিলেন ?

- নাহ্ । মৃদু জবাব । তারপর একটু থেমে : আমি ছিলাম আইনজ্ঞ । আমার এক্স স্বামী মুম্বাইয়ের খুব নামকরা ক্রিমিন্যাল লইয়ার । নাম শুনে থাকবে ।

ভরত ভূষণ নেনে । অনেক তাবড় তাবড় ক্রিমিন্যালকে কোর্ট থেকে বার করেছেন । বলতেন : আমি জানি ওরা ক্রাইম করেছে, দোষী । কিন্তু আমি ওদের নির্দোষ প্রমাণ করার দায়িত্ব নিয়েছি প্রফেশানের খাতিরে । ওদের সমস্ত ধন সম্পত্তি আমি টেনে নেবো ফিস হিসেবে ।

- মাধুরী দীক্ষিতের ইন লওসের কেউ নাকি ? পিয়া সিরিয়াস ।

- আরে না না ! হাসেন রাখী –ওকে যারা হায়ার করে তারা কেউ কেস হারেনা । আমি ছিলাম ডাইভোর্স লইয়ার । আমার পসার স্বামীর মতন ছিলো না ।

হি ওয়াজ দা বেস্ট । আই ওয়াজ নট ।

চোস্ত ইংরেজি । সাহেবি অ্যাকসেন্ট ।

চোখে কি জল ?

কে জানে !

- আমারও একদিন ডাইভোর্স হল জানো । মেয়ে তখন এক বছরের । আমার স্বামী ওকে নিয়ে নিলো । আমি পারতাম আমার সমস্ত বিদ্যা বলে ওকে কেড়ে নিতে কিন্তু আমি নি–ই নি । ও স্বামীর কাছেই বড় হল । ওকেও চেনো তুমি ।

- ফিল্ম মেকার । সিরিয়াস, রিয়ল লাইফ ছবি বানায় । কাজল কালো ভ্রমর নাম ওর । আজব নাম তাই না ? তোমার আজব লাগছে না ?

- –নাহ্ । মিষ্টি হেসে জানায় পিয়া । একে নিয়েই তো থিসিসে একটি পরিচ্ছদ লিখে ফেলা যায় ! দূর্দান্ত সাবজেক্ট ! ওহ্ হো এরকম হবে কি ভেবেছিলো ? আসার সময় ওর বয়ফ্রেন্ড মানে যার সাথে ও থাকে সেই সাংবাদিক রূপায়ন দাস বলেছিলো : আর যাবার জায়গা পেলেনা ? যখন ফিরে আসবে তোমার সঙ্গে আমি হু লা লা ওয়াও ওয়াও করে কথা বলবো, হা মুখে চড় মেরে, আবা আবা করে ।

এখন দেখো রূপায়ণ কোথায় এসে পড়েছি, এখানে হাই ফাই লোকেরাও থাকে ।

গলা ঝেড়ে রাখী শুরু করলেন: আসলে আমি পাস্ট লাইফ রিগ্রেশান করাই । উপনিষদে এর উল্লেখ আছে । এখন ওয়েস্টের লোকেরা এই নিয়ে খুব হুল্লোড় করছে । মেনি লাইভস্, মেনি মাস্টারস বইটা নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছে । বিক্রম ভাট তো ছবি বানিয়ে ফেললো ডেনঞ্জারাস ইশক্ নামে ! আমি অনেকদিন আগে এই পদ্ধতিতে আমার পূর্বজন্ম সম্পর্কে জেনেছিলাম । আমার বাড়ির কাছে এক তান্ত্রিক ছিলেন । সবাই বলতো সুরয বাবা । উনি মানুষকে আলো দেখাতেন বলে । তারই কৃপায় আমি কয়েকটি জন্ম দেখতে পাই যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো রিসেন্ট পাস্ট লাইফ । ঐ জন্মে আমি কেরালায় ছিলাম । এক ধনীর দুলালী । আমার প্রেম হয়েছিলো এক লেখকের সাথে । তরুণ লেখক । সে গদ্যে নতুন ধারা আনে । বাবার তাকে যে অপছন্দ ছিলো তা নয় তবে আমাদের বংশের নিয়ম অনুসারে আমার বিয়ে ঠিক করা ছিলো অন্য এক বণিকের সাথে । সেইখানেই বিয়ে হয় । ধনসম্পত্তি অঢেল । কিন্তু কবিতা নেই, কাব্য কথা নেই । শুধু পয়সার খেলা । আমি বাড়ি ছেড়ে দিই । পথে পথে ঘুরতে থাকি । তারপর একদিন সন্ধান পাই এক বৃদ্ধের যিনি আমাকে সংগীতে হাতেখড়ি দেন । সেই গান নিয়েই বেঁচে ছিলাম শেষ দিন অবধি । এখনো গানই আমার অবসরের সাথী । সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি একা বসে গান করি । এজন্মে গান সেরকম শিখিনি কিন্তু লোকে বলে আমার তৈরি গলা ।

আসলে গতজন্মে আমি গানেই বেঁচে ছিলাম । গানই ছিলো আমার ভুবন ।

আমার সেই প্রেমিককে না পাওয়ার বেদনা আমি অনুভব করেছিলাম রিগ্রেশান হবার সময় । আমি কান্না কাটি করেছিলাম । হাত পা কাঁপছিলো থরথর করে । এ জন্মে আমার সেই প্রেমিক আরেক উকিল । আমাদেরই পরিচিতের মধ্যে । আমার স্বামীও তাকে চেনেন । অনেকটা আশুতোষ রাণার মতন দেখতে । প্রবাসী মারাঠি উনি । চিত্রাঙ্গদ সানে ওর নাম, বাবা প্রাক্তন আই পি এস । । আসল বাড়ি শিলং-এ । ওকে নিয়েই শুরু হল অশান্তি । পার্টিতে দেখা হলে আমার স্বামী আমাকে জরিপ করতেন । আমার ফিলিং কি হয় লক্ষ্য করতেন । আমারও খুব ভালোলাগতো, জানো পিয়া !

এই প্রথম নাম ধরে ডাকলেন পিয়াকে।

তারপর একটু থেমে বললেন : আর না, বাকিটা পরে বলবো। আজ এইটুকুই থাক। এবার তোমার কাজের কথা বলো। প্রথম দিনে তোমাকে ওভার ডোজ দিয়ে দিলাম না তো ? হয়ত ভাবছো মহিলা উন্মাদিনী !

পিয়া খুব হাসে। তারপর বলে : আপনি খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন, না না আমি সেরকম কিছুই ভাবছি না। আমার খুব ভালোলাগছে শুনতে।

আপনি বলে যান।

রাখী রাজি হননা। বলেন : আবার পরে, আজ তবে এইটুকু থাক।

অতএব। পিয়া এবার নিজের কাজের কথা নিয়ে পড়ে। উপজাতি ভাষা যা রাখী জানেন তাই দিয়ে ঐ বৌগুলোকে কালটিভেট করতে হবে। সব নোট করে এনেছে।

আরেকদফা চা এলো। সাথে এবারও ফড়িং কিংবা আরশোলা ভাজা নয় বরং ডালমুট –আমি এটা শিলং থেকে এনেছি। রাখী হেসে ওঠেন। ঐ পোকা ফোকা বাবা আমার কেমন গা ঘিন ঘিন করে।

- কিন্তু আপনি এই সুদূর উত্তরপূর্ব ভারতে কেন সেই পশ্চিম থেকে ?
- আমার গতজন্মের প্রেমিক চিত্রাঙ্গদ সানে এখানেই থাকে। শিলং – এ।

ওখানেই ওদের পৈত্রিক বাড়ি। ও ভালো উকিল কিন্তু ওর বাবা ছিলেন আগে পুলিশ ও পরে ব্যবসায়ি। শিলং য়ের নাম করা কিপ্টে হিসেবে বদনাম আছে ওর বাবার।

আমি মাঝে মাঝে শিলং এ যাই ওকে দেখতেই।

বাকিটা এখন নয়। ক্লাইমেক্স টা থাক না মেয়ে !

কথা বাড়ায় না পিয়া। প্রতিটি জিনিসকে তার স্পেস দিতে হয় ও জানে।

চুপ করে চলে আসে।

বাড়িতে এসে আর খায় না । ভদ্রমহিলা ইন্টেরেস্টিং আগেই বুঝেছিলো কিন্তু এরকম ঘটনা কল্পনাও করেনি । মেনি লাইভস মেনি মাস্টারস্ বইটার কথা শুনেছে । আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার । পড়েনি । এবার পড়বে ।

কি করে একজন লিডিং সাইকিয়াট্রিস্ট তার এক রোগিনীকে পাস্ট লাইফ রিগ্রেশান করে অসুখ মুক্ত করলেন তাই নিয়েই স্কেপ্টিক মহলে সাড়া ফেলা এই বই ।

দুদিন পরে আবার রাখী ডাকলেন । এবার নেমন্তন্ন করলেন । পোকা ভাজা না খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, বললেন : বুনো হাঁস রান্না করবেন ঝাল ঝাল করে কষে।

মুম্বাইয়ের প্রথম সারির উকিলের প্রতিষ্ঠিত আইনজ্ঞ পত্নীর হাতে বুনো হাঁস ? বোম্বাস্টিক ব্যাপার । উহ্ ! পিয়ার দারুণ লাগছে । ফিরে গিয়ে রূপায়ণ কা বাচ্চার ওপর দশ হাত নেবে ! বলে কিনা – হু লা লা, আবা আবা ।

বিকেলে দেখা হল সুসিং এর সাথে । লোকাল মেয়ে । ওর বাড়িঘর সাফ করে । ও একটি ছোট বাসা নিয়ে আছে । একটাই ঘর আর ছোট রান্নার চাতাল । পাশে থাকে রূপা অপু –রা । ওরা অসমিয়া । এখানে কারণ ওদের বাবা পুলিশ । আর কিছু পিয়া জানেনা । মূলত এখানে লোকাল মানুষই বেশি । রূপা অপু পরিষ্কার বাংলা বলে ।

রাখীকে খুব শ্রদ্ধা করে । ওরাও নাকি খেয়ে এসেছে ওর বাড়ি । বললো : উনি দারুণ রাঁধেন – তুমার কপাল ভালো তাই খাইতে পারবা ওর কাসে । আমরাও খাইসি ।

রাখী নিজের চাষ করা সবজি দিয়ে রাঁধেন বাড়েন ।

সময় মতন পৌঁছে গেলো ওর বাড়ি । বাড়ির একটি নামও দিয়েছেন । মেখলা ।

এইদেশের উপযুক্ত নাম ।

বাড়িটি শ্যাওলা রংয়ের কিন্তু ভেতরে আলোর হাতছানি ।

আজ দিলেন কফি । দক্ষিণ ভারতের খাস বাগানের । শিলং এ ওর কোন বান্ধবী এসেছিলেন চেন্নাই থেকে উনি এনেছেন । এখন মোবাইলের যুগে তো

দুনিয়া হাতের মুঠোয় ! সেই কফি খেলো ওরা । লেড়ি বিস্কুট দিয়ে । কাছেই একটি নেড়িকুকুর ডেকে উঠলো । মেখলা কেঁপে ওঠে সেই শব্দে ।

পেছনদিকটা ক্ষেত । অনেকটা জমি নিয়ে । সামনে বাগান, ফুলের ঝাড় । মাঝে বাড়ি । সারাদিন ক্ষেতে কাজ করেন রাখী । বর্ষায় ঘরে বসে বই পড়েন । লোকাল মানুষের কোনো কোর্ট কাছারির দরকার হলে সাহায্য করেন উপদেশ দিয়ে, অবশ্যই ফ্রিতে ।

খাবার খেতে খেতে অনেক রাত হল । সুস্বাদু হাঁসের মাংস, ওপরের চামড়া ভাজা, বাগানের টাটকা সবজি, গাজর আর মূলোর চাটনি ! ঘরে পাতা দই ।

দারুণ ! কিন্তু গল্প কৈ ? শুধুই খানা ? ভোজন ?

রাখী বলেন : এদিকে এসো, এই খাটটায় বসো । আমি এটার ওপরে বসে বসে আয়েষ করি । বিরাট একটি কাঠের খাট । মোটা জাজিম, তোষক । পাশবালিশ ।

সামনে ফুলদানি । ঘরে কম আলো । গল্প বেরিয়ে আসে আপনিই ।

- তারপর আমি চিত্রাঙ্গদের প্রেমে পড়ে গেলাম । আসলে হারানো প্রেমই খুঁজে পেলাম আবার । এক অমোঘ আকর্ষণে ওর দিকে ধেয়ে গেলাম । মনে মনে । বাইরে নয় । ওকে কামনা করতাম । আমার স্বামী যখন আমাকে আদর করতেন আমার মনে হত আমি চিত্রকেই আঁকড়ে ধরেছি ।

ধীরে ধীরে আমি ওর দিকে ধাবিত হতে লাগলাম ।

মন যখন মাতাল হয়- দেহেও তার ছোঁয়া লাগে বৈকি ! এক রাতে স্বপ্নে আমি ওর নাম ধরে কেঁদে উঠি । ওকে আমার চাই । আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না ! সেই ছন্দপতনের কারণ । ভেঙে গেলো ঘর । মেয়ে তখন মাত্র ১ । খুবই ছোট । ওর কাস্টডি নিলো ওর বাবা । স্বামী ওকে কেড়ে নিলেন ওর সন্তান বলে । আমি কলঙ্কিনী । স্বামী থাকতেও অন্য পুরুষকে কামনা করি । তাই ওর মেয়েকে আমি উপযুক্ত স্নেহ দিতে অক্ষম । এই বলে ওকে কেড়ে নিলেন । আমি যুদ্ধ করিনি কারণ আমি জানতাম ও যা বলছে তা সত্যি । আমি আসলে চিত্রাঙ্গদেরই । ঐ আমার আসল মনের মানুষ । আমার স্বামীর আর

কোনো ভূমিকাই নেই আমার জীবনে। কে বলে পাস্ট লাইফ ডাজ নট সার্ভ আস এনি মোর ? আমার কাছে এ এক জীবন্ত উপাখ্যান। চলে এলাম সব ছেড়ে। চিত্রাঙ্গদ নাসিকে গেলো, আমিও। ও এলো কলকাতা, আমিও পিছু ধাওয়া করে। কিছু মনে করেনি কারণ ও এগুলো জানতো না। আমার স্বামীও কাউকে বলেন নি কারণ লোকে আজগুবি বলে হাসবে। শুধু অন্য পুরুষের উল্লেখ করেছেন।

কাজেই ওকে অনুসরণ করেই কেটে গেলো আমার বাকি জীবন। প্রতিষ্ঠিত স্বামীর সোহাগ ছেড়ে, অর্থ, যশ ছেড়ে এইভাবে বেরিয়ে আসা একটি মোহের বশে, সত্যি লোকে আমাকে পাগল বলে কি ?

চিত্রাঙ্গদ এখন শিলং এ থাকে। দেখা হয়। হাসে, কথা হয়। বলে – তুমি নেনের সাথে যতনা থেকেছো আমার আশেপাশে অনেক বেশি।

ওর স্ত্রী খুব ভালো মেয়ে। কথা খুব কম বলেন। একটি ছেলে আছে, আর্মিতে গেছে। একটা সময় ভেবেছিলাম আমার মেয়ে যদি ওর মেয়ে হত !

কাজল কালো ভ্রমর নেনে না হয়ে সানে। একটা ন আর সয়ের এত ফারাক ?

আমার জীবন বদলে যায় পাস্ট লাইফ রিগ্রেশানের আলোয়। যেই আলো আমাকে পূর্ব জন্ম দেখতে সাহায্য করে সেই আলোই নিয়ে আসে অন্ধকার – ধ্বস – রিয়েল লাইফে। আমার অস্তিত্ব জুড়ে নেমে আসে বৃষ্টি, ঝড়।

বিধ্বস্ত আমি ঘর ছাড়ি। সব ছাড়ি কিন্তু প্রেমাস্পদকে কোনোদিন জানাতে পারিনি আমার মনের কথা। শুধু ছুটে বেড়িয়েছি ওর সাথে সাথে। পরে অবসর নিয়ে এখানে আসি কারণ ও শিলং– এ থাকে।

পরজন্মে আবার দেখা হবে। যা বলা হলনা তখন বলবো এই আশায় বসে আছি মৃত্যুর ঘন্টার দিকে চেয়ে।

- আপনার যার দিকে এত আকর্ষণ, তার আপনার প্রতি কোনো টান নেই ?

আপনার পাস্ট লাইফ স্পেশালিস্টরা এই বিষয়ে কি বলেন ? পিয়া আলতো করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

রাখী এবার গম্ভীর। তারপরে ফুলদানির পাশ থেকে একটি গোলাপের পাপড়ি তুলে শুঁকতে শুঁকতে বলে ওঠেন – আমি ওর চোখে একরাশ মুগ্ধতা দেখেছি।

রোবট গোধূলি

হিম সকাল। সবুজ জানালার গায়ে বিন্দু বিন্দু জল। দূরের পাহাড়গুলি ধোঁয়ায় ঢাকা। এসেছি মেইন্সফিল্ডে। দুদিন থাকার কথা ছিলো। কিন্তু আজকেই ফিরে যাবো।

আবহাওয়া শুধু বাইরে খারাপ নয়, ভেতরেও। স্কুল জীবনের বান্ধবী কেয়াকে অনেকযুগ বাদে খুঁজে পেয়েছিলাম এই মেলবোর্নে এসে। স্কুলে খুব ভাব ছিলো আমাদের। পরে ও আমেরিকায় চলে যায় রোবটিক্স নিয়ে পড়তে। মেধাবী মেয়ে, যশস্বিনী হবে। কেয়ার বাবা ছিলেন চিকিৎসক। সেইকালেই ওরা কন্টেসা গাড়ি চড়তো। মা অর্থনীতিবিদ। শুভশ্রী কাকিমা। সুন্দর পরিবার। কেয়ারা তিনভাইবোন। কেয়া একমাত্র মেয়ে। কেয়া যখন মাত্র ১১ তখন কাকিমার সাথে কাকুর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। নাহ্ কোনো গোলমালে নয়। কাকু বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান।

অনেকদিন ধরেই পাগলামির ওষুধ খেতেন। শেষদিকে চেন বেঁধে বাড়িতে রাখা হত। সমস্ত সম্পত্তি বেচে বর্তে ওদের চলছিলো। কাকিমা কলেজে পড়ান। কতই বা মাইনে তাঁর ? ওদের বাড়িতে আবার বেশ কিছু পুষ্যিও থাকতো। খুড়্তুতো বোন, বিধবা পিসি, অবিবাহিত মামা এইরকম। যৌথ পরিবার বলা চলে। আসলে কাকিমা চাকরি করতেন বলে হয়ত এইসব লোকেদের পুষেছিলেন ছেলেমেয়ের দেখভালের জন্য।

কাকিমাও খুব ব্রাইট ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট। ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের লোক।

কিন্তু কাকুর অসুখটার জন্য বেশি এগোতে পারেন নি, সব সামলে।

ছেলে দুটি অপগন্ড তৈরি হয়েছিলো। পাড়ার বাজে ছেলে ছোকরাদের সাথে মিশে রাত বিরেতে হোটেলে গিয়ে ক্যাবারে ফ্যাবারে দেখে, নেচে কুঁদে, ড্রাগস্ নিয়ে একাকার।

ওদের লাম্পট্যের জন্য পাড়া থেকে তুলে দেয় একবার।

শিলিগুড়ির এক মাফিয়ার ছেলে অনেকদিন কেয়াদের বাড়ি আত্মগোপন করে ছিলো। ওর ভাইদের বন্ধু সে। এক ভাই পাশের বাড়ির সুন্দরী বৌদিকে নিয়ে সিকিমে রাত কাটিয়ে আসে। সেখান থেকে ফেরার সময় ঐ গুন্ডার ছেলে ওর সাথী হয়ে কলকাতায় আসে। কেয়ার মা অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন এই দুই ছেলেকে নিয়ে।

সিপিএমের গুন্ডার দলেও নাম লিখিয়েছিলো তারা।

লোকের বাড়ি গিয়ে ভাড়াটে উচ্ছেদ, উঠতি সুন্দরীকে দীঘায় নিয়ে গিয়ে রেপ এইসব করেই কেটে যাচ্ছিলো দিন। মাঝে মাঝে কাকিমা প্রতিবাদ করলে ওদের হাতে মারধোরও খেতেন।

কেয়া তখন আমেরিকায়। কাকু উন্মাদ আশ্রমে।

কেয়ার সঙ্গে দেখা করবো বলেই আমি এই কান্ট্রিতে আসি। মেলবোর্ন শহর থেকে পাক্কা দুই ঘন্টা লাগলো গাড়িতে। গাড়ি চালালো কেয়া নিজেই। আমাকে বাড়ি থেকে তুলে আনলো ও। আমার পতিদেব জাপানে গেছেন, কাজে। বাড়িতে আমি একা। কেয়া আসার পরে এক কাপ কফি খেয়ে আমরা রওনা হলাম। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছালাম এই পাহাড়ি আস্তানায়। বাড়িটা যেন হিমে ঢাকা।

একটা পাতলা সাদা ওড়না দিয়ে কেউ যেন ঢেকে রেখেছে পুরো বিল্ডিং। কাঠের বাড়ি। একতলা। কয়েকটি ঘরে বসে কেয়া ওর কাজ করে। অন্য দুটি ঘরে থাকে। এক অস্ট্রেলিয়ান সহপাঠি রজার কিডম্যানকে বিয়ে করে আমেরিকা থেকে এখানে এসেছিলো। সেও রোবটিক্স নিয়ে কাজ করে। অ্যাডেলেডে থাকে এখন। ডাইভোর্সড্। সন্তান নেই ওদের। রজার আবার বিয়ে করেছে এক মেমকে। ওর একটি মেয়ে আছে ডেসডিমোনা। কেয়া একাকিনী এখানে কাজ করে ও থাকে। মাঝে মাঝে অ্যাফ্রিকায় যায়।

কাল রাতে আমরা এখানে আসার সময় মোড়ের দোকান থেকে স্যমন মাছ, চিপস্, স্যালাড ও চিজকেক কিনে এনেছিলাম। রাতে সেই খুব খাওয়া হল। কথা ছিলো আজকে ভোজ হবে। কেয়া ফেনোমেনাল কুক। আমেরিকাতে থাকতে নাকি রেস্তোরাঁয় কাজ করতো। ফুলকপি এক সাইজে কাটতে পারে। নিপুন হাতে মাছ কাটে ছুরি দিয়ে। আর রান্নাও নাকি খুব ভালো। এটা

শুনেছিলাম আমাদের কমন ফ্রেন্ড তিস্তার কাছে যার মাধ্যমে আমি কেয়াকে এখানে লোকেট করি। তিস্তার সাথে ওর ফেসবুকে যোগ আছে। আমার ফেসবুক টুইটার অ্যাকাউন্ট নেই। কেয়াকে তিস্তা বোধহয় মিট করেনি কারণ তিস্তা থাকে পার্থে। অনেকদূরে। ওর বর প্রশান্তসাগর মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার এর কাজ করে। ওর এক বন্ধুর হাত দিয়ে কেয়া বিরিয়ানি আর চিকেন টিক্কা মসালা রান্না করে তিস্তাকে পাঠিয়েছিলো, ফ্রোজেন করে বিশেষ ক্যারিয়ারে।

যাইহোক ভোজে কি খাবো আমি আগেই ঠিক করে এসেছিলাম। কারণ আমি আজকাল মাংস, ও যেকোনো মাছ খেতে পারিনা। প্লেন ডাল ভাত বেগুন ভাজা, সবজি, আলুর দম, ফুলকপির ঝোল এইসবই ভালোলাগে আমার।

ভাবলাম ওর পাকা হাতে এগুলো ভালই খুলবে। কিন্তু ভবিতব্য। ভোজ হলনা। বরং একটু রোদ উঠলেই আমরা বেরোবো। কেয়া আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে মেলবোর্ন।

ব্রেকফাস্ট খেলাম। চিকেন স্যুপ আর সেদ্ধ ডিম দুই স্লাইস ব্রেড দিয়ে। অজস্র বার চা /কফি। মনটা আসলে আষাঢ়ের মেঘের মতন। ওর ঘরটি খুব সাজানো নয়। সাধারণ মানুষের ঘরের মতনও নয়। অজস্র শকুন ও বাজ পাখির মূর্তি ও পালক রাখা। নরমুন্ড একপাশে। কাজের ঘরগুলিতে তো বিরাট যজ্ঞ কুন্ড। কঙ্কাল, হাড় গোড়। কাপড়ের পুতুল। পেরেক। লাল আবীরের মতন এক খাবলা ধূলো। ছোট ছোট শুকনো পাতা। পুঁথির মালা। অনেক রোজারি বিডস্। কারণসুধা। চল্‌টা ওঠা বিকৃত মুখোশ।

অফিসের নাম আফিফা পাদিরি -জ ডেন (অ্যাফ্রিকার কোনো ভাষায় আফিফা মানে স্পিরিচুয়াল আর পাদিরি আমাদের পাদ্রী।

কেয়া অ্যাফ্রিকান ভু ডু ও কালা জাদুতে পারদর্শী। বহু ক্লায়েন্ট আসেন ওর কাছে দূর দূরান্ত থেকে কারণ ওর মারা বাণ লক্ষ্যভেদ করে অর্জুনের মতন। নিপুন তীরন্দাজ সে।

ভু ডু হল স্পিরিটের খেলা। খেলা খেলাবার কথা সর্প দেবী, রামধনু দেবদেবীর চেতনার -লোকের উপকারের জন্য।

বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে যে মানুষকে হেল্প করার জন্য এই বিদ্যা আসলে লোকে আসে বেশি ক্ষতি করতেই। শত্রু নাশ। আত্মীয় পরিজন বধ। স্ত্রীর মৃত্যু কামনা। সন্তানের ক্ষতি এইসব। নানাবিধ। এক একটি স্পেলে সব খতম। যাকে উদ্দেশ্য করে স্পেল ছাড়া হয় তার না লাগলে ফিরে আসে উদ্যোগপতির দিকেই কাজেই এই বিদ্যা ভয়াবহ। মারণ উচাটন বশীকরণ। হয়ত টেকনিকটা আলাদা।

২০১২ সালে আমার বান্ধবীর সামনে বসে আমি। আমেরিকা থেকে পাশ করে আসা এক রোবট বিজ্ঞানী কী করে হয়ে উঠলো আমাদের ভিকটোরিয়া স্টেটের এক তুখোড় কালা জাদু স্পেশালিস্ট তা মানুষকে জানাতেই এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি।

অপেক্ষা করেছি এক টুকরো রোদের। কুয়াশার জাল কেটে ধেয়ে যাবে আমাদের চারচাকা শহর অভিমুখে। এই পরিবেশে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে। অভিশপ্ত আত্মারা চারিদিকে ঘাপটি মেরে বসে আছে মনে হয়। শিরদাঁড়া বেয়ে হিমস্রোতের খেলা।

কেয়া ভালো নেই। আমিও ভালো নেই। এমন কিছু শুনতে হবে কাল আসার আগেও ভাবিনি। তাহলে আসতামই না।

উলের পোশাক পরে ঘরে ঢুকলো কেয়া। মুখটা উজ্জ্বল। বললো : আরে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। তোদের ডাইজেস্ট করতে সময় লাগবে। দিস ইস লাইফ।

জীবন শুধু সামনের দিকে বয়ে চলে। ডোন্ট লিভ ইন দা পাস্ট। যা হবার ছিলো হয়ে গেছে। এখন শুধু শবরের প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আমি। নরকের আহ্বান শুনতে পাই। সয়ে গেছে। নরকটা কেমন জানি। ধ্যানে দেখেছি। ডিফর্মড বডি নিয়ে প্রাণীরা। আলো নেই বাতাস নেই। শুধু নেগেটিভ ইমোশনস্। একে অপরের ক্ষতি করে চলেছে সেখানে সাংঘাতিক হিংস্র কনশাসনেসরা। তবে আমার কাছে তারাও শ্রদ্ধেয়। আমার আপন মায়ের চেয়ে। ইকোনমিস্ট মা। বোর্ড, ইউনিভার্সিটির টপার। দিল্লী স্কুল অফ ইকোনমিক্সে টপার। ম্যাক্রো ইকোনমিক্সে দক্ষ। অ্যাকাডেমিক সার্কেলে শ্রদ্ধেয়। পুজিতা। নিজের মা। দশমাস দশদিন পেটে ধরে যে জন্ম দিয়েছে। সেই মা।

হাসলো কেয়া। মুখে মেঘ। হাসিতে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ। ঘর অনুভূতিহীন। এখানে আবেগ মৃত। কোণায় দাঁড় করানো বিরাট একটি ঘড়ি। ঢং ঢং করে বাজে। কেমন গা ছম ছম করে এই ভৌতিক পরিবেশে। এখানে মনে হয় আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। কথা বলে। আড্ডা দেয়। তান্ত্রিকের ঘর বলে কথা! নামটা হয়ত অন্য ---ভু ডু। কেয়া বললো : আমার দীক্ষাগুরু বলেছিলেন : কোনদিন এই বিদ্যা মানুষের ক্ষতিসাধনে লাগাবে না। তাহলে নিজের ক্ষতি হবে সব থেকে বেশি। এই বিদ্যা দিয়ে লোকের প্রবলেম সলভ করবে। ভাঙা বিয়ে জোড়া দেওয়া, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা, পাগল ছেলেকে ঘরে ফেরানো এইসব। অন্যায় নির্মূল।

আমিও ভালোমানুষের মতন ঘাড় নেড়েছিলাম। আসলে আমি লোকের ক্ষতি করার জন্যেই এই বিদ্যা আয়ত্ব করি। সাইকিক ক্ষমতা ছোট থেকেই ছিলো। চর্চা করিনি কোনদিন। এবার কাজে লাগালাম। নিজের পরিবারকে শেষ করতে আমি এই বিদ্যা রপ্ত করি। নিজের ভাই, ভাইয়ের বৌ, ভাইপো ভাইঝি। এবং মা।

আমারই মারা বাণে মা মারা যান গাড়ি দূর্ঘটনায়। এক ভাই পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায়। ওকে সাইকো ওয়ার্ডে দিয়ে এসেছে সোসাল ওয়ার্কার। অন্যজন অন্ধ। ভাইয়ের বৌরা কেউ ল্যাংড়া, কেউবা ড্রাগ এডিক্ট। ভাইপো ভাইঝিদেরও একই দশা। সবকিছুরই দায় আমি নিচ্ছি। হা হা হা ---- নিষ্ঠুর হেসে ওঠে কেয়া।

ওকে এইভাবে কোনদিন হাসতে দেখিনি।

ঘর কাঁপিয়ে, আমার সমস্ত সত্ত্বা দুলিয়ে হেসে ওঠে। হা হা হা। নির্মম তরঙ্গ ধ্বনি।

কাকিমা হিংসে করতেন কেয়াকে। নিজের বিবাহিত জীবন কোনদিন সুখের হয়নি। পাগল স্বামী। অপগন্ড দুই ছেলে। কেয়া আমেরিকায় গিয়ে বিয়ে করে রজারকে। খুবই ভালো ছেলে সে। ভারতে গিয়ে হাত দিয়ে ভাত মেখে খেতো। মাটিতে বসে। ওর পরিবারটিও খুব ভালো ও রুচি পূর্ণ। বিরাট ফার্ম হাউজ ওদের সেখানে সবাই মিলে থাকে। রাতে সবাই ডিনার টেবিলে হাজিরা দেয়। পয়সাও প্রচুর। ধনী, অভিজাত।

রজারের বাবা কেভিন মেলবোর্নের অন্যতম নামী নিউরো সার্জেন। মা চাষ বাসে পটু। অনেক ভাইবোন। সবাই প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসায়ি। এক সাথে থাকে তবুও। ফার্মে বড় বড় বাড়ি ওদের। কাকিমা এসব দেখে ঈর্ষান্বিতা। নিজের দুই ভাইকেও কেয়াই এখানে এনেছে পয়সা দিয়ে। একজন প্যারামেডিক্স হিসেবে কাজ করে অন্যজন গার্ডেনার একটি বড় কোম্পানিতে। লোকের বাড়ি গিয়ে বাগান সাফ করে। বড় বড় শপিং মলে ও অফিসেও করে। ওদের বৌরা অস্ট্রেলিয়ান। কেটি ও মণিকা। একজন চুল কাটে অন্যজন শপিং মলে হিসেব নিকেষ করে। ওদের ছেলেপুলে আছে। যারা সবাই এখন ডিসেবেল্ড্ অথবা অর্ধমৃত। শুভাকাঙ্খী পিসি বা সহোদরার মারা বাণে। ব্ল্যাক ম্যাজিকে। মুখ থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে নিলাম।কাঁহাতক আর পড়ার ভান করা যায়?

সরাসরি প্রশ্ন করলাম : শুধু ঈর্ষা করতেন বলেই কি এমন করলি?

কেয়ার দুই চোখে অঙ্গার। জ্বলেছে মণি যুগল।

জোরে জোরে টেবিলে থাপ্পর মেরে বলে : নাহ্ নাহ্ নাহ্। আমাকে ছেলেমানুষ পেয়েছিস নাকি? জানিস আমার মা আমাকে ডার্ক স্পিরিট পাঠিয়েছিলো। তাতে আমার সুখের সংসার ভেঙে গেছে। আমার শরীর বাসা বেঁধেছে দূরারোগ্য এক ব্যাধি যার কোনো চিকিৎসা নেই। আমার মন ভেঙে গেছে। জলের মতন টাকা বেরিয়ে গেছে।

সবটুকু শান্তি নিয়েছে ঐ বিচ! ইয়েস দ্যাট ব্লাডি বিচ! অ্যাসহোল। বলে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে ফাকিং এর সাইন -- কাম কাম সিট অন দিস ইউ বাস্টার্ড। কেমন লাগছে? আরাম লাগছে?

নিজের মাকে উদ্দেশ্য করে বলা এই কথায় লজ্জায় আমি মুখ নামিয়ে ফেলি।

পরিবেশ খুব ভারী। দরজায় কার পায়ের আওয়াজ। এক ক্লায়েন্ট। মিস্টার ডোনাল্ড।

হয়ত কারো ক্ষতি করার জন্য এসেছেন! ব্ল্যাক ম্যাজিক। ভাগিয়ে দিলো কেয়া।

- যাও যাও আজ ভাগো। পরে এসো আমি এখন মেলবোর্নে যাবো, দেখছো না আমার শৈশবের বন্ধু এসেছে !

লোকটি ব্যাজার মুখে চলে গেলো।

কাকিমা নাকি কৈশোর থেকেই আত্মা নামাতে পারতেন কিন্তু কাউকে বলতেন না এই বিদ্যার কথা যে উনি একজন ভালো মিডিয়াম। ডার্ক স্পিরিট নিয়ে খুব সহজেই খেলা করতে পারতেন। ভয়ানক সব দুরাত্মা ওর ডাকে আসতো।

এক তান্ত্রিকের শিষ্যত্ব নেন। ভদ্রলোক থাকেন আসামে। এক বনে।

নিয়মিত কামাখ্যায় যান। বৃদ্ধ। কাকিমা অবশ্য বহুদিন যাবৎ ওর কাছে যান নি। হয়ত গুরুমারা এই কালো বিদ্যা গুরুর সম্মুখে মেলে ধরতে ভয় পেতেন।

ডার্ক স্পিরিট দিয়েই ঘর ভাঙেন কেয়ার। আর্থিক অনটনে ফেলেন ওকে, শারীরিক অসুবিধায়ও যাতে সে নিজের স্বামীর সাথে যৌন জীবনে অসুখী থাকে। মূলত রজার এই কারণেই ওকে ছেড়ে যায়।

-সি ইজ ফ্রিজিড। বলেছে সে নিজের বন্ধু মহলে। কেয়া পরে শুনেছে।

দুই ভাইও ওকে অনেক হেনস্থা করেছে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্মের সময় ওকে ডাকেনি। জন্ম দিনে নয়। পালা পার্বনে নয়। বাবা যখন অ্যাসাইলামে মারা গেলেন কেয়াকে ওরা ঢুকতে দেয়নি সেখানে এবং পরে ফিউনারালে।

শ্রাদ্ধে ডাকেনি। কেয়া ওর বাবার বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলো।

খুব দু:খ পায় সে। আত্মীয় পরিজনের কাছে ওর সম্পর্কে ওর মা ও ভাই/বৌরা কুৎসা রটায়। ওর ব্রিলিয়ান্সকে খাটো চোখে দেখে। নোংরা ইঙ্গিতে করে।

কেয়া মরমে মরে যায়।

অবশেষে চরম পথ নেয়। অ্যাফ্রিকান ব্ল্যাক ম্যাজিক এর দ্বারস্থ হয়।

মুখে করুণ একটি ছায়া। মুখটা খুব কালো। নাকি গাঢ় নীল ?

- আমার মা কে দেখলে লোকে মা শব্দটাকে ঘেন্না করবে। কেউ আর কোনদিন মায়ের বাচ্চা হতে চাইবে না এই জগতে। এই কি মায়ের নমুনা ??

কেয়ার মুখে ঘন মেঘ, বাইরে অল্প রোদের আভাস।

ও কয়েকবার অ্যাফ্রিকায় ঘুরে এসেছে যেখানে এই ভু ডু জন্মেছে। তবে ও এখন যেটা করে সেটা অনেকটাই ওর নিজস্ব পদ্ধতি। অরিজিন্যাল ভু ডু নয় কারণ ও বাজে আত্মাদের কাজে লাগায়। ওর মায়ের মতন। লোকের ক্ষতি করে।

বলে : এইসব বিদ্যাকে যারা অসং ভাবে ব্যবহার করে তাদের জন্য নরকের দরজা খোলা আছে। আমি পরিষ্কার দরজাটা দেখতে পাচ্ছি। শুধু একটাই শান্তি যে ওদের আমি শাস্তি দিতে পেরেছি।

এবার আর না থাকতে পেরে আমার শুভ বুদ্ধি বলে ওঠে : ভগবানের ওপরে ছেড়ে দিলে হতনা ? তিনিই তো সবার দন্ড মূন্ডের কর্তা। তাঁকে কি ফাঁকি দেওয়া যায় ?

ভীষণ পাশবিক ভাবে হেসে ওঠে কেয়া। বাড়িটা যেন কেঁপে ওঠে।

বাইরে আলোমালা নাহলেও রোদ্দুরের হাতছানি। বিদায় নেবো এবার। কেয়া বলে : চল যাওয়া যাক। গাড়িতে উঠে বলে : আমার সাথে গাড়িতেও আত্মারা থাকে। ভয় পাসনা। কাল জানতিস না আজ জানিস ! ওরা দানব, মান্ত্রিক, পতিত দেবদূত। শক্তি আছে কিন্তু ডার্ক পাওয়ার। শুভ শক্তি নয়। গাড়ির মধ্যে উল্টোপাল্টা কিছু দেখলে চিল্লাস না ! তবে ওরা বাধ্য আত্মা। হলই বা ডার্ক। আঁধারের বাসিন্দা। আমার মানুষী, পন্ডিত মায়ের চেয়ে অনেক ভালো। শোন, তোর ভগবানের বিচারে আমার আস্থা নেই। পরের জন্মে আমার মা কি শাস্তি পাবে, ভাই ও তাদের বৌদের কী ভোগান্তি হবে আমার তাই নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই। এই জন্মে ওদের নি:শেষ করতে পেরেই আমি খুশি। অন্তত নিজের বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার। টিট ফর ট্যাট। আমার পয়সায়, চেষ্টায় দুটো অকাল কুষ্মন্ড দাঁড়ালো। যখন ওদের সংসার ভরলো তখন আমাকেই ওরা ছেঁটে ফেললো ?? কচি কচি শিশুগুলো বংশে এলো, আমাকে ডাকলোও না। পাড়া পড়শীদের জানাচ্ছে !

ওদের একবারও মনে হলনা যে দিদির একটা বাচ্চা নেই ??? আর ঐ মা ! ও কি মা ? বসে বসে সমস্ত অনাচার বরদাস্ত করে চলেছে আর আমাকে ডার্ক স্পিরিট পাঠাচ্ছে ? এক সাইকিকের কাছে গিয়ে জানতে পারি এইসব। ভেরিফাই করি অন্যত্র। তবেই স্যাঙ্গুয়িন হই।

কেয়ার চোখের জল বৃষ্টির আকার পড়ছে অঝোর ধারায়। সামনেই খাদ। মৃদু স্বরে বলি- গাড়িটা একপাশে দাঁড় করা। নেমে একটু হেঁটে আসি খাদের নিচে। মাথাটা ভীষণ ভারী লাগছে।

একটু সুস্থ লাগলে আমিও এবার দেখবো জীবনের ওদিকটা কেমন ! ঐ কালো আত্মার খেলা, ভু ডুর মেলা। ব্ল্যাক ম্যাজিক। বিজ্ঞানের আড়ালে মায়ার খেলা। সুক্ষ্ম শরীরের পরশে মানবজমিনের সংঘাত নির্মূলের ব্যবস্থা। ঘোর অমানিশায় লুপ্ত চাঁদের আলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না এখানে। প্রেতলোকে জীবাত্মারা বায়বীয় দেহে লোকের ক্ষতিসাধনে ব্যস্ত। সব জানবো, দেখবো। আঁধারের ওপাড়ে কী আছে।

এখন তো সবে রোবট গোধূলি।

কফির পেয়ালায়

আমার বাড়ির পাশেই একটি মুসলিম পরিবার থাকে । অসম্ভব চিৎকার চেঁচামেচি করে । বেশ কিছু মহিলা ও পুরুষ থাকে । কয়েকটি কিশোর ও শিশু । যৌথ পরিবার । মনে হয় ব্যবসা করে । অনেকগুলি গাড়ি । বড় বাগান বাড়ি । দেবদারু গাছে ঢাকা পথ ।।এঁদের নাম জানিনা । মুখ চেনা । কিশোরগুলি আমাদের বাগানে বল পড়লে কুড়াতে আসে ।

আমি শহরের আনাচে কানাচে ঘুরি । মানুষ দেখি, জানি ।

একদিন শুনলাম ফাহিম এর কথা । মেলবোর্নের লোকপ্রিয় কফি কাপ রিডার । অর্থাৎ

Tasseography করেন (চা কফি রিডিং) । এমনি ফরচুন টেলার হলেও পেশায় এক ব্যস্ত কসমেটিক সার্জেনের সেক্রেটারি ও তাঁর ক্লিনিকের সহকারি ক্লার্ক । নাহ্ চরিত্র বুনছি না ।

নিজ চক্ষে দেখা । নিজ কানে শোনা ।

তরুণ তুর্কি ফাহিমের কথা অনেক শুনেছি । একদিন দেখা করতে গেলাম । মাত্র দুদিনের মধ্যেই ইমেলের উত্তর আসে ও একমাস পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ।

এক বুধবার দুপুরে আমি ফাহিমের ঘরে । ওক্লে বলে একটি জায়গায় । সাবার্ব । ঘন সবুজে ঘেরা বাড়ি । রাস্তার একটু ভেতরে । ঢুকতেই কাঠের বিরাট একটি চাতাল । সেটি পার হলে ফাহিমের ঘর । তুর্কি পুরুষ । একাই থাকে । বাইরের ঘরে কফি কাপ পড়ে ।

তুর্কি কফিবীজের কফি খাওয়ায় । তারপরে রিডিং হয় । নিচে ঘন কফি থাকে সেটি প্লেটে উল্টে নিয়ে কফির কাপে কফিকৃত ডিজাইন ও ঘনত্ব দেখে ভবিষ্যৎ বলেন । ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ।

নিঁখুত করেন তাই সিডনি, ব্রিসবেন, ডারউইন, ক্যানবেরা থেকেও মানুষ আসেন দলে দলে । ১৫০ ডলার চার্জ একটি রিডিং এর । বাণী জানা গেলে

একটি স্কেচ দেন। সেটি ঐসব ডিজাইন ও সেই সংক্রান্ত নির্দেশ। যা নিয়ে পরে ওকে আপনি চ্যালেঞ্জ করতেও পারেন।

এতটাই ওর কনফিডেন্স। আত্মবিশ্বাস।

আমি ভারতীয় শুনে একগাল হাসলেন তারপর বললেন : বাঙালী কি ?

বলি : হ্যাঁ।

ঘরটা একটু অন্ধকার। কারণ বাইরে বড় বাগান। অনেক গাছ।

একটু ছায়া ছায়া। ছায়ানীল সীমানা।

ফাহিম উদার, ভালোমানুষ। খুব ভালো গাঢ় কফি বানায়। এসেছিলো টার্কি থেকে ওর বাবা এখানে ভাগ্যের সন্ধানে। পরে এখানেই থেকে যান।

: আমার স্ত্রী ছিলেন বাঙালী। মিটা নাম। মানে মিতা। এখন আমরা সেপারেটেড। ও থাকে বেন্ডিগোতে।

ফাহিম হাসে। আবার বলে : আমি জানতাম ওর সাথে আমার বিয়ে টিঁকবে না।

আমি কফির কাপে দেখেছিলাম সর্বনাশের আলো। তবুও বিয়ে করি কারণ আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম।

আমি আসলে বেশ কয়েকবার ওর কাছে গেছি ইতিমধ্যে। ভাব হয়ে গেছে।

আমারও লোকের সাথে মিশে যাবার বদাভ্যাস আছে। অচেনা লোক ডেকে বাড়িতে খাওয়ানো। ঘোরা। আমার ভালোলাগে। আমি মানুষের গায়ের গন্ধ খুঁজি।

: মারিয়া ও মারিয়া হাউ আর ইউ ?

এক বুড়ি এলো হন্তদন্ত হয়ে। মাথায় গোলমাল আছে। রাস্তায় ঘোরে। পয়সা চায়। খাবার কিনে খায়। ফাহিমকে মারিয়া বলে। ওর হারানো মেয়ে ভাবে। ফাহিম নিরুত্তর।

হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে ঘরের বাল্বটি ভেঙে পড়লো। ফাহিম ওদের ভাষায় কি বলতেই বুড়ি উঠে বাইরে চলে গেলো। বাল্ব ভেঙে গেলে অমঙ্গল হবে।

তাই আমরা ঘরের বাইরে চলে এলাম। পরে ফাহিম গিয়ে কাচের টুকরো সাফ করে বসলো। আসলে বোধহয় ঐ আলোতে গরম জলের ফোঁটা পড়েছিলো। বাল্বটি বেশ নিচে ছিলো। ফুটন্ত জলের সসপ্যান পাশেই।

ফাহিমের স্ত্রী মিতা ব্যালারাট হাসপাতালে দোভাষীর কাজ করতো। এখানে এসেছিলো বাংলাদেশ থেকে বিশেষ ভিসায়। তার আগে ছিলো ভারতে। বনগাঁয়ের দিকে থাকতো। সেখান থেকে এক মুসলমান ছেলের সাথে পালিয়ে যায় বাংলাদেশে। গিয়ে দেখে ছেলেটির স্ত্রী বিদ্যমান। যৌথ পরিবার। আগের পক্ষের সন্তানও আছে। বেশ কটি। গায়ক আসলাম ইসলাম নাম সেই ছেলের আজকালকার বিবিধ প্রাইভেট চ্যানেলের বিদেশী গায়ক। মিতা ওখান থেকে পালিয়ে যায়। অ্যাসাইলাম সিকার হয়ে এইদেশে ঢুকে পড়ে। তারপরে ঐ হাসপাতালে সে দোভাষীর কাজ নেয়। যেইসব রুগী ইংলিশ জানেন না তারা ওর মাধ্যমে চিকিৎসক ও নার্সদের সাথে বাক্যালাপ করতে সক্ষম।

এতক্ষণ ভাবছিলাম মিতা ওর বিয়ে করা বৌ। আদতে তা নয় সেটা আজ জানলাম।

মিতার সাথে ও ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করে। আমরা ভারতীয় বলে বোধহয় বৌ বলেছিলো। কারণ আমরা রক্ষণশীল। সেই ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডে একটি মেয়ে হয় যার নাম দিলারা।

মেয়েটিকে মিতা ওর কাছে দিয়ে যায় গুগুলে ওকে সার্চ করে কারণ ও লোকপ্রিয় কফি কাপ রিডার। তার আগে অবশ্যই ডি এন এ টেস্ট হয়।

কিছুদিন ফাহিম ওকে নিজের কাছে রেখেছিলো। তারপরে চলে গেছে হোস্টেলে। মাঝে মাঝে আসে বাবার কাছে। মেয়েটির থ্যালাসেমিয়া গোছের কিছু রক্তরোগ আছে।

: নিজের ভাগ্য নিজেই পড়ো ?

: নাহ্ নিয়ম নেই। আমার বন্ধুদের দিয়ে পড়াই। মিতার ভাগ্যও পড়েছি। আমার মেয়েরও। ও আর মাত্র ১৫ বছর বাঁচবে।

হাতটা ঝুলিয়ে বসে ও চেয়ারে। দেখলাম একটি হাত অন্যটির চেয়ে একটু খাটো। দেখতে খুবই সুপুরুষ।

অনেকটা আমাদের ইরানী ফুটবলার জামশেদ নাসিরির মতন।

নিজ কন্যার মৃত্যুসময় জেনেও এত হাসিখুশি। আমি জানি ও সত্যি বলছে কারণ ওর রিডিং নির্ভুল।

আরেক কাপ কফি এলো। এটা রিডিং এর জন্য নয়। পান করার জন্য। আমি কফি খুব একটা চেরিশ করিনা। আমি চায়ের কনোসার মানে বেশ গভীর ভক্ত।

ফাহিম মুখে একটু হাসি এনে বললো : তুমি এত গম্ভির কেন ?

বলি : নিজ স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তিত।

ও বলে ওঠে : তোমার আয়ু সত্তর বছর। একান্তরে মারা যাবে চন্দ্রের প্রকোপে। এখনও অনেক সময় আছে। সামনে তোমার সুসময় আসছে। আগামী ২৫ বছর তোমার জীবনের রং বদলে দেবে। মুখটায় হাসি আনো আমার মতন। দেখো না মিতার সাথে আলাপ এক কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে। আমার ল্যাপটপটি সারাতে দিয়েছিলাম। ওরা সমস্ত পার্সোনাল ডেটা নিয়ে নিলো। পরে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে আরম্ভ করলো কিছু লেবানিজ ছেলে।

আমি তো বুঝতে পেরেছি যে এগুলো ওরাই করছে। তখন দোকানে গিয়ে শাসাই। সেখানে মিতা এসেছিলো ওর ল্যাপটপ নিয়ে। কথায় কথায় আমার দূর্ভাগ্যের কথা শুনে ও কোমল হৃদয়ের পরিচয় দেয়। আমরা একটি মোটেলে রাত কাটাই। ওখানেই উই হ্যাড ম্যাড লাভ মেকিং সেশান। সব টেন্‌শান চলে গেলো। পরে দোকানের বিরুদ্ধে কেস করি ও জিতি।

অনেক টাকা পাই।

আমি এখন বড়লোক। বলেই মিষ্টি হেসে উঠলো।

বুড়িটা আবার এসেছে। এবার হাতে গরম গরম চিকেন উইংস এর ঠোংগা।

ফাহিমকে দিলো । আমাকেও । ওর মেয়েটি মরে গেছে তাই মাথার গোলযোগ দেখা দিয়েছে । ফাহিমকে ওর মেয়ে মনে করে । দাঁড়ি গোঁফ সত্ত্বেও ।

চিকেন ডানা গুলি বেশ সুস্বাদু । কে এফ সি থেকে এনেছে । বুড়ি পয়সা নেয়না ।

ফ্রি তে ভালই খানা জুটলো ।

ফাহিমের বিয়ে না করা এক রাতের পাতানো বৌ মিতা এখন খুব ধনী । কাজ করেনা প্রায় ।

একটি বিউটি প্রোডাক্ট ব্যবহার করে ওর চামড়ার কিসব হয়েছিলো । তাতেই ঐ কোম্পানিকে সু করে অনেক টাকা পায় । নিয়মিত কিছু করে ওকে দেয় । আজও ।

সে বেন্ডিগোতেই থাকে একটি বাড়িতে । ফাহিম ওখানে যায়না । মেয়েকে দেখতে মাঝে মাঝে মিতা আসে । মেয়ের কোনো দায়িত্ব সে নেবে না কারণ ও কমিটমেন্ট ফোবিক ।

মাঝে মাঝে এখানেও আসে । কফি কাপ রিডিং দেখে ।

ফাহিমের মুখে মেঘ : বলে : একরাতের আনন্দ নিয়েছিলাম । বিয়ে করিনি । ও করবেও না । ও কোনো রিলেশানে জড়াতে চায়না । আগের সেই ছেলেটির কথা মনে করে ভয় পায় । আমাকে এত বছরেও চেনে নি । আজ মনে হয় মিতাকে আমার ভালোলাগে ।

আমার আরেকটি বাসা আছে জানোতো ! অন্য একটি সাবার্বে ।

ওখানে আমার দাদা বৌদি ভাইপো ভাইঝিরা থাকে । আমি এখানে থাকি ওখানেও যাই প্রায়ই । বৌদি বিয়ের জন্য বলেন । আমার মেয়ে দিলারাকে বৌদি দেখেছেন । ভালোবাসেন । দিলারাও জেঠিমা অন্ত প্রাণ । মাকে তো তেমন পায় না !

দিলারাকে মিতা একটু বাংলা শিখিয়েছে । ও গাইতে পারে : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ।

বলে কি ! তুর্কির মেয়ে বাংলা গান গায় !

আমি একটু সন্দিহান । মানুষের মন তাও ভারতের মতন দেশ থেকে এসেছি যেখানে সরলতা মিউজিয়ামে বন্দী । বলি : সত্যি ? চোখ আপনা আপনিই বড় বড় হয়ে যায় ।

আমার চোখ অবশ্য সাইজে বেশ বড়ই ।

কলেজে নাম ছিলো মৃগনয়নী । দিদিরা ডাকার থেকেও দাদারা ডাকলে বেশি খুশি হতাম ।

সেই বড় চোখ দেখে ফাহিমের মায়া হল ।

বললো : হ্যা । বলে একটি সিডি চালিয়ে শোনালো । মেয়ের ভারি মিষ্টি গলা । আর মাত্র ১৫ বছর ওর আয়ু, ওর বাবা বলেছে ।

আমি নির্লজ্জ ও কৌতুহলি ।

বলি : মিতার সাথে মিতালি কিরকম পর্যায়ে ? হ্যাভ ইউ স্লেপ্ট উইথ হার ?

ফাহিম কফির কাপে তুফান তুললো না । ও এমনিতেই মৃদু ভাষী । লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে : সামটাইম্‌স । ইট ডীপেন্ডস অন হার মুড ।

: অন্য পার্টনার জোটাও না কেন ?

: আই স্টিল লাভ হার সি ইজ সো চার্মিং ।

ছবি দেখেছি –সামনা সামনি দেখার সৌভাগ্য হয়নি ।

বেশ সুন্দর চেহারা ।

অনেকটা অভিনেত্রী মৌসুমি চ্যাটার্জ্জির মতন দেখতে । গজ দাঁত । আবার হাসলে টোল পড়ে মানে বোনাস ।

ফাহিমের বিরাট ক্লায়েন্ট বেস। অনেক কলেজের ছেলেপুলেরাও আসে । দূর্দান্ত রিডিং, একদম ফাটাফাটি । ওদের মধ্যেই কারো সাথে একদিন মিতা লিভ ইন শুরু করে । ফাহিমের সামনেই । আজও আসে মেয়েকে দেখতে মাঝে মাঝে ।

ফাহিম প্রশ্ন করলে বলে : ওহ হো তুমি তো আমার ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড ! আর ও পার্টনার।

তবুও ফাহিম একা। ওর একাকীত্ব আমার অসহ্য লাগে।

পতিদেব শুনে বলেন : কি এবার ঘটকালির ব্যবসা আরম্ভ করবে নাকি ?

সত্যি একটি মানুষ সফল, ব্যস্ত, একা থাকে। চিন্তা হবেনা ?

রাতবিরেতে বাড়ি এলে এক কাপ উষ্ণ কফি ! মন্দ কি ?

কিন্তু আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপরে তো দুনিয়া চলবে না !

আমার মাসতুতো বোন এম আই টি তে পড়তে গেছে। সেই আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস্।

ওর বহুদিনের ইচ্ছে একটি আরবী গোছের বয়ফ্রেন্ড হোক। দেশে থাকতে কেউ ছিলোনা ওর।

একা। নো বয়ফ্রেন্ড। সুন্দরী সুশ্রী সুমধুর হওয়া সত্ত্বেও।

আমি জানতে চাইলাম : আরবী কেন ?

ও বলে : কারণ ওদের ভাষাটি বড় মধুর। আর আরব্য রজনীর গল্প তো প্রাণ ছুঁয়ে যায় আজও। আরব্য প্রেমগুলি কি মধুর, রোমান্টিক। মধুঋতুর খেলায় ভরপুর। চমৎকার।

বোন সুদূর ম্যাসাচুসেট থেকে আমার কাছে বেড়াতে এসেছে লম্বা এক ছুটিতে।

পাশের বাড়ির ঐ চিল্লা মেল্লি করা অভদ্র লোকগুলি পিকনিক করছে নিজেদের বাগানে। আমার বোনকে নিয়ে গেলো। লোকগুলো তারস্বরে পাড়া কাঁপিয়ে কথা বললেও এমনি মন্দ মানুষ নয়। কিছুর ব্যবসা করে।

আমার বোন ফিরে এসে ওদের নানা কথা বলতে লাগলো। কেমন ওরা বোরখা পরে থাকে।

সুইমিং কাস্টিউমের ওপরে হাফ বোরখা পরেছে একজন। নিচে প্যান্টি ওপরে মুখটা শুধু ঢাকা।

আমার বোনের ওখানে একজনকে ভালো লেগেছে। ওদের দেশের ছেলে। মুসলিম। আরবী জানে। ঐ ভাষায় গান করে। দারুণ লাগে আমার বোন কোয়েনার।

হৃদয় পাগলপারা। দোলে দোদুল দোলে দোলনা। শ্রুতি মধুর সংগীত।

এরপরে আমার বোন যতদিন ছিলো ওখানে যেতে লাগলো। সেই ছেলেটি মানে ওর প্রিন্স চার্মিং ও আসতো। ওর ইন্তেলেকচুয়াল ব্যাপারটি ছেলেটিকে আকর্ষণ করেছে। আর ওকে নাকি ছেলেটির হারানো প্রেমের মতন দেখতে।

বোন চলে যাবার পরে একদিন আমি গেলাম ওদের বাড়ি। আমাকে আগেও ডেকেছে আমি যাইনি। ঐ চীৎকার করে কথা বলা দেখলে খুব বিরক্ত লাগে। আমি নিজে সুগার রুগী। শেষকালে দুই পক্ষের চিল্লামেল্লি তে আবার মারদাঙ্গা না হয়ে যায় তাই ওদের একটু এড়িয়ে চলতাম। পতিদেব গেছেন সামাজিকতার খাতিরে কয়েকবার।

আমার বোনের ঐ বীর আরবী জানা যুবককে ভালোলাগায় এবার আমিও গেলাম কানে তুলো গুঁজে। কারণ বোন অলরেডী ৩০। আর কবে যাবে ছাদনা তলায় ?

<u>এম আই টি</u> তো হল এবার <u>বিয়েটি</u> নাহলে পদস্খলন হতে কতক্ষণ ? বিদেশ বিভুঁইয়ে?

হে হে। তাই একপ্রকার পাত্র ছিপে ধরতেই যাওয়া আরকি !

পূর্বজা বলে কথা ! হলামই বা কাজিন।

ছেলে না বলে লোক বলা ভালো।

আগের পক্ষের একটি সন্তান আছে। তাতে আমার বোনের কোনো অসুবিধে নেই কারণ ও খুবই লিবারাল। বিয়ে হয়নি যদিও কখনো।

ফাহিমের অন্য বাসাটি আসলে আমারই পাশে। এতদিনের আলাপ হওয়া বন্ধু আমার আদতে আমার পড়শী।

ফাহিম যে এত ভালো গান করে জানতাম না।

আমার বোন একটা গান খুব ধরেছে : সেনি অব তুর্ক ইজি হাবিবি।

মানে ফানে জানিনা ভায়া। আমি আরবী তুর্কির তফাৎ বুঝিনা।

বোনকে ধরতেই ও বললো : মানে দিয়ে কি হবে ? আমি ফাহিমের সাথে প্রেমের ভাষায় কথা বলি। কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে বলিনা তোমাদের মতন ! অ্যান্ড ইউ নো লাভ ইজ আ ভার্ব !!

বেগুনি জেটিতে চুমকি লণ্ঠন

গোলাপ বোসের বিকেলটা কাটে সমুদ্রের ধারে । আজকাল তার চাকরি নেই । সম্প্রতি কাজ ছেড়ে দিয়েছে । একটি কোম্পানিতে নিয়োগকর্তা হিসেবে ছিলো ।

দ্বিচারিতা করতে করতে আর পারছিলো না । চাকরির অ্যাড বার হয় আসলে পোস্ট গুলি ভুয়ো । চাকরি বাজারে নেই । তবুও দিতে হয়। লোকদেখানো । ওদের রিক্রুটমেন্ট কোম্পানির নাম ও লাজ বাঁচাতে ।এই দুনম্বরী করতে করতে ক্লান্ত গোলাপ অগত্যা কাজ ছেড়ে এখন বাড়িতে । পয়সার অবশ্যি তার অভাব নেই । কাজ তো করতো আগে ।

আগে আমেরিকায় ছিলো অনেকদিন । ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে । অত্যন্ত অপরাধ প্রবণ এলাকায় ঘুরে ঘুরে কেবেল টিভির কানেকশান বিক্রি করতো । লোকের বাড়িতে ঢুকে, কুকুরের তাড়া খেয়েও করতো এতটাই ডেডিকেটেড কর্মী সে ।

রোজগারও ভালই হত । একদিন ওর হাত পা ভীষণভাবে জখম হয়ে যায় একটি হিংস্র কুকুরের আঘাতে । তখন ওর স্ত্রী ও তৎকালীন পার্টনার

সোফি ওকে নিয়ে যায় তার ম্যানেজমেন্ট গুরু দাদার কাছে । তারই পরামর্শে শুরু করতে যাবে নব ব্যবসা এমন সময় সেই কুকুরের মালিক কোর্ট কেসে ফাঁসিয়ে দেয় গোলাপকে ।

কুকুর নাকি ঐ লড়াইয়ের স্ট্রেসে হৃদরোগ হয়ে অক্কা । আমেরিকানদের বাঙালদের মতন ঘন ঘন কোর্টে যাবার স্বভাব আছে । কথায় বলে : বাঙালরে হাই কোর্ট দেখাইতাসেন ?

সেরকম আমেরিকান কে কোর্ট দেখাতে হয়না । কারণে অকারণে কোর্টই লোকের কাছে আসে ।

কাজেই আরেক পাগল আমেরিকানের কারণে গোলাপের সব পাপড়ি অকারণে ঝরে যায় । হাজৎ বাস । অল্প কিছুদিন অবশ্য । তবু সেখানেও বিপত্তি । জেলার নিয়মিত রেপ করতে লাগে । কারণ সে ছিলো গে । সমস্ত কয়েদীকেই করতো ।

মানসিক অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় ছাড়া পেতেই সোজা সাইকোলজিস্টের দরবারে ।

সুস্থ হলে সোজা এই দেশ লাট্রোবে । এখন এখানে সমুদ্রের ধারে থাকে । বেকার তবে ভালো কাজ করার জন্য জমানো টাকা আছে । বৌ সোফি চোপড়া ভারতীয় । ওরই মতন । দাদা ম্যানেজমেন্ট গুরু । বেশ নামী । সোফি নিজে ছিলো ভূতাত্ত্বিক । ভারতে কাজ করতে বিভিন্ন ক্যাম্পে যেতো তেল খুঁজতে কিংবা পাথরের চরিত্র সন্ধানে । সেখানে দেখতো বিবাহিত/তা জিওলজিস্টরাও পরস্পরের সাথে ঢলাঢলি করে ও শয্যাসঙ্গিনী হয় ক্যাম্পে । বর /বৌরা থাকে শহরে । কিছু জানেনা ভাবে স্বামী রা স্ত্রীরা ধোয়া তুলসীপাতা । এইসব নোংরামো দেখে দেখে ঘেন্না ধরে যায় সোফির । ও কাজ ছেড়ে দেয় । এম বি এ করে ম্যানেজমেন্ট ফিল্ডে ঢুকে চলে আসে আমেরিকা । দাদার কাছে ।

- নোংরামো ইজ এভরি হোয়ার । বুঝলি । তোকে গ্লাভস্ পরে কাদায় হাত দিতে হবে। বলে হেসে উঠেছিলো দাদা সুজাত । ওয়াইনের গ্লাসটা পাশের গাঢ় বাদামী টেবিলে রেখে । তারপর সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে বলে ওঠে, বদ্ধ ঘরে সিগার খাওয়া ঠিক নয়, চল বাইরে হেঁটে আসি ।

বাইরে এখন হেমন্ত । গাছের পাতাগুলির রং ভারি সুন্দর । চওড়া রাস্তা । পথের ধারে অসংখ্য মরাল মরালী । সবুজ জলের পরিখা । সফেদ পাথর ।

দাদার কাছেই ম্যানেজমেন্টের হাতেখড়ি । সম্ভাবনা ছিলো । বিয়ের পরেই তো কাজ শুরু করলো পুরোদমে । তার আগে ট্রেনি ছিলো । কিন্তু বিয়ের পরেই ধরা পড়লো মারণ ব্যাধি, ওভারিয়ান ক্যান্সার । স্টেজ টু ।

অপারেশান । কেমো । রেডিও । সব চললো । নিচের দিকটা অসাড় হয়ে যাওয়াতে ও এখন হুইলচেয়ারে চলাচল করে ।

বাড়িতে একজন নার্স আছে । ডোনা । দিনের বেলায় গোলাপও থাকে ।

বিকেলে একটু ঘুরতে বার হয় । একসাথে খায় লাঞ্চ । সোফি খুব ভেঙে পড়েছে । সব সময় কাঁদে । চোখে জল ।

- তুমি এত কাঁদলে আমি কি করে বাঁচবো । মৃদু স্বরে বলে ওঠে গোলাপ ।

চোখে জলের বন্যা ডেকেছে যেন । কেঁদেই চলেছে সোফি ।

- তুমি এত শক্ত মেয়ে । আমাদের এত বিপদ গেছে । এতদিন এত স্ট্রং থেকেছো তবুও এখন এত কাঁদলে আমি কোথায় যাবো ?

হাতটা মুড়ে বসে গোলাপ । হাতে ধরা একটি বাসি গোলাপ ।

গতকালের কেনা । বাড়ি ফেরার সময় কিনেছিলো । সোফি ফুল খুব ভালোবাসে ।

- তুমি আমাকে একটু চুমু খাও, চুমু খাও ।

নার্সের সামনে প্রায় জোর করে চুমু খায় সোফি । এরকম রোজ করে ও । ইনসিকিউরিটিতে ভোগে । বিকেলে বেড়াতে গেলে মোবাইলে কল করতে থাকে । হয়ত ভাবে অন্য নারীতে যাচ্ছে কিনা ।

ও একটি ওষুধ খায় ব্যাথার জন্য - কেটামিন, এটি লিগাল ড্রাগ্স্, নারকোটিকের আওতায় এইদেশে আসে না এখনও যদিও অনেক দেশে আসে । লাট্রোবে দেশে ক্যান্সারের ব্যাথা কমানোর জন্য এই ওষুধ ব্যবহার

করা হয়। গোলাপ ধীরে ধীরে এই ওষুধে আসক্ত হয়ে পড়ে। একটু একটু করে ওর ওষুধে বাক্স থেকে সরিয়ে কেটামিন নিতে আরম্ভ করে।

সেদিন বিকেলে স্বর্ণালী আবহাওয়া। রোদের আভাস। রাত হয় নটায়। তার আগে অবধি ঝলমলে আলো থাকে। এখন গরমকাল। আজ আবহাওয়া ভালো তাই সৈকতে অনেক মানুষ। তবে কয়েকদিন ধরেই খুব গরম পড়ছে। এখানে গরম পড়লেই বৃষ্টি হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত এর অন্যথা হয়নি।

পাড়ে ড্রাগস পুলিশে গাড়ি দেখে ভয়ে জেটিতে উঠে যায় গোলাপ। যদিও ও কেটামিন নেয় সেটা লিগাল তবুও মনের কোণে কোথাও একটি অপরাহ্দ বোধ হয়ত ছিলো নারকোটিক কথাটি মনে গেঁথে যাওয়ায়। আইন তো সীমাবদ্ধ কিন্তু মন তো নয়। যা এইদেশে সম্ভব নয় তা অন্য দেশে হয় সেই থেকেই মনে আসে ভয়। হং কং কিংবা ক্যানাডায় এই ড্রাগসই ভয় ধরাতে পারবে, কে জানে!

পুলিশে গাড়ি দেখেই সোজা পা চালিয়ে দেয় ও জেটিতে আত্মগোপন।

জেটিটি বেগুনি রং এর। কে এমন অদ্ভুত রং করালো কে জানে!

দুই পাশে গাঢ় নীল সমুদ্র। অজস্র সিগাল পাখি জলে পা ডুবিয়ে বসে। ভাসমান ঘন কালো হাঁসের কমলা ঠোঁট, লম্বা গলা। রাশি রাশি নৌকো। মাছ ধরায় ব্যস্ত। জেটি ভর্তি মানুষ। জলকেলি করছে, মাছ ধরছে। জেটি অত্যন্ত পুরনো। হঠাৎ আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। ঘন কালো মেঘ ধেয়ে এলো। মাঝি মল্লা দাঁড় তুলো হাওয়া। বাতাসের গতি উল্কার মতন।

সবাই ত্রাহি ত্রাহি রবে ধাবমান পাড়ের দিকে। চোখে মুখে ধূলিকণা। গোলাপও দৌড়াচ্ছে। অকস্মাৎ জেটিটি মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ে গেলো।

কিছু মানুষ তলিয়ে গেলো জলে, কেউ সাঁতরে পাড়ে চলে গেলো আর গোলাপের মতন কিছু অসহায় মানুষ রয়ে গেলো জেটিতে। কারণ তারা সাঁতার জানে না। আজ আবহাওয়া ভালই ছিলো তবুও।

- অ্যান্ড দেন লাইফ ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজেজ।

বলে ওঠে ব্যাথাতুর চোখে বুড়ি লিন্ডা । হাঁটতে এসেছিলেন আইসক্রিম হাতে ।

- আমি বাঁচতে চাই, পরিষ্কার বাংলায় বলে ওঠেন মিসেস গুহ । রীণা গুহ । স্থানীয় বাংলা ক্লাবের সদস্য । গোলাপ চেনে ওকে । রোজই আসেন । বৈকালিক ভ্রমণে সারমেয় পুডুলকে নিয়ে ।

- রেস্কিউ টিম কোথায় ? জানতে চান অগ্রবাল সাহেব । জিতেন অগ্রবাল । প্রায় ৩৪ বছর এখানে আছেন । কাঠের ব্যবসা করেন । টিম্বার ট্রেল নাম কোম্পানির । কাঠ চালান হয় টাসমানিয়ার জঙ্গল থেকে ।

জেটিটি প্রায় ভেঙে পড়েছে । নড়বড় করছে । গোলাপের মোবাইল বেজে উঠছে ঘন ঘন । যেমন বাজে । ওভারিয়ান ক্যান্সার স্টেজ টু । নিচের দিক অসাড় । সন্দেহ হবেই । একটা সময় হাত ধরেছিলো এখন নিজে হাত ধরে থাকতে চায় ।

- হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, এফ এম এ জেটি ভাঙার খবর শুনলাম, আর ইউ ইন গুড প্লেস অ্যান্ড ইন গুড হ্যান্ডস্ ? হোয়ার আর ইউ ?

কথা বলতে মন চাইছিলো না এখন । জীবন মরণ সমস্যা, তবুও ওদিক থেকে আসছে করুণ আকুতি । কথা বলতেই হল ।

- আমি একটা পাশে । রেস্কিউ টিমের অপেক্ষায় । যদি না ফিরি----

- না ফিরি ! মানে ? কি বলতে চাইছো গোলাপ ? গোল্লু ? হোয়াট ডু ইউ মিন ?? আমার কথা ভেবে দেখেছো ?

- মনিষা কৈরালার কথা ভাবো । অপারেশানের আগে ছবি তুলে পাঠাচ্ছে । কি জীবনী শক্তি, সাহস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে সাহস সঞ্চয় করছেন । বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা --- যারা বলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিচু চোখে দেখেন নিজেরা ক্লাসে ফার্স্ট হন বলে কিংবা একটি কি দুটি ডাক্তারি / ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী ঝুলিতে আছে বলে তারা শিখতে পারেন । শুধু চটুলতার ওপরে ভিত্তি করে একটি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠেনা । মানুষ চটুলতা

একদিন নেবে, দুদিন নেবে, রোজ রোজ নয় । তুমিও সাহস সঞ্চয় করো । তোমার বন্ধু অভিজাত নন্দ তো আছেন ওকে দেখে শেখো ।

যদিও উনি ভালো হয়ে গেছেন । কে বলতে পারে তুমি হয়ত ---

বলে কি যেন ভাবে গোলাপ । স্টেজ টু ওভারিয়ান ক্যান্সার কি সারে ?

অভিজাতের তো multiple myeloma হয়েছিলো । স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্ট করে সেরে গেছে । সোফির নেট বন্ধু । ক্যান্সার ফোরামে একসাথে গল্প করে । ওখানে সব এরকম রুগিরা আসে । নিজেদের ব্যাথা বেদনা ভাগ করে নেয় । এরকমই এক রুগি অভিজাত । সোফিকে সাহস যোগায় । বাঁচার রসদ দেয় কি ? জানে না গোলাপ । জানতে চায় । বোঝাতে চায় । কারণ এখন এই সময়

ওদিকে উৎকণ্ঠা । চিন্তা । আবেগ । আকুলতার। এদিকে ভয়, উদ্বেগ । বিহ্বলতা ।

জেটি আরো ডুবে গেলো । শেষদিকে কিছু কাঠের ওপরে কাঠামোটি আটকে আছে ।

কয়েকটি মানুষ শুধু আছেন । মাত্র চারজন । মুখগুলি সাদা, ফ্যাকাসে ।

অন্যরা সাঁতরে চলে গেছেন । ওদিকে আলো ; জেটির । এদিকে কুয়াশা ।

জীবনের আশঙ্কা প্রায় নেই । রেস্কিউ টিমও আজ কোনো কারণে আসছে না । আরেকবার এরকম হয়েছিলো । মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে । বেরিবেরিএটা দ্বীপে । প্রচন্ড ঝড়ে সমস্ত বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, জল টল বন্ধ । হোটেলে ঢুকে যায় সমুদ্রের জল । বন্যা । এমন অবস্থা শেষে পান করতে হয় বাথরুমের অপরিষ্কার জল । দিনের পর দিন সাথে ডিসেন্ট্রির ট্যাবলেট ।

এও সেরকম অভিজ্ঞতা এক ।

অবে এবারে বাঁচার আশা নেই প্রায়, সেবার বেঁচে ফিরেছিলো । মধুচন্দ্রিমা হয়েছিলো বিষযাতনা ।

মরণের আগে মানুষ কী ভাবে ? কোথায় যাবে । কী হবে । এই সুন্দর দুনিয়া আর কোনোদিন দেখতে পাবে না । মনটা বিষিয়ে যায় । ওরও যাচ্ছিলো । হয়ত জেটিতে সবারই । আর সোফির জন্য মন কেমন করা তো ছিলই । ও-ও তো মরবে তবে কয়েক দিন পরে । স্টেজ টু থেকে স্টেজ ফোর । একসাথে এই দুনিয়া ছেড়ে গেলে কি ভালো হত ? পরের জন্মে কি সোফিকেই জীবন সাথী হিসেবে চায় ? অন্য কোনো চয়েস থাকবে না ? ঐশ্বর্য রাই ? অথবা সোনাক্ষী সিন্‌হা ? ধূস্‌ মরার আগে এইসব কী ভাবছে ? বাড়িতে ক্যান্সারে আক্রান্ত বৌ ! মানুষের মনেরও বলিহারি !

হঠাৎ খেয়াল করলো অন্যরা উল্লাসে ফেটে পড়েছে । একটি মৎস্যশিকারি ট্রলার আসছে এদিকে । জোরে । ঝড় থেমেছে আগেই । জেটিও হিন্দি সিনেমার সাসপেন্স সিনের মতন প্রায় ভেঙে পড়ে আর কি !

ট্রলারটি ওরই প্রতিবেশি জেসনের । জেসন গ্যালান্স । লোকটি একটু ক্ষ্যাপাটে। সবসময় হাই হ্যাল্লো করেনা । আজ কি মনে হয়েছে । যাইহোক ওর নৌকোতে মাত্র তিনজন আটবেন । ঠিক হল কেউ একজন আরেকজনের কোলে বসবেন । কিন্তু সীট বেল্ট বাঁধতে হবে । কোলে বসা সম্ভব নয় । তখন জেসনই প্রস্তাব দিলো । নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাবে জিতেন অগ্রবাল । উনি পারেন চালাতে । আর বাকি পথটা জেসন সাঁতরে চলে যাবেন ।

সেরকমই হল ।

ওরা উঠে পড়লো সবাই । নৌকো স্টার্ট দিলো । অপগন্ড রেস্কিউ টিম আমাদের দেশের পুলিশের মতন ঠিক তখনই এসে পড়াতে জেসনকে আর সাঁতরাতে হল না । অদ্ভুত কান্ড জেটিটি কিন্তু শেষ অবধি আটকে ছিলো । বিশেষজ্ঞরা আজও বার করতে পারেন নি এর কারণ টি কি । হয়ত জলের তোড়ে কিছু একটি হয়েছিলো ।

জীবন যেমন কেড়ে নেয় সেরকম দিতেও জানে । তাই হয়ত এর কিছুদিন পরেই জানা গেলো ওভারিয়ান ক্যান্সারের স্টেজ টু ও থ্রি রুগিদের জন্য বাজারে এসেছে নতুন ওষুধ যাকে বলা হচ্ছে স্পার্ক থেরাপি ।

এই ওষুষ রক্তে প্রবেশ করলে ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলে এবং নির্জীব হয়ে থাকে যতক্ষণ না আবার নতুন কোষ হানা দিচ্ছে। পরে আবার নতুন ওষুধ ইনজেক্ট করতে হয়। বছরে দুবার করে। সুস্থ কোষকে এই ওষুধ আঘাত করেনা। তৈরি করেছে লা ট্রোবে দেশের পড়শী দেশ অস্ট্রেলিয়া দেশের জীব বিজ্ঞানীরা। তবে স্টেজ ফোরে সেরকম সফলতা দেখা যায়নি। ব্যাপারটি পরীক্ষার পর্যায়ে।

খবরটি চাঞ্চল্যকর নি:সন্দেহে।

সোফির ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

চমকে ওঠে গোলাপ।

লাফিয়ে ওঠে বলা যায়।

সত্যি লাফিয়েই যায় সোফির দিকে। দুই হাত বাড়িয়ে।

বেগুনি জেটিতে তখন সহস্র সলমা চুমকির লণ্ঠন---

ঘুঙুর

১

আজ থেকে বহুবছর আগে উত্তর বঙ্গে এক বনেদী বাড়িতে বসতো নিয়মিত নাচের আসর। পশ্চিমের প্রখ্যাত বাইজি মীনাবাঈ তার কন্যা সুহানাকে নিয়ে আসর জমিয়ে বসতো। শাস্ত্রীয় নৃত্যের তালিম দিয়েছিলেন বনেদী বাড়ির মালিক শশী শেখর রায়। মনোবাসনা ছিলো তাকে নিজের কাছে রেখে দেবার। মীনাবাঈ এর মতন বাজারের মেয়েমানুষ না হয়ে সুহানা হবে শুধু তাঁরই। এই বাসনা মনে আসাতে উনি তাকে ভালো করে গড়ে তুলছিলেন। সুহানাও মনোযোগ দিয়ে নৃত্য কলা শিখতে লাগলো। সবে যৌবনে পড়েছে সে। গা ভরা রূপ। সে কিন্তু জমিদারের লোলুপ দৃষ্টিকে তোয়াক্কা করতো না। নিজের মনে নেচে যেতো।

অসম্ভব সুন্দর ছিলো তার ভঙ্গীমা, মুদ্রা। নাচের সময় মনে হত যেন স্বর্গের অপ্সরা নেমে এসেছে। ঘুঙুরের আওয়াজ ছড়িয়ে যেতো মন্দিরে। জমিদার বাড়ির পুরাতন কালী মন্দির। মনে মনে সুহানা ভাবতো হলই বা সে বাঈজির মেয়ে তবুও তার নাচ যেন ঈশ্বরের দুয়ারে গিয়ে আর্তি জানাচ্ছে। তাকে কোলে তুলে নেবার আর্তি। কাসরঘন্টার শব্দে ধুয়ে যাচ্ছে ঘুঙুরের আওয়াজ।

২০০৮ এর কলকাতা।

টিভিতে চলেছে রিয়ালিটি শোয়ের দাপট, মুম্বাই থেকে অনেক বড় বড় নাচিয়ে ও অভিনেতা এসেছেন সেদিন একটি নাচের শোয়ের ফাইনালিস্টকে বাছতে।

সবাই উঠেছেন পাঁচতারা হোটেলে।

পবন কুমার তার মধ্যে মুখ্য। উনি মাইকেল জ্যাকসন স্টাইলে নাচেন।

ব্যাড ব্যাড ব্যাড ---বলে কোমড়ে ৩৬০ ডিগ্রী আন্দোলন এনে বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে কোমড়টা দাঁড়িয়ে যায় - তারপর, হুজ ব্যাড ? বলে মাথা ঝাঁকিয়ে

হেসে আসরে নামলেন উনি ! আলোর রোশনাই ছড়িয়ে পড়েছে । সে এলাহি ব্যাপার ।

এসেছে তটিনী । বাঙালী কিন্তু আপাততঃ বলিউডে । সেও তুখোড় নাচিয়ে । তার নৃত্যের তালে তালে উর্ধাঙ্গ অনাবৃত হতে থাকে । টিভিতে, সিনেমায় । এই রিয়ালিটি শোতে নয়। এখানে সে জাজ । অনেক প্রতিযোগী এসেছে । একজন এসেছে সুদূর উত্তর বঙ্গ থেকে । লিয়া ব্যানার্জ্জী । তার বাবার সুবিশাল কাঠের ব্যবসা । আদরিনী কন্যা খুব নাচ ভালোবাসে । তাই এই রিয়ালিটি শোতে অংশ নিয়েছে । এসেছে কলকাতা । কিন্তু তেমন নাচতে জানেনা । কাজেই তার ধারণা সে জিতবে তো নয়ই শুধু একটা একস্পোজারের লোভে আসা ।

যথাসময় শুরু হল নাচ ।

এক একজন নাচিয়ের দক্ষতা দেখবার মতন ! কী উত্তাল নাচ ! দারুণ ভঙ্গিমা ।

বিভিন্ন গানের তালে তালে কিংবা কম্পোজিশানের তালে তালে নাচ চলেছে । এক একজন জাজ পয়েন্ট দিচ্ছেন । তারপরে সবাই হাততালিতে ফেটে পড়ছেন ।

এইভাবে চলতে চলতে এলো লিয়ার পালা । পায়ে পুরনো ঘুঙুর বেঁধে নিয়ে সে নাচের আসরে নামলো । এই ঘুঙুর তাদের পারিবারিক সম্পত্তি । বহু আগে তাদের বাড়ির নাচ ঘরে কেউ এই ঘুঙুর পরে নাচতো । লিয়া সেই ঘুঙুর নিয়ে এসেছে ।

অদ্ভুত কান্ড ! ঘুঙুরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই লিয়ার দেহে যেন নতুন বল এলো ।

তারপর অদ্ভুত সুন্দর মুদ্রা ও দৈহিক আন্দোলনে ভরে উঠলো স্টেজের মধ্যবর্ত্তী জায়গাখানি । আলো পড়ে তখন সে এক রূপকথার রাজ্য ।

লিয়া নাচছে । দক্ষ পায়ে নাচছে । কে বলবে সে নাচ জানেনা ! বিশ্বাস করা শক্ত !

এক সময় নাচ শেষ হল। সে পয়েন্ট ও মতামত অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ নাচিয়ের সম্মানে সম্মানিত হল।

সবাই খুশি হলেও লিয়া নিজে অবাক। কী করে এ সম্ভব হল ?

অবাক তার বাড়ির সবাই। সকলে ভেবেছিলেন ঝোঁকের মাথায় যাচ্ছে, যাক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে হবে এটা কেউ ভাবেননি।

২

পরের দিন সন্ধ্যা। পার্টি বসছে মিউজিক ডাইরেকটরের ঘরে। অনেক রথী মহারথী কাজ ফেলে এসেছেন এই পার্টিতে। শ্রেষ্ঠ নর্তকী হিসেবে এসেছে লিয়াও যদিও সে এখনো ধাতস্থ হতে পারেনি কী করে এই অসম্ভব সম্ভব হল।

পার্টিতে ঢলাঢলি হচ্ছিলো যা লিয়ার পক্ষে অস্বস্তিকর। সে এসবে অভ্যস্ত নয়।

তবুও একটি কোণা খুঁজে নিয়ে বসেছিলো হালকা পানীয় হাতে। এমন সময় এলেন মিস্টার জ্যামি। আসল নাম কী লিয়া জানেনা। মুখটা অদ্ভুত। গোঁফ নেই দাড়ি আছে তাও ফ্রেঞ্চ কাট। চুলগুলো এলোমেলো। হাজারখানেক তাপ্পি দেওয়া প্যান্টালুন।

কিসব ভাষায় ও কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে সে। তারপরে পার্টি শেষে লিয়ার হাত ধরে টেনে তাকে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে উদ্যত হল। উন্নত বক্ষে হস্ত সঞ্চালন শুরু করলো। লিয়া প্রতিবাদ করার পরেও বিশেষ লাভ হলনা।

কে যেন বলে গেলো : ইউ উইল হ্যাভ টু এন্টারটেন আওয়ার গেস্টস্ ! অতএব।

গাঢ় অন্ধকার বাইরে। দূরে ডেকে ওঠে কয়েকটা পথচারী কুকুর।

আকাশে কি একফালি চাঁদ ? বিলাস বহুল হোটেলের ঘরে বসে বোঝার উপায় নেই কারণ এ সি রুমে জানালা বন্ধ। নিজের ইজ্জত বাঁচানোর যখন

আর কোনো রাস্তা খোলা নেই সব ঢেলে দিতে হবে জ্যামির কাছে ঠিক তখনই একটা মৃদু শব্দ ঘরে এসে থামলো। যেন কেউ নিঃশব্দ করিডরে ঘুঙুর পরে হেঁটে এলো।

শব্দটা বন্ধ দরজা ভেদ করে ভেতরে চলে এলো। এসে থমকে গেলো। এদিকে জ্যামি লিয়াকে টেনে হিঁচড়ে, খামচে রক্ত বার করে দিয়েছে।

মুখের ভাষাও জঘন্য।

রীতিমতন গালাগালি করছিলো সে। নোংরা ভাষা ব্যাবহার করছিলো।

এরপরে যখন নিম্নাঙ্গের বস্ত্র খুলে ফেললো তখন লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলেছিলো লিয়া।

- ইতনা শরমানে কা কেয়া হ্যায়, দেখো, দেখো মেরা সাব্‌কুচ তুমহারে লিয়ে হ্যায়!
- ওর কুৎসিত ভাষা ও ইতর প্রবৃত্তি দেখে লিয়ার সারা দেহে এক তরঙ্গ খেলে গেলো। ভেতরে ভেতরে সে ফুঁসছে।

এমনই সময় হঠাৎ কে যেন একটা ধাক্‌কা দিলো জ্যামিকে। অর্ধনগ্ন জ্যামি ভূতলে পতিত। অর্ধ দগ্ধ তার কামনা। বিশাল খাটটি দুলছে, ভীষণ ভাবে দুলতে দুলতে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে, উড়ে আসছে ফুলদানি জ্যামির দিকে, তার মাথায় খুব জোরে লাগলো সে উহ্! শব্দ করে বসে পড়েছে মাথায় হাত দিয়ে।

অকস্মাৎ এই আজব ঘটনা প্রভাব ফেলেছে জ্যামির মনে। সে অবাক চোখে চেয়ে আছে দূরবর্তী লিয়ার দিকে। আবার মার। এবারে সজোর এক চাটি জ্যামির গালে। তারপরে এমন মার যে শেষ পর্যন্ত সে দরজা খুলে অর্ধনগ্ন অবস্থাতেই পালাতে বাধ্য হয়।

হোটেলের লবিতে ছুটে চলেছে জ্যামি। পরনে বহুমূল্য আন্ডার গারমেন্টস্‌

– ভূত ভূত – খুবই অদ্ভুত স্বরে উচ্চারিত হয়ে চলেছে! রাতের অন্ধকারে বেশি লোক নেই তবুও হোটেল স্টাফ ও নাইট ক্লাব র‍্যাফলেসিয়াতে কিছু লোকজন ছিল যারা ওকে ঐভাবে দৌড়াতে দেখে হতবাক।

এদিকে লিয়ার ঘরে ঘুঙুরের শব্দ থেমে গেছে । আয়নায় একটি প্রেত মুখ ভেসে উঠেছে। সারা ঘরে কেমন যেন কুয়াশা । কুয়াশা থেকে জন্ম নিচ্ছে একটি নারী মূর্তি । ধীরে ধীরে অপরূপা এক মানুষী তার সামনে এসে দাঁড়ালো ।

তার বসন ভূষণ আদ্দিকালের । পরনে ঘাঘরা চোলি, মাথায় টায়রা টিকলি, পদযুগলে রূপার খাড়ু ।

কে এই অপুর্ব সুন্দরী ? এ তো মানবী নয় !

মেয়েটি মৃদু হাসলো । এক অশরীরি থেকে জন্ম নিয়েছে শরীর তবুও একটুও ভয় করছে না লিয়ার । মেয়েটি খুব মিহি স্বরে কথা বললো-- খুব অবাক হলে তাই না ?

লিয়া নীরব শ্রোতা ঈষৎ কিংকর্তব্য বিমূঢ়ও ।

মেয়েটি জানালো সে একজন বাঈজির মেয়ে ও নাচিয়ে । লিয়া যেই ঘুঙুর পরে নাচতে পেরেছে সে তারই সম্পদ। প্রাণাধিক প্রিয় সম্পদ।

নাচতে সে খুবই ভালোবাসতো । জমিদার তাকে নিজের করে রেখে দিতেও চেয়েছিলেন বাজারে না বার করে কিন্তু মেয়েটি যার নাম ছিলো সুহানা নাচকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করায় জমিদারের লোলুপ দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে । তাকে অনুরোধ করে কোন মঠে কিংবা আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে । যদিও সে দেবদাসী হলেও পুরোহিতের লোলুপ দৃষ্টি তাকে বিব্রত করবে ।

জমিদার রাজি হননা । তাকে ছাড়তে উনি একেবারেই নারাজ ।

মনে মনে সুহানা ভাবে : আমার এই নাচ আমি ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করেছি । এই নাচ আমি কোনো পুরুষের ভোগের সামগ্রী করতে পারবো না । এই ভেবে সে স্থির করে যে সে পালাবে । পালিয়েও যায় । এক বৌদ্ধ্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে ।

তারা ঠিক করে দূরে সিকিমে এক মঠে চলে যাবে । সেখানে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের পায়ে নিজেকে অর্পণ করবে । কিন্তু পথে বাধা হয় দলের অন্য সন্ন্যাসীরা । তারা বলে এইরকম এক মেয়েকে নিয়ে মঠে গেলে ভগবান ক্রুদ্ধ হবেন ।

সেই নিয়ে বাক বিতন্ডা হয় ও সন্ন্যাসী এক গুপ্তঘাতকের নেপালি ছোরা, কুকরির আঘাতে মারা যান। সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তাহলে কি দলেরই কেউ ?? উত্তর মেলেনা।

অথৈ জলে পড়ে সুহানা। কিন্তু ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে ওর সঙ্গে পরিচয় হয় এক ফিরিঙ্গীর। নাম এড্রিয়ান। এড্রিয়ান সুহানাকে নিয়ে যায় ওর ডেরায়। কথা হয় ওকে কোনো নিশ্চিন্ত অশ্রয়ে পৌঁছে দেবে।

আপাত দৃষ্টিতে ওকে ভদ্রই মনে হয়। জাতে ফিরিঙ্গী হলেও আদতে বাঙালী।

বহু পুরুষের ভারত বাস বলা ভালো বাংলা বাস। লেখালেখি করেন। হাতে লিখে পত্রিকা বার করতেন, পত্রিকার নাম বহুরূপী। লেখক মানুষ তাই বিনয়ী স্বভাবের। বললেন একবার ওনার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।

ওর ভূতের গল্প লেখার শখ ছিলো। তো ট্রেনে অন্ধকার কূপে ওনার দেখা হয়ে যায় কয়েকজন মানুষের সঙ্গে। তারা চেনা কিন্তু অচেনা। পরে বার হয় যে সেগুলি ওনারই গল্পের চরিত্ররা। ভৌতিক চরিত্ররা। তারা বিভিন্ন গল্পে তাদের রূপায়ণ নিয়ে খুশি ছিলনা তাই অভিযোগ জানাতে এসেছিলো।

এসব শুনে সুহানা খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওনার দিকে।

ভাবে মানুষটা বেশ গভীর মানুষ। নাহলে এমন চরিত্র আঁকলেন কী করে যা বাস্তবে ফুটে উঠলো ?

বিশ্বাস, এই ছোট্ট শব্দটা তার মনে বাসা বাঁধে। অবশ্য কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতেই হবে ! জমিদারের করাল গ্রাসের দিকে আর ফেরা চলেনা। আর ওকে সেখানে কেউ গ্রহণও হয়ত করবে না।

যেই নাচকে দেবতার পায়ে অর্পণ করবে বলে ঘর ছেড়েছিলো সেই নাচ তাকে জীবনের কত নাচ দেখালো তা এক বিস্ময়।

- চল সুহানা তোমাকে আজ আমার বাড়ি দেখাবো।

এতদিন সুহানা ছিলো এক গ্রামের বাড়িতে। একটি দাসী ব্যাতীত কেউ ছিলোনা সেখানে। এবার এড্রিয়ান তাকে নিয়ে যাবে অন্যত্র। সেখানে কী আছে ?

কে আছে ? জানার কৌতুহলও প্রবল। যাবার পরে যা হল তা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। একই সঙ্গে দুটি। এড্রিয়ান দ্বারা সে দিনের পর দিন ধর্ষিত হল। আর স্বাভাবিক এই যে এর পরে এড্রিয়ান তাকে বিবাহ করতে চাইলো।

ধর্ষিত হলেও অজাত কুজাতে বিয়ের কথা সে ভাবতেও পারে না।

কাজেই একদিন হীরের আঁটির মধ্যে লুকানো বিষ খেয়ে সে আত্মহত্যা করে! তারপর থেকেই তার বিদেহী আত্মা ঘুরে বেড়াতে থাকে।

কেউ তার ঘুঙুর পড়লে সে নেচে ওঠে। আর ঘুঙুরে পা দেওয়া নর্তকীর বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ায় যাতে অন্য কোনো মেয়ে তার মতন মৃত্যুর পোশাক আর স্বেচ্ছায় না পরে।

সুহানার গল্প শেষ হল।

করুণ কাহিনীর শেষে সে একটাই প্রশ্ন করে বসে লিয়াকে --

আচ্ছা লিয়া আজ এতবছর পরেও মেয়েরা স্বাধীন হলেও পুরুষ কেন আজও তাকে ভোগের সামগ্রী ভাবে বলতো ? কেন শুধু প্রতিভা, মেধা, ধী ইত্যাদি দিয়ে তাদের বিচার না করে -- প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে --বিছানায় নিয়ে যেতে চায় ? বলতে পারো ?

লিয়া নিরুত্তুর। কী বলবে সে? কী বলার আছে ? আজ ইতিহাস খুঁড়ে সুহানা উঠে না এলে সেও তো বলি হত পাশবিকতার !

সত্যি পুরুষের দৃষ্টি ভঙ্গী কেন বদলায় না ? কেন তারা আজও মেয়েদের নিতম্ব আর স্তনের মাপের বাইরে ভাবতে পারে না ? কেন ? সুযোগ পেলেই সুড় সুড় করে ওঠে মনের গোপন আকাঙ্খাগুলি।

সুহানার ভয়হীন কায়া, অশরিরী দেহ ততক্ষণে পাড়ি দিয়েছে কোনো এক অজানার বুকে, এই ঘরে সে আর নেই, তার অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে এক অচেনা জগতে, হয়ত নতুন করে উত্তর খুঁজতেই !

বাইরের একফালি আলো যেন অকস্মাৎ ঘরে এসে পড়েছে। কিন্তু কোনদিক দিয়ে এলো? সারা ঘরে ঘুরে বেড়ায় লিয়া, অবিনশ্বর আলোর উৎস সন্ধানে।

আঁখিপল্লবে ডাক দিলে

কোকোর বাবা আমেরিকায় থাকতেন। খুব অদ্ভুত কাজ করতেন উনি।

উনি ছিলেন পর্ণোগ্রাফি সিনেমার পরিচালক। একটি নাম নিয়ে সিনেমা বানাতেন কিন্তু আসল নাম ছিলো ভিন্ন। সিক্সটি নাইন নামক যেই শৃঙ্গার ভঙ্গিমা আছে সেটাকে একটু ভেঙে চুরে সাড়ে চুয়াত্তরের মতন সাড়ে নাইন্টি সিক্স নামক একটি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট যৌন মুদ্রা ছায়াছবিতে এনে একধারে কিছু মানুষের মধ্যে আনন্দ লহরী ছড়িয়ে দেন আবার কিছু গোঁড়া মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করেন। তবে পরিচালকের বক্তব্য হল :

গোঁড়া মানুষের জন্য তো এইসব সিনেমা নয়!

ওঁনার ক্রিটিকেরা বলেন এইসব মুদ্রা কষ্টকল্পিত ও অবাস্তব। কারণ বাস্তবে নাকি ওরকমভাবে যৌনকর্ম করতে গেলে হাত পা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোকোর পিতা দমবার পাত্র নন। ভারতে এসে খাজুরাহো, কোনারকের সমস্ত স্থাপত্য দেখে শিখে গেছেন। সেইসমস্ত যৌন মুদ্রা উনি ওঁনার ছবিতে কাজে লাগিয়েছেন। আজকাল কম্পিউটারের যুগে আই ওয়াশ খুব সহজ। সবটা অভিনয় করে দেখাতে হয়না। বিভিন্ন

মডেল বানিয়েই কাজ চালানো যায়, সাইবার হাটে বসে বসে। উনিও সেই পথের পথিক।

কোকোর মা ছিলেন সিনেমার মেক আপ আর্টিস্ট। খুব ভালো হাত ছিলো তাঁর। কোকোর বাবা যখন বাইরে বেরোতেন তখন মা মেক আপ করে দিতেন যাতে কেউ ধরে না ফেলে যে উনি আর পর্ণো পরিচালক একই ব্যাক্তি। সাধারণত উনি একটু বয়স্ক মানুষ সেজে বেরোতেন। ওঁনার কাছে পর্ণো সিনেমা পরিচালনা পাপ নয় ওটা একটা ব্যবসা। বলাবাহুল্য উনি নিজে এইসব সিনেমা কোনোদিন দেখতেন না।

কোকোর কাজ ছিল একেবারে ভিন্ন ধরণের। সে ছিলো অ্যাস্ট্রো ফিজিসিস্ট। নাসার জেট প্রোপাল্শান ল্যাবে কাজ করতো। বেশ প্রমিসিং হলেও একটি ব্যাক্তিগত কারণে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তারপর চলে আসে মাতৃভূমি ভারতে। তার ঠাকুর্দার ভিটে উত্তর বঙ্গে এসে ওঠে। বিরাট অবস্থা। ধন সম্পত্তি। বাড়ির সবাই জানে তার বাবা ক্রিয়েটিভ কাজ করেন আমেরিকায়। আর মা মেক আপ আর্টিস্ট। কোকোর মা আদতে বিদেশিনী। কাজেই কেউ কিছু সন্দেহ করেনা।

জেট প্রপালশান ল্যাব থেকে চলে আসার কারণ প্রেম। একটি আমেরিকান তরুণ যার নাম নেথান সে কোকোর প্রেমে পড়ে যায়। দিবারাত্রি তাকে বিরক্ত করতে থাকে। মার্কা মারা গিক। হয়ত তাই জন্যে বিছানায় টেনে নিয়ে যায়নি কিন্তু সেটা ব্যাতীত সবরকম চেষ্টাই করে গেছে। তিতিবিরক্ত হয়ে কোকো পালিয়ে এসেছে ভারতে। কারণ তার নেথানকে মোটেই ভালো লাগতো না। সে নিজে ধনী বাড়ির সন্তান। তাই নিজে বিজ্ঞানী হলেও অর্থ তার কাছে একটি বড় ফ্যাক্টার। দামী গাড়ি, আসবাব পত্র ইত্যাদির প্রতি একটা মোহ তার আছে সে অস্বীকার করেনা। সেই দুনিয়ায় নেথান বড়ই বেমানান। শুধু উজ্জ্বল দুটি চোখ কোকোকে টানে না। সঙ্গে ব্লু ব্লাড কিংবা প্রাইভেট জেট ও টানে।

কোকো উত্তর বঙ্গে অনেকদিন ছিলো। তারপরে চলে গেলো জাপানে। সেখানে কিছুদিন থাকার পরে হঠাৎ একটি দূর্ঘটনায় চোখ দুটি জন্মের মতন হারায় সে। তখন পাশে এসে দাঁড়ায় নেথান। বন্ধুরূপে। নেথানের

চেষ্টায় একজন সদ্য মৃতার চোখ তার চোখে বসানো হয় । এবং দীর্ঘদিন পরে কোকো আবার দৃষ্টি শক্তি লাভ করে । খুশি হয় কিন্তু নেথানের প্রতি তার মনোভাব বদলায় না ।

সেদিন সকালে বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে পাইন গাছ ভেদ করে আসছিলো সোনা রঙা রোদ্দুর । নেথান এক কাপ কফি নিয়ে ঢুকলো কোকোর ঘরে ।

- কেমন লাগছে এখন ?

- ভালো ।

- কতটা ভালো ।

হা হা হা হেসে ওঠে কোকো ।

তারপরে বলে : অন্ধকারে কোনদিন থাকোনি । তুমি বুঝবে না আঁধারের যন্ত্রণা । অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারা এক অন্য ধরণের বিপ্লব ।

- নাহ বুঝলেও এটা কি বুঝবো যে আজও তুমি আমায় সেই চোখেই দেখো কিনা ? নতুন দৃষ্টি কি নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী আনলো কিছু ? কিছু দিন নতুন জগতের বাসিন্দা হয়েও তোমার দৃষ্টি ভঙ্গী বদলায় নি ?

- না বদলায় নি নেথান । তুমি আমার একজন খুব ভালো বন্ধু এখনও ।

নেথান কোনো কথা বাড়ায় না । জানতোই যেন এরকম উত্তরই আসবে তাই মনে দু:খ পেলেও মৃদু হেসে মনের দু:খ চাপা দেবার চেষ্টা করে । কোকোর চোখে জল । আনন্দাশ্রু । নতুন আঁখি পল্লবে অন্য ইশারা ।

প্রেম নয় কখনই !

কিছুদিন ধরেই একটা উৎপাত শুরু হয়েছে । কোকোর চোখে হঠাৎ হঠাৎ একটা ঝাপসা ভাব আসে । তারপর সে অন্য নানান ধরণের ঘটনা দেখতে পায় । এমন মানুষ দেখে যাদের সে চেনে না কিংবা এমন ঘটনা দেখে যা তার দেখার কথা নয় । এরকম বহুবার হয়েছে । প্রথম প্রথম এড়িয়ে গেলেও অবশেষে সে লক্ষ্য করতে থাকে কেন এগুলো হয়ে চলেছে । তাদের

সিনেমা জগতে এক নামী হিরোর খুব বড় স্ক্যাম আছে। ভদ্রলোক আপাত দৃষ্টিতে ছিলেন ক্লিন পার্সেন। কিন্তু একদিন জানা যায় যে তার ইলেজিটিমেট সন্তান আছে। যেই মেয়েটি তার সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে তার বাচ্চার ডি এন এ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে সেই হিরোই বাবা। কিন্তু কোকোর বাবাও একই পেশায় থাকায় জানতেন যে হিরো আদতে বাবা নন। এগুলো ভেতরের খবর। কোকোর মা সেই হিরোর মেক আপ করেছেন তাই চিনতেন। কিন্তু আইন প্রমাণ ছাড়া কিছু মানেনা।

সেই মহিলা সন্তান মানুষের জন্যে মোটা টাকা কেড়ে নেয় হিরোর কাছ থেকে ---কোকো সেই ঘটনাটিও দেখতে পায়।

একদিন সকাল থেকে তার চোখে ধোঁয়াশা। যেন বেজে উঠেছে কোথাও বিসর্জনের সুর! আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায় পথ। দেখে সেই মেয়েটি যার নাম লিন্ডা সে একটি স্পার্ম ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে। তারপর ভেতরে ঢুকে যায়। সেখানে স্পার্ম ডোনেট করা ছিলো বিখ্যাত হিরোর। সেই স্পার্ম সংগ্রহ করে লিন্ডা নিয়ে যায় তার গাইনির কাছে। তারপরে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশান।

ডাক্তার ডাক্তার কত এগিয়ে গেছে তোমাদের বিজ্ঞান। আগেকার দিন হলে আমি মোটেও মা হতে পারতাম না। আমার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেতো। আমার স্বামী নেই। অথচ মা হবার বাসনা প্রবল। তোমায় শতকোটি সেলাম বিজ্ঞান।

ওকে এখন রেস্ট নাও এত কথা বলতে হবেনা। ধন্যবাদ দেবার সময় তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

মৃদুভাষী গাইনির সুর ভেসে আসে অতীতের ইথার তরঙ্গ বেয়ে। কোকো নিশ্চুপ। কোকো হতবাক। কোকোর চোখের সামনে থেকে কেটে যাচ্ছে কুয়াশা। মুখের মিছিলের মাঝে স্পষ্ট কটি ছবি।

জন্ম হয় এক ফুটফুটে বাচ্চার! তারপর কেলেঙ্কারি! অভিনেতার বদনাম, আইনি লড়াই, টাকার খেলা, সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করানো---এলাহি ব্যাপার।

কোকো ততক্ষণে অতীতের জমি ছেড়ে ছুট্টে বাস্তবে, নেথানের কাছে ! সবটা খুলে বলে তাকে।

- এগুলো তোমার কল্পনা কোকো।

- নো নো নেথান, আই ডোন্ট বিলিভ, আমি মানিনা নেথান এগুলো আমার কল্পনা। কল্পনা করে এরকম জিনিস দেখা যায়না।

নেথান চেনে তার বান্ধবীকে। কাজেই কথা বাড়ায় না।

খোঁজ নিতে যাবার কোনো বাসনাই তার নেই। তবুও সে কোকোকে সাচ্চা দিল দিয়ে ভালোবাসে। কাজেই কোকোর সুখই তার সুখ।

সবাই তাকে নিয়ে হাসে। বলে – ও তো তোকে মোটেই পাত্তা দেয়না রে !

নেথান লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে থাকে । কেন যে কোকো এত বজ্রকঠিন হৃদয়ের অধিকারিনী কে জানে । ঈশ্বর বলে কি কেউ আদৌ আছেন ? থাকলে এত বড় অবিচার হতনা নির্ঘাত।

ঈশ্বর মানুষের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কল্পনা, নেথানের তাই মনে হয়।

নেথানকে কোকো খুব ধরেছে, বলে একটিবার খোঁজ নিতে ! প্রথমে নেথান রাজি নাহলেও বান্ধবী ও মনোহরিনীর আবদার ফেলতে পারেনা। শুরু হয় অনুসন্ধান এবং জানা যায় যা দেখেছে কোকো সেটাই সঠিক।

সংবাদ ছাপা হয়, পড়ে যায় রব। সাজ সাজ রব নতুন ধরণের ঠগবাজির গল্প।

এদিকে পাইন ও ওক গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে কোকো সস্তির নি:শ্বাস ফেলে।

কারণ যেসব ঘটনা সে দেখতে পাচ্ছিলো সেইসব ঘটনা আর সে দেখতে পাচ্ছে না ! কদিন ধরে চোখে কোনো ধোঁয়াশা নেই । সব আলোকজ্জ্বল, পরিষ্কার।

যাক অনাহুত শক্তি বিদায় নিলো তাহলে !

নেথানের হাতে আলতো চাপ দেয় সে ! আজও নেথান তার বন্ধু । দু:খ পায় নেথান তবুও যেন ব্যাঙ্গের সুরেও প্রশ্ন করে : তুমি কি কখনো স্পার্ম ব্যাঙ্কে যাবে ?

তারপরে দুজনেই হেসে ওঠে – হা হা হা হা ---

শুনতে একই রকম হলেও একটি হাসি প্রাণখোলা অন্যটি বলাবাহুল্যই বেদনাযুক্ত !

পরে জানা যায় যেই মেয়েটির চোখ কোকোর চোখে বসানো হয়েছিলো সে ছিলো ঐ গাইনির নার্স যে হঠাৎ এক অসুখে মারা গিয়েছিলো ।

মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্রের ;সঞ্জয়ের চোখ দিয়ে দেখা যুদ্ধের মতন ।

পরবাসে

সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্স্ করে সিঙ্গাপুর থেকে ভারতে আসবার সময় বহুবার মেয়েটিকে দেখেছে জিৎ। মেম সাহেব, হয়ত অস্ট্রেলিয়ান।

সোনালি চুল, টানা টানা দুটি চোখ। নাম রুথ।

রুথ স্নেডন। বয়স কত আর হবে ? ২৫ ২৬ মনে হয়। খুব কম্প্যাশনেট।

চাকরির খাতিরে নয় এমনিই। স্বভাবই ওরকম।

জিতের কাজ দেশ বিদেশে ঘোরা। চাকরির সুত্রে নানান জায়গায় গেছে সে।

সিঙ্গাপুরেও বহুবার। এককালীন জেলের দ্বীপ সিঙ্গাপুর আজ বিশ্বের একটি আলট্রা মর্ডান শহর। চাঙ্গি বিমান বন্দর তো প্রাইজ পাওয়া বিমান বন্দর !

খুব সুন্দর, দেখবার মতন।

প্লেন থেকে নেমেছে জিৎ অনেক ক্ষণ। একটি দোকানে ঢুকে জাপানি চিকেন স্টিউ ও মাছের একটি ডিশ খেয়ে পেট ভরে যাওয়াতে এক কাপ কফি নিয়ে কোণায় বসেছিলো। হঠাৎই সে এলো। এবার ফর্মাল সাজে নয় ট্রাউজার ও নীল ঢোলা জামা পরে।

এসেই মিষ্টি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো।

- হ্যাল্লো !

- হাই। পাল্টা অভিবাদন।

- এখন যাবেন ?

- ইয়েস ইয়েস।

বলে উঠে দাঁড়ালো জিৎ । ওর রুথের সঙ্গে তার বাড়ি যাবার কথা । রুথ এখানেই থাকে । বেশ অনেক বার দেখা হওয়াতে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিলো দু জনের । জিতের ওকে বেশ ভালো লেগে গিয়েছিলো ।

তাই আলাপ গাঢ় হল । রুথ ওকে ইনভাইট করলো ।

অবসর সময় রুথ মাসাজ থেরাপি করে । শিখেছিলো ।

আজকে জিতের মাথাও একটু ধরেছে বলে এয়ারপোর্টে বসেই হাল্কা মাসাজ দিলো । বল্লো : এটা টেনশন হেডেক । আমার বাড়ি যাচ্ছো বলে হয়ত তোমার টেন্‌শান হচ্ছে!

জিৎ মাথা নাড়িয়ে হাসলো । ওর ৬ ফুট ২ ইঞ্চির শরীর দুলে উঠলো একটু । কফি শপে পয়সা মিটিয়ে দু জনে চললো । বিমান বন্দর থেকে বাড়ি অবধি যেতে বেশিক্ষণ লাগলো না । রুথ এখানেই থাকে । মাঝে মাঝে অস্ট্রেলিয়াতে যায় । ওখানে একটি ফার্ম হাউজে ওর বাবা মা থাকেন ।

জ্যারড আর ন্যান্সি । ফার্মিং করেন । মাঝে মাঝে ক্যাঙ্গারুর বদলে মেয়ে রুথ আসে । হাসি আনন্দ হয় । আবার মেয়ে কাজে ফিরে যায় ।

রুথের বাড়ির সাজানো গোছানো । সুন্দর । নক করতেই এসে দরজা খুললেন এক বাদামী তরুণ । দুটো পা নেই । চেহারার একটা সপ্রতিভতা । যেন সবই আছে কোনো দৈন্য নেই । অথচ ব্যবহারে কোনো বাহুল্যও নেই ।

রুথ আলাপ করিয়ে দিলো ।

- আমার স্বামী । পিটার । পিটার স্নেডন ।

খুব অবাক হল জিৎ । রুথ যে বিবাহিতা আগে বলেনি তো !

আগে জানলে সে এখানে আসতো না । রুথকে সে অন্য ভাবে দেখেছিলো ।

আরো ভালো লাগার কারণ যে রুথ কাজের শেষে ঘরে ফিরে যেতো ।

ওয়াইল্ড পার্টি কিংবা পাইলটদের বাহুলগ্না হওয়া কিংবা অনেক এয়ার হোস্টেসের মতন হাই অলটিটিউডে সেক্স করার অভিযান কোনটাই সে করেনি । সে খুবই সাধারণ, যেন পাশের বাড়ির মেয়ে !

কিন্তু সে যে বিবাহিতা জিৎ আন্দাজ করতে পারেনি। একটু ভেঙেও পড়লো সে।

জানা গেলো ডাইভোর্স করতে রুথকে অনেক বার বলেছে বন্ধুরা। বলেছে একজন অক্ষম মানুষের জন্য নিজের সমস্ত শখ আহলাদ এত কম বয়সে বিসর্জন দেওয়া উচিৎ হচ্ছে না। রুথ কর্ণপাত করেনি।

পিটার আড়ালে গেলে জিৎ আর চাপতে পারলো না। বলেই ফেললো :

তুমি মহিয়সী রুথ। এরকম একজন মানুষকে ---

রুথ একটু জোরেই বলে উঠলো : তোমরা সবাই আমাকে এরকম সহানুভূতি দেখাও কেন ? কেন তোমরা কেউ ভাবোনা যে পিটারের পা দুটি কেন নেই ? সে তো একদিন তোমাদের মতই ছিলো !

কথাগুলির শেষে ঝরে পড়লো একরাশ বিষন্নতা।

জিৎ ভদ্রলোক। সহৃদয় মানুষ বলেই বললো :

আমাকে বলো। আমি শুনতে চাই। আমি জানতে চাই কেন পিটার আজ অক্ষম !

- খুব অদ্ভুত সেই কাহিনী। রুথ কান্নাভেজা গলায় বলে উঠলো।

পিটার ছিলো জার্নালিস্ট। তোমাদের দেশের মানুষ সে। ভারতীয় খ্রীস্টান। কেরালায় থাকতো। পিটার যেই পত্রিকায় কাজ করতো সেখানে আরেক সাংবাদিক ছিলো। সে বানিয়ে বনিয়ে রিপোর্ট লিখতো। কোনদিন ফিল্ডে যেতোনা। কিছু ডেটা এখান ওখান থেকে নিয়ে বাকি গল্প বানাতো। খবরের কাগজে সেই আর্টিকেল পড়ে পড়ে এক উদীয়মান লেখক গল্প লিখতেন সত্য ঘটনা ভেবে। সেই সব ডেটা ব্যবহার করতেন। আস্তে আস্তে তাঁর নাম হল তখন সেই জার্নো থাকতে না পেরে কেস করে দিলেন যে সমস্ত ক্রিয়েশান আসলে তাঁরই। লেখক কপি করেছেন। জার্নো কোনদিন ফিল্ডেই যাননি !

অদ্ভুত আইনি লড়াই শুরু হল। পত্রিকার খবর পরিবেশনের স্যাংটিটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হল। এদিকে চুরির দায়ে বেচারি নিরীহ লেখক !

এমন সময় পিটার ফেঁসে গেলো এই লড়াইয়ে।

যেহেতু জার্নো তার কলিগ ছিল একদিন সে কোর্টে যায় ওর সঙ্গে।

অপর দিকে কোনো এক ড্রাগ পেডলারের কেস চলছিলো সেদিন কোর্টে। তারই কোনো এক স্যাঙাৎ গাড়ি চালিয়ে অপনেন্টকে খুন করার চক্রান্ত করেছিলো কোর্টের বাইরে। সেই ঘটনার মধ্যে পড়ে গেলো পিটার। গাড়ি আসল লোকের বদলে ভুল করে পিটারের ঘাড়ে এসে পড়লো।

মহিন্দ্রার রাগেট গাড়ির তলায় পড়ে পিটারের দুটি পা জন্মের মতন হারিয়ে গেলো। ঐ জার্নো বন্ধু খুবই গিল্টি ফিল করেছিলেন। কিন্তু দুর্ঘটনা সব চেয়ে দূর্ভাগ্যজনক পার্ট হল এই যে এত বড় জিনিস ঘটার পরেও পিটার ও তার পরিবারকে অভিনয় করতে হয়েছিলো যেন কিছুই হয়নি।

জিৎ সমস্তটা শুনে বড়ই ব্যাথিত হল। বিয়ে আগেই হয়েছিলো রুথের। অক্ষম স্বামীকে সে ছেড়ে দিতে পারেনি। মানবতার খাতিরে। সুন্দরী ও এয়ার হোস্টেস হবার দরুণ তার জীবনে অনেক পুরুষ ঢুকে পড়তে চেয়েছে কিন্তু সে কাউকে কাঠি গলাতে দেয়নি। জিৎ কে তার একজন ভালো বন্ধু মনে হয়েছিলো বলেই বাড়িতে এনেছিলো। জিৎ ও আর মনকে উদ্দাম হতে দেয়নি। রুথকে হারানোর কষ্টের চেয়ে যেন পিটারের পা হারানোর কষ্ট বেশি করে মনকে আচ্ছন্ন করে দিলো।

আনমনে বুঝি বলেও উঠলো : তোমরা ভালো থেকো। তোমাদের ভালো হোক।

দরজায় ততক্ষণে আবার এসে দাঁড়িয়েছে পিটার।

ভরাট গলায় বলে উঠলো : রুথ, ডিয়ার, চিকেন এর সঙ্গে কাপুচিনো কফি মিক্স করে একটা ডিশ বানাতে পারতে তোমার বন্ধুর জন্যে ! চিকেন কাপুচিনো !

তোমার কুলিনারি স্কিল তো অসাধারণ ! উনি জানেন ? তোমার এয়ার লাইন তো তোমাকে দিয়ে ওদের ডিশ গুলো বানাতে পারে। সেটা হবে অ্যাডেড অ্যাট্রাকশান।

এবার হাসবার পালা জিতের। প্রাণ খুলে হাসার চেষ্টা করে সে বলে উঠলো :

কিন্তু লজিক্যালি ওটার নাম হওয়া উচিৎ চিকো চিনো !

কিছু রিয়েল লাইফ ক্যারেক্টার ঢোকানো হয়েছে রচনাটিকে জীবন্ত করার জন্য।

খনিজ মল্লিকা

এই লেখা নিছকই কল্পনা।

কারো সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয়। পুরোটাই মনগড়া কাহিনী।

মল্লিকা এখন বিদেশে থাকে। দেশের মায়া পুরোপুরি কাটিয়েছে বছর খানেক হল।

কাটিয়েছে মানে কাটাতে হয়েছে, পরিস্থিতির চাপে। পেশায় পরিবেশ বিজ্ঞানী মল্লিকার বয়স প্রায় ৫০। এতদিন ছিল ভারতে সুখী গৃহকোণে। স্বামী, সন্তান নিয়ে ভালই তো ছিলো। হঠাৎ !

- ম্যাম আমি কি গার্ডেনারকে খবর দেবো ? কাজের মেয়ে ক্যাথির গলা পেলো। মেয়েটি বেশ ভালো। সন্তান, স্বামী নিয়ে সুখে আছে। মল্লিকার বাড়ি ১৫ দিনে একবার কাজ করে।

- নাহ্ আমি ফোন করে ডেকে নেবো। ছোট্ট করে উত্তর দিলো। ক্যাথি এক কাপ গরম কফি রেখে টাকা নিয়ে চলে গেলো। কফির কাপ হাতে মল্লিকা চলে এলো বারান্দায়। মরসুমি ফুলে ছেয়ে আছে বাগান। একটি নেড়া গাছ ছিলো কাছেই যা কেটে দিয়ে গেছে কাউন্সিল থেকে। বিরাট গাছ, মহীরুহ। মল্লিকা অবাক। মাত্র ২০ মিনিটে এত্তো বড় গাছ কাটা হয়ে গেলো। দুটো বড় বড় ট্রাক এলো। একটি থেকে ইলেকট্রনিক হাত এসে কেটে দিলো ডালপালা। তারপর সেই কাটা ডাল গুলি নিয়ে এক কর্মী ভরে দিতে লাগলো অন্য ট্রাকে। সেখানে বিরাট মেশিনের ভেতরে সাক করে টেনে নিলো কাটা ডাল। মূহুর্তে

টুকরো টুকরো হয়ে সেই গাছের ডাল পড়তে লাগলো একটি বড় লোহার ঝুড়িতে। এই ঝুড়ি এবার যাবে অন্যান্য বাগানে। পার্কে। সেখানে মাটির ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে কাঠের অংশগুলি। তাতে বৃষ্টিতে কাদা হবেনা এবং ধূলো বালি উড়বে না। কি সুন্দর ব্যবস্থা! শুধু গাছের ওপরে কিছু পাখির বাসা ছিলো সেগুলো নষ্ট হয়ে গেলো। কাছেই অন্য বৃক্ষে কালো সাদা বর্ডার দেওয়া ম্যাগপাই পাখি এক মনে গান গেয়ে চলেছে। ওদের ছানারা ছোট। মানুষকে খুবলে নেয় এইসময় কাজেই একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। পাখিটা আজ খুব খুশি মনে হচ্ছে! কত সহজে এরা খুশি হতে পারে। গাইতে পারে। মানুষের কেন এত জটিল জীবন! আসলে মানুষ খুব জটিল প্রাণী। কারো ভালো সহ্য করতে খুব কম মানুষই পারে। তাই ম্যাগপাইয়ের মতন প্রাণ খুলে গাইতে পারেনা।

এই তো ডঃ নস্কর। স্থপতি। বহুদিন যাবৎ বিদেশে আছেন। যাদবপুরের ছাত্র। মফঃস্বলের মানুষ। লোকটি একটু অভদ্র। মল্লিকার এক বান্ধবী বই লিখেছে, ডঃ নস্করকে উপহার দেবে বলাতে বলে ওঠেন : আপনার বান্ধবী কি লিখেছেন যে আমাকে পড়তে হবে? বিশেষ কী করেছেন? ওকে এত মাথায় তুলছেন কেন?

মল্লিকা এরকম অভদ্র লোক আগে যে দেখেনি তা নয় কিন্তু ইনি নিজেকে বঙ্গ সম্মেলনে আদর্শ বাদী ও একটা কেউকেটা রূপে প্রেজেন্ট করেন অথচ অন্যকে ছোট করতে জুড়ি নেই সেটাতেই অবাক হয়েছে। লোকে অবশ্য বলে : ব্যাটা এত ছোটলোকের ঘর থেকে এসেছে যে নস্কর পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারেনা। বলে : লস্কর। এখন লস্কর - ই তৈবার এজেন্ট কিনা সেটাই দেখার।

মল্লিকা বলেছিলো : আমার বান্ধবী এখনও কিছুই করেন নি তবে আপনাদের সহযোগিতা পেলে ভালো লেখিকা হতে পারবেন।

লোকটি তখন বলে : আজকাল স্বঘোষিত লেখক ও গায়কের জ্বালায় আমরা দমবন্ধ হয়ে মারা যাবো।

ওঁর স্ত্রী পাশ থেকে ফোড়ন কাটেন : এই সব ওয়েবজিন হয়েছে সেখানে লেখক লেখিকার বাণ ডেকেছে। এই এক গার্গী ভট্টাচার্য এই এক আইভি!

মল্লিকা বলে : ওঁরা তো ভালই লেখেন। ভালো জায়গায় ওঁদের বই ভালো রিভিউ হয়েছে।

লস্করের স্ত্রী বলেন : আরে ছাড়ুন তো ! ওসব টাকা দিয়ে করায়। আর যোষিতা ! ওটা তো বিয়ের আগে পেটে বাচ্চা নিয়ে –কি মেয়েমানুষ রে বাবা ! যার তার সঙ্গে শুয়ে পড়েছে !

মল্লিকা আর থাকতে না পেরে বলে : উনি তো আর ডঃ নস্করের সঙ্গে ----

মুখ ভেচকে মিসেস লস্কর চলে যান যিনি সর্বদা ওঁর ডক্টরেট স্থপতি স্বামীকে বিজ্ঞানী বলে প্রচার করেন। নিন্দুকে বলে : স্থপতি আবার বিজ্ঞানী হল কবে ? আসলে আগাগোড়া আর্টস পড়ুয়া নিজেকে বিজ্ঞানীর শয্যাসঙ্গিনী ভেবে পরমানন্দ পায়। মহিলার হাজার গন্ডা ইনসিকিউরিটি। কেউ কারো প্রশংসা করলেই মহিলা বলে ওঠেন : আমার মেয়ে বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে, আমার ছেলে দুনিয়ার সবথেকে ভালো ইন্সটিটিউটে পড়তে গেছে। আমার ভাই অনেক টাকা কামায়।

লোকে আড়ালে হাসে। বলে : *আত্মপ্রচার ছাড়া আর কিছু জানেন না উনি। কারো কোনো অ্যাচিভমেন্টস্ এর কথা শুনলে হিংসায় জ্বলেন। বরের ঘাড়ে চেপে বিদেশে এসেছেন। নিজের যোগ্যতায় এলে অন্যরকম হলেও হতে পারতো। লাখ্নৌ শহরে টমটমে চড়ে টম্ টম্ - টম্ টম্ করে যেতেন এখন নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে যাচ্ছেন, অহংকার তো হবেই ! কেবল মাঝে মাঝে ইন্ডিকেটার না জ্বালিয়ে জানলা দিয়ে ভুল করে হাত বাড়িয়ে সিগন্যাল দিয়ে দেন।।*

নস্কর বলেন : আর এক দল লেখক আছে তারা শুধু পর্ণোগ্রাফি লেখে।

–জিগলো জিগলো কোথায় তোমার ওগুলো !

কী অশ্লীল ! ভাবা যায় ! রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা নিয়ে কি খেলা হচ্ছে এইসব ?

আর এরা সব বড় বড় পুরস্কারও পেয়ে যাচ্ছে !

পাশ থেকে এক বখাটে এন আর আই ফোড়ন কাটলো : আপনার রবীন্দ্রনাথ কবে সাধু হল দাদা ? ব্যাটা বৌদির সঙ্গে কেলো করেছিলো না ! একেবারে কাদা ও বড়ি করে ছেড়ে দিয়েছিলো।

নস্কর : ছি: ছি : এগুলো বলতে নেই ! আমাদের সংযত হতে হবে। উনি নমস্য। মহাপুরুষ।

মল্লিকা বলে ওঠে : ড: নস্কর এগুলো পাবলিক ডিমান্ড। লেখক কী করবেন ? আপনি বহুদিন দেশের বাইরে তো, যেমন দেশ ছেড়ে এসেছিলেন এখনও মনে করেন দেশ সেরকমই আছে।

আসলে খোল নলচে সব বদলে গেছে। লোকে এখন এইসব লেখাই বেশি করে পড়ে।

গীতবিতান, গীতাঞ্জলির যুগ গেছে। এখন যৌনাঞ্জলির যুগ।

ড: লস্কর ভেতো বাঙালী। আর পাঁচটা ভেতোর মতন সমস্ত বদগুণের অধিকারী। মেরুদন্ড বাঁকা। সরীসৃপ বলা যায়। নিজেদের জগতের বাইরে কিছু ভাবতে পারেন না। কেউ ওপরের দিকে উঠছেন দেখলেই টেনে নামাতে চান। এবং লোককে অপমান করতে জুড়ি নেই। বাক্যবাণের ঠেলায় মানুষ কুপোকাৎ। সাহেবদের দেশে থাকেন অথচ ৩০- ৪০ বছরেও একটিও সাহেব বন্ধু নেই। সস্তার জিনিসে সংসার চালান। দুনিয়ার সেলে জিনিস কেনেন।

শুয়োরের চর্বি দিয়ে রান্না করেন। তেল কেনেন না কারণ তা অত্যন্ত দামী। থার্ড হ্যান্ড গাড়ি ব্যাতীত কেউ অন্য গাড়ি চড়তে দেখেন নি।

গ্যারজ ভাড়া দিয়েছেন ভারতীয় ছাত্রদের যা বেআইনি। বাড়ি কেনা বা ভাড়া করার সময় বাগানের কোথাও একটু খালি জায়গা দেখলেই ঘিরে ঘর বানিয়ে ফেলেন।

দেশের লোকেদের নিয়ে হাসাহাসি করেন স্লাম ডগ বলে অথচ জানেন না দেশের মানুষ ওঁদেরকে : দেশী ডগ বলে ক্ষেপায়। নিজেরা মণি ভৌমিক কিংবা অমর বোস নন। বিদেশে, ভারত থেকে আরো মানুষ আসছেন দেখলে বলেন : এই ছোটলোকগুলোকে আনার কি দরকার ! এই দেশটার

এবার বারোটা নয় চোদ্দটা বাজাবে । অন্যান্য এন আর আইদের সঙ্গে কেবলই কম্পিটিশান দেন ।

এইসব এন আর আইদের পেটেন্ট নেওয়া ডায়লগ :

–আমার মেয়ে হার্ভার্ডে গেছে তোমার ছেলে ? ওহ্ হো ! অনলি স্পিচ থেরাপিতে ডিগ্রী? বড় জামাই তো কাল দুনম্বর গাড়িটা কিনলো–বি এম ডাবলু । ওটা ড্রাইভওয়ে তে রাখা থাকবে । গ্যারেজ ভাড়া করবে না । ছোটমেয়ে তো হনলুলু বেড়িয়ে এলো ।

ইত্যাদি । কারো প্ল্যাটিনাম ক্রেডিট কার্ড দেখলেই হয়েছে ---- আমার ছেলে তো এত মিলিয়ান ডলারের কাজ ছেড়ে দিয়েছে । ওৎ পেতে থাকেন কখন নতুন এন আর আই আসেন । তারপর একেবারে ক্ষুধার্ত সারমেয়র মতন পেছনে লাগেন । বিদেশটা যে আরেকটা দেশ এখানেও মানুষের মতন বাঁচতে আসা সেইসব কথা বেমালুম ভুলে মনে করেন এটা সার্কাস শো –এবার কে কবে এসেছে ও কতটা সভ্য হয়েছে তার হিসেব নিকেষ করেন । যেমন জংলী জানোয়ারকে ধরে এনে পিটিয়ে সভ্য করা হয় তারপর কোনো এক সময় তারা জুল জুল করে দেখে সদ্য ধরে আনারা কতটা সভ্য হল এও ঠিক সেরকম ।

মল্লিকা ভাবে : ভুলে যাও সাদা কালো । দাবার ছক । মানুষ সব জায়গায় সমান । শুধু চামড়া বদলায় । কাঁটা চচ্চড়ি ডাঁটা চচ্চড়ি যেমন খাচ্ছো সেরকম রোস্টও খাও ।

ভারতের আম আদমী তোমাদের থেকে হয়ত আর্থিকভাবে পিছিয়ে কিন্তু প্রতিভাবান মানুষ ও সেলিব্রিটিরা নন । তোমরা তাঁদের কাছে সাধারণ এন আর আই ।

সাধারণ ভারতীয়, যাঁরা ভিন দেশে আছেন ।

মল্লিকা বহু বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশানের কথা জানে । বেশির ভাগ জায়গার সংগঠকেরা বলেন : এত দলাদলি ও নোংরামো হয় যে বলার না । সামান্য একটি পত্রিকা বার করতে গেলেও দলাদলি । একটি জায়গায় তো এমন অবস্থা যে প্রতিষ্ঠাতাকে অ্যাসোশিয়েশান থেকে বার করে দিয়েছে অন্য লোকজন যাঁরা পরে ঢুকেছেন ।

দশহাতের মধ্যে তিনটে অ্যাসোসিয়েশান। বেঙ্গলি অ্যাসো অফ অমুক, বেঙ্গলি অ্যাসো অফ সাউথ অমুক ও বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশান অফ সাউথ তমুক।

মল্লিকা শুনেছে প্রেসিডেন্টদের কাছে যে ফ্রিতে কিছু দিলে কিংবা প্রোগ্রাম হলে সবাই যোগ দেন সংস্থা চালিয়ে যাবার জন্য অর্থ দাবী করলেই লোকে সংস্থা ত্যাগ করেন : এই দাদা আজকে পেটটা খারাপ, কাল মেয়ের অসুখ ছিলো তাই হাসপাতালে যাবো !

একবার নস্করের মেয়ের ক্লিভেজ উন্মোচন করা জামা ও ছেঁড়া হাফ প্যান্টুলুন এই ড্রেস দেখে কলকাতায় রাস্তার কুকুর এমন পিছু ধাওয়া করেছিলো যে এক ভিখারি বলে ওঠে : দাদা, এইসব পোশাক এখানে কেন ? স্যালোয়ার পরে বেরোলে হয়না !

ঢিল মেরে কুকুর তাড়িয়ে সেই গরীব মানুষ নিজ মনে বলে ওঠেন : এঁদেরকেই বলে শিক্ষিত পাঁঠা !

নস্করের কি লম্ফ ঝম্ফ !

- কি বললি ? কি বললি শুয়োর ? এইজন্যেই গুণীজন জুতোকে মাথায় তুলতে বারণ করেন।

ভিখারি রেগে আগুন : আমি জুতো ? আর আপনি খুব ভদ্দরনোক ! আপনার মেয়েকে বাঁচালাম কুত্তার হাত থেকে আর আমাকে আপনি ! আপনারা সব শালা বড়লোক কুত্তা।

এক একটা ঘেয়ো কুত্তা ! আপনার মেয়ে ওরকম দুদু বার করা জামা পরেছে কেন ? ওগুলো দুদু নাকি পচা কুমড়ো ? দুই সাইড দিয়ে ভ্যাদ ভ্যাদ করে বেরিয়ে পড়েছে ! শালা ! ঢপকা মাগী !

প্রাণ খুলে ভিখারি গাল দিতে দিতে চলে গেলো।

নস্করের স্ত্রী মুখ বেঁকিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো – রাস্টিক, ন্যাস্টি, আন কালচার্ড ওল্ড ফেলো ! বেগার ক্লাস। ইডিয়েটস্।

সোনাঝুরির স্পষ্টবাদী সম্পাদক এঁদের দু চোখের বিষ। একা এরকম একটি সাইট করেছেন কেউ বললেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন।

- কী করেছেন উনি ? লেখা নেন আর বসান এই তো করেন । নিজের বিজ্ঞাপন নিজেই করেন । কটা বই ছাপিয়েছে তোর বড় পাবলিশার ?

সমস্ত ভদ্রতা সভ্যতার সীমারেখা ছাড়িয়ে তুই -তুকারিতে নেমে আসেন এন আর আই বাবু বিবি ।

যোষিতা যিনি এঁদের খান না পরেন না তিনিও বিষ । বিষ বেচারি আইভিও । আইভি কারো ক্ষতি করেছেন বলে আজ অবধি শোনা যায়নি । তবুও নস্কর অ্যান্ড কোম্পানির গা জ্বলে এঁদের কথা বললে ।

ভেতো নস্করের একটি শখ আছে । জাঙিয়া কেনার শখ । বিদেশে গিয়েই হয়েছে । বিদেশে তো নানান রঙ এর জাঙিয়া পাওয়া যায় । ছাপ ছাপ, ফুল তোলা, সাটিনের সমস্ত কিনে জমান । ওঁনার এক ঘর জাঙিয়া । মাঝে মাঝে বাগানে মেলেন । সস্তার ওয়াশিং মেশিন তাই ড্রাইয়ার নেই । শুধু ধোয়া হয় । তাও কারেন্টের বিল বাঁচাতে নস্কর বেশির ভাগ সময়ই হাতে কাচেন । সমস্ত পোশাক আশাক । বাথটাবের মুখ আটকে সাবান জলে ভিজিয়ে পাশের শ্যাম্পু ট্যাম্পু রাখার জায়গায় থুপিয়ে কাচেন । সেই কলকাতার ফুটপাথবাসীদের রাস্তার ফোয়ারায় জামাকাপড় কাচার মতন ।

অনেকেই দেখেছে যে ডঃ নস্করের প্যান্টের চেন খোলা থাকে ও সুদৃশ্য জাঙিয়া বেরিয়ে থাকে । মল্লিকাকে একবার এক চটুল গসিপ প্রেমী রমণী, মজা করে বলে : উনি তো ইন্তেলেকচুয়াল, খালি ভাবেন আর ভাবেন -তাই প্যান্টের চেন টানতে ভুলে যান । আর মহিলা দেখলেই বার বার ঐ জায়গায় হাতটা ঘোষেন । দাদার ওখানে এস্পেশাল দাদ হয়েছে, দিদিদের দেখলেই চুলকায় !

নস্করের চুল ওঁর স্ত্রী ছেঁটে দেন । পয়সা বাঁচান ।

মাঝে মাঝে জেনেরেশান এক্স পুত্র কন্যা বলে : বাবা -মা, এইভাবে বিদেশে না থেকে দেশে ফিরে গেলেই তো হয় ! কোনো স্লাম টামে থেকে যাবো ।

মা হুমকি দিয়ে ওঠেন : জানো স্লাম কেমন ? ওসব বাজে সিনেমা দেখে মাথা বিগড়েছে একেবারে । গার্গীর ফার্গীর লেখা একদম পড়বে না ।

ছেলেমেয়েরা বাংলা শেখে ওয়েবসাইট পড়ে। গার্গীর ওয়েবজিনে এত বানান ভুল থাকে যে নস্কর বেশ বিরক্ত।

মল্লিকা এঁদের সঙ্গে খুব একটা মেশে না। মাঝে মাঝে এঁরা আসেন।

একবার মল্লিকা ডঃ নস্করকে দেখেছিলো এক শপে। সেখানে মহিলাদের ব্যবহৃত জাঙিয়া বিক্রি হয়। নস্কর কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মল্লিকা লুকিয়ে পড়েছিলো লজ্জায়।

পরে এক অসতর্ক মুহূর্তে শোনে যে ডঃ নস্কর নাকি অন্যের চিঠি খুলে পড়েন বিশেষ করে স্ত্রীর। তারপর চিঠি লুকিয়ে ফেলেন। পরে ঝগড়া হলে সেইসব পয়েন্ট তুলে ঝামেলা করেন। স্ত্রী অবাক হলে তাঁকে বলেন : কেন, তোমাকে অমুকে ঐ চিঠিতে লিখেছে না!

অবশ্য ডঃ নস্কর কেন মল্লিকার প্রাক্তন স্বামী প্রদোষও তো শেষ দিকে এমন করতো।

ওঁকে না বলে ওর চিঠি, ইমেল খুলে পড়তো।

সন্দেহ, স্রেফ সন্দেহে। সুন্দরী বৌ, এত সাহেব বন্ধু! কি জানি কি হয়!

আসলে মল্লিকার স্বামী প্রদোষ ও সে একই সঙ্গে গবেষণা করেছে। একই গাইডের কাছে।

গাইডের স্ত্রী ওঁর সঙ্গে বিদেশে যেতেন, প্রায়ই। হঠাৎ একদিন এক ইকোনমিস্টের সঙ্গে পালিয়ে যান। তাঁরও স্ত্রী ছিলো। আগে ওঁরা লোক মুখে শুনেছেন যে ওঁদের এলাকার ইকোনমিস্টদের চরিত্র সেরকম ভালো হয়না। কেন কেউ জানেনা। এক বিখ্যাত ইকোনমিস্টের দুশ্চরিত্রের কথা কে না জানে? শোনা যায় আজও ভারতে এলে ওঁনার তাড়িয়ে দেওয়া প্রথমা স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ করে : ব্রত এসেছে ব্রত এসেছে তোরা আজ বাড়ি পালা ---- করে দৌড়ে দেখা করতে যান! এমনই জাদু- ওঁনার চারপাশে।

মল্লিকা মনে মনে ভাবে : এঁরাই ভালো আছে। প্রচুর অ্যাচিভমেন্টস্ আর যত খুশি নোংরামো করো। গায়ে আঁচড়টি লাগবে না অথচ তাঁর ক্ষেত্রে কিছু না করাতেই সব গেলো। স্বামী, সন্তান, সংসার।

প্রদোষ ওকে সন্দেহ করতো। ও সুন্দরী। মাখনের মতন চামড়া, মুখটা সোহা আলি খাঁয়ের মতন। লম্বা চুল। খুবই সুন্দর। সাহেবরা ওঁকে খুবই পছন্দ করতো। অবশ্যই ওর কাজের জন্য। রূপের জন্য নয় কিন্তু প্রদোষ সেটাই ভাবতো। ওর শ্বশুর খুব নামজাদা ফিজিসিস্ট। তাঁরই একমাত্র সন্তান প্রদোষ। খুবই ব্রিলিয়্যান্ট। ডক্টরেট করে সে ফরেন্সিক ল্যাবে যোগ দেয়। ওঁর বিষয় environmental forensics –

(Note : environmental forensics conduct scientific investigations to uncover who is responsible for contamination of the environment)

প্রদোষ শেষদিকে ওকে মারধোর দিতো। জুতো পেটা করতো। ছেলেকে কাছে আসতে দিতো না যেই ছেলেকে সে ব্রেস্ট ফিড করে মানুষ করেছে, ফিডিং বোতলের দুধ খেতে দেয় নি একদিনও। কর্মরতা মা হওয়া সত্ত্বেও।

সাহেবরা যদি তাঁকে চুম্বন করে অভিবাদন করে সেটা কি তাঁর দোষ ?প্রদোষ বুঝলো না ? শ্বশুর মশাই অনেকবারই ছেলেকে বলেছেন কোথাও ভুল হচ্ছে কিন্তু সে শোনার বান্দা নয়। অবশেষে হয়ে গেলো বিচ্ছেদ। ছেলে একবারও এলো না। লোকমুখে শুনেছে যে ছেলে বলে : মাই মাদার ইস আ বিচ দ্যাটস্ হোয়াই মাই ড্যাড লেফট্ হার।

দু চোখে বেয়ে শুধু জল পড়েছে ওঁর। ছেলের মনে এই ঘৃণার উৎপাদন করেছে প্রদোষ, ইচ্ছাকৃতভাবে।

আজ মল্লিকা বিদেশে। এক খনিজ সংস্থায় পরিবেশ বিজ্ঞানীর কাজ নিয়ে আছে। একাই থাকে। শেষ জীবনে কোনো অশ্রমে চলে যাবার ইচ্ছে আছে। সেবাশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। মোটা ডোনেশান দেয়। দেশে গেলে খাতির যত্ন পাবে।

ডঃ নস্করের একটি বাজে স্বভাব–বিনা নোটিশে লোকের বাড়ি চলে আসা। এতদিন বিদেশে আছেন অথচ খবর না দিয়ে, ফোন না করে চলে আসেন। এবারও এসেছেন। খনি এলাকা ঘুরে দেখবেন এছাড়া আদিবাসীদের সঙ্গে কাটাবেন। এখানে আদিবাসীদের বলে রেড রুস্টার্স্। সরকার ওঁদের যথেষ্টই দেখেন। সাদা মন্ত্রীরা নিজেদের বলেন : হোয়াইট রুস্টার্স্। সেই আদিবাসী সম্পর্কে ডঃ নস্করের বক্তব্য : এগুলো জংলী বটে আর সরকার

এগুলোকে দেখে না হাতি ! দুনম্বরী করে, করাপশান করে –আইন বদলে নেয় যাতে কেউ টিকি ছুঁতে না পারে।

মল্লিকা বলে : এত করাপটেড দেশে আছেন কেন ? ভারতে ফিরে যান !

নস্কর চুপ থাকলেও ওর স্ত্রী মুখ ঝামটা দেন : ওটা একটা জায়গা হল ?

ওখানে গেলে তো পচে মরবো। আমার তো ভয় লাগে বাবা ! পেটটা এত খারাপ হয় !

ওখানে লোকগুলো কি মানুষ না জন্তু ? বেঁচে আছে কি করে রে বাবা ! হাসপাতালগুলো তো নরক ! মানুষগুলো নোংরা, ঘেয়ো।

মল্লিকা বলে : আমিও তো ওখানেই ছিলাম, এই তো কিছু বছর হল এখানে এসেছি !

সামলে নেন স্বামী স্ত্রী। নিজেদের। এদিকে থাকেন মক্ষিচুষের মতন। সেলে জিনিস কিনে রাখেন, দেশে গেলে গিফট নিয়ে যান। বাণী বসুর জন্য দামী উপহার (এটাও সেলে কেনা) আর বাংলালাইভের সুকন্যার জন্য ফুটপাথ থেকে কেনা সস্তার চটি। গোলাপি প্লাস্টিকের চটি নিয়ে যান। বাংলালাইভে ওঁদের বাড়ির কিছু বরফের ছবি বেরিয়েছিলো একবার হয়ত তাই আর বাণী এসেছিলেন বঙ্গ সম্মেলনে। এক সঙ্গে ছবি টবি তুলেছেন। উনি খুবই ভালোমানুষ তাই বেশ মিশেছেন। সুকন্যা বেশি পাত্তা দেয়নি তাই হয়ত তাঁর কপালে ----- সুকন্যা ওরফে সুকু সেই চটি ওর চাকরাণিকে দিয়ে দিয়েছে।

মল্লিকাকে এঁরা সাবধান করে বলে : এইসব খনি এলাকা–এখানে সব ড্রাগি মালিক থাকে। দেখো রেপ টেপ করে না দেয়। একা মেয়েমানুষ তুমি !

আসলে ভেতো বাঙালীর দুটি জগৎ। একটা ভেতো জগৎ অন্যটা মন্দ জগৎ।

আদিবাসীরা রাক্ষস পুজো করে। ডেমন গড। তাই না দেখে নস্করের সে কি রাগ !

–এই ছোটলোকগুলো ঠাকুর দেবতার আর কোনো মান রাখলো না ! রাক্ষস পুজো কেউ করে নাকি ?

মল্লিকা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলো : আপনি কি এস সি এস টি কোটায় ঢুকেছিলেন?

লজ্জায় নস্কর মুখ ঢাকে। তার আগেই ছোটলোক ফোটলোক ইত্যাদি তুবড়ি ছুটছিলো।

কমল চক্রবর্ত্তী নামক এক কবি আছেন। পুরুলিয়ায় থাকেন। গরীব মানুষের মাঝে।

নস্কর বলে : ও ব্যাটা আগে নকশাল ছিলো শুনেছি। দেখো গিয়ে গরীবের নাম করে ঘরে মাওবাদী পুষছে।

মল্লিকা এই কবির নাম শুনেছে। বলে : উনি খুবই ভালোমানুষ, ওঁনার মতন মানুষ হয়না। ভালো মানুষ আজকালকার বাজারে কৈ ? এই স্পিসিসটাই তো সব থেকে এনডেঞ্জারড্।

লেখক কবি তো গুচ্ছ গুচ্ছ, ভালোমানুষ নেই বলেই তো সমাজের এই অবস্থা।

নস্করের মুখ বন্ধ হলেও ওঁর স্ত্রী বলে ওঠেন : আপনাদের জন্যেই এইসব লোকগুলো পেয়ে বসে। আপনারা এত ভালোমানুষ যে কিছুই চোখে দেখেন না। যেদিন হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাবে পুলিশ সেদিন এই আমার কথা মনে পড়বে।

মল্লিকা ভাবে : তোমার স্বামী কোথায় ইউজ্ড প্যান্টি কিনতে যায় সেই খবরও রাখো নিশ্চয়ই।

নস্কর নাকি রেগুলার সেক্স করে। একদিনও বাদ দেয়না। বিছানার কাজ হয়ে গেলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। ধোয়ও না। ওর বালিশের কভারে মুছে ফেলে। এবং একটাই পোজে সঙ্গম করেন। ওঁর স্ত্রী চান ডগি স্টাইলে সেক্স করুন কিন্তু ভেতো ভদ্রলোক সেদিক মারান না। বেসিক মিশনারি পোজ ছাড়া সবই অশ্লীল। যারা করে তারা কামুক।

ওর দু:খিত স্ত্রী বলেন : আরে সোসাইটি তো আমাদের পার্মিশান দিয়েছে না কি! বলুন তো।

এইসমস্ত বিনা আমন্ত্রণে তাঁর ক্ষুধার্ত স্ত্রী বলেছেন মল্লিকাকে । মল্লিকা কিছুই জানতে চায়নি । শেষে বিরক্ত হয়ে বলে : এটা যখন আপনার ইস্যু তখন হোয়াই ডোন্ট ইউ হায়ার আ জিগোলো ?? আর আমার তো এগুলো জানার কথা নয় মিসেস নস্কর । এগুলো পাঁচ কান নাই বা করলেন ! আপনাদের প্রাইভেট ব্যাপার ।

মনে মনে বলে : নাহ্ ভারতীয়রা বোধহয় প্রাইভেসি আর সিক্রেসির তফাৎ বোঝেনা । মজার ব্যাপার হল এই একই মানুষ ডঃ লস্কর না নস্কর – লুকিয়ে লুকিয়ে কোথাও কোথাও যান মহিলাদের ব্যবহৃত আন্ডার গার্মেন্টস্ কিনতে । অদ্ভুত সাইকোলজি মানুষের । আজব জীব সভ্য মানুষ । এই প্রজাতিটার নাম পাল্টে মুখোশ করে দেওয়াই বোধহয় ভালো ।

আদিবাসী মেয়েরা ঋতুস্রাবের সময় জোঁক ব্যবহার করে । একটা সময় পর্যন্ত তাঁরা জোঁক নিয়ে যোনিতে আটকে রাখে । সমস্ত রক্ত শুষে নেয় জোঁক । নস্কর জানতে পেরেই স্ত্রীকে বলেন – তোমরা তো এগুলো শিখে নিতে পারো ! কিছু খরচ বাঁচে এতে।

স্ত্রী বলেন : ক্ষেপেছো ! এ জোঁক, জোক নয় । কি খেতে কি খাবে –শেষে মারা পড়বো ।

আদিবাসী গ্রাম ঘুরে ফিরে যায় ওঁরা । মল্লিকা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ।

আদিবাসীরা খুব সৎ । খনিতে অনেকে কাজ করে । হীরার খনি এখানেই ।

যাঁরা একটু পড়েছে তাঁরা মাইনের ট্রাক চালায় ।

ডক্টর নস্করকে নিয়ে ওঁরাও হাসাহাসি করছিলো । সভ্য বাবু বলে । ওঁরা নাম দিয়েছে ভাঙা মেশিন বাবু । বলে: মেশিন বাবু চেয়ারে বসে কাঠি দিয়ে সাদা কেঁচো খায় । আমরা বনে বসে খেলেই দোষ ।

আসলে নস্কর অ্যান্ড কোম্পানি চপ স্টিক দিয়ে চাউমিন খাচ্ছিলেন । আর রেড রুস্টার সম্প্রদায়কে ছোটলোক বলে গালি দিচ্ছিলেন ।

এর কিছু সপ্তাহ পরে সব্বজান্তা, উন্নাসিক –ডঃ নস্করকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় কোমড়ে দড়ি বেঁধে । কারণ আদিবাসী শিশুদের উলঙ্গ ছবি তুলে উনি

একটি বাংলা ওয়েবসাইটে ছাপাতে পুলিশ ওঁকে পেদোফাইল চক্রর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করে।

মর্ডান গ্যাজেস্ট্ ব্যবহার করা কে সভ্যতা ভাবা, যাদবপুরের ডক্টরেট ডিগ্রী যা সম্বল করে বিদেশে এসেছেন ও বিদেশের চাকরি দিয়েছে সমস্ত মানুষকে হেয় করার লাইসেন্স সেই স্বঘোষিত পন্ডিত আজ জেলের ঘানি টানছেন । সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত এই লোকটির কোনো কথাই আইনের মানুষ শোনেননি । কারণ উনি শিশু যৌন কেসে ধরা পড়েছেন– যা ক্ষমার অযোগ্য ।

অসম্ভব স্যুডো জ্ঞানী মানুষটির স্ত্রী আজ সন্তানদের নিয়ে ভারতের পথে পথে । কারণ ভদ্র সমাজে মুখ দেখাবার উপায় আর তাঁর নেই ।

মল্লিকা একবার ভেবেছিলো ভারতে ফিরে স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবে । সন্তানকে কেড়ে আনবে । তাঁরই তো গর্ভজাত সন্তান । কিন্তু নাহ্, সে খনিজ মল্লিকা হয়েই বাকি জীবন কাটাতে চায় । সভ্যতা নামক অসভ্যতায় তাঁর ফিরে যাবার ইচ্ছে আর নেই ।

এই পাহাড়, নদী, ঝর্ণা ও খনিই আজ তাঁর স্বর্গ ।

অন্য সমাজ নরক মনে হয় । বিভিন্ন মন্দিরেও মরচে পড়েছে তাই বুঝি আশ্রমে ফিরে যাবার প্ল্যানটিও ড্রপ করতে হবে । কাল কী হবে কে বলতে পারে ??

প্রতিটি সুক্ষ্ম মূহুর্ত বদলে দেয় জীবন । জীবনের রং চটা জায়গাগুলো রাঙিয়ে নিতেই তুলি হাতে বসা । কোথায় ফাগুন লাগবে আর কোথায় আগুন কেউ কি জানে ??

A human being is part of the whole, called by us "universe," limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest - a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a prison, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons close to us"

"Our task must be to free ourselves from our prison by widening our circle of compassion to embrace all humanity and the whole of nature in its beauty."

~ Albert Einstein

ভিন্ন গদ্য : এটি এমন এক গদ্য যার কোনো শুরু নেই, শেষও নেই

শিউঁলিবাড়ি

এইভাবেই বদলে গেলো– চুমুক দিতে দিতে গরম চায়ে সরে গেলো জানালার কাছে মল্লার –পাড়ার নেড়ি কুকুরটা কাঁদছে, একটু দূরে শিউলিগাছের নিচেটা ছেয়ে আছে ফুলে ফুলে । এই গাছ থেকেই বাড়ির নাম শিউলিবাড়ি । আগে ছিলো ফুলবাড়ি ।

নামটা শুনে বাবার বন্ধু মনোহরকাকা বলেছিলেন : ফুলবাড়ি নামটা বেশ বাজে । শুনলে মনে হয় কোঠাওয়ালির কোঠা । নামটা বদলে দে ।

তখন থেকেই শিউলিবাড়ি । অচিন এই গ্রাঁয়ে বহু মানুষের বাস । সবুজ ধানক্ষেত, পাট ক্ষেত, সোনালি নদীর চর আর রাশি রাশি পলাশ গাছ নিয়েই এই গ্রাম, পলাশপুর।

এদের জীবিকা অদ্ভুত । চাষবাস অনেকেই করে তবে মাটি তেমন উর্বর নয় বলে বেশিরভাগ লোক এক আজব উপায়ে পয়সা কামায় । এই গ্রামে আছে ৯৯ জোড়া যমজ এবং এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । মানুষ নিকটবর্ত্তী মেলায় ও শহরে এই যমজদের কিছু কিছু করে নিয়ে যায় ও নানান খেলা দেখিয়ে অর্থ উপাজর্ন করে । মল্লাররাও যমজ । অন্য ভাই থাকে

আমেরিকার টেক্সাসে। তার নাম মন্দার। কৈশোরে মন্দার মারা গিয়েছিলো দুদিনের আজব জ্বরে।

শিউলি তলায় তাকে শুইয়ে দেন তার মা। মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেননা। বিশ্বাস : ছেলে জেগে উঠবে। এবং জেগে উঠেছিলো। বেঁচে উঠেছিলো। চিকিৎসকেরা বলেন : কোমায় ছিলো, জেগে ওঠে। বাড়ির লোক জানে কোমা নয় মৃতই ছিলো আসলে মন্দার।

মিরাকেল। শিউলিবাড়ি মায়াপুরী।

আর এমন কী আছে এই গ্রামে ? কেন এত যমজ ?

তার উত্তর খুঁজতে এসেছিলো মল্লারের স্ত্রী নৃতত্ত্ববিদ হাসিমারা। হাসিমারা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে জন্ম হয় মেয়ের। আসন্নপ্রসবা স্ত্রী ফরেস্টের জিপে জন্ম দেন কন্যার। বাবা নাম দেন হাসিমারা। হাসিমারা বসু প্রেমে পড়েন মল্লারের। মল্লার গ্রামীন ব্যাংকে কর্মরত।

বিয়ে হয় কিন্তু সন্তান হয়না।

হাসিমারা ওরফে হাসি আজ কয়েকবছর হল গত হয়েছেন। মল্লার আবার বিয়ে করেন নি।

তবে এক সঙ্গিনীকে নিয়ে থাকেন। বলেন : ঠাকুরের সামনে সিন্দুর পরিয়েছেন। গ্রামের লোক তাই জানে। আদতে কিছুই হয়নি। সঙ্গিনী মীরা সাহু ওড়িয়া। আলাপ এক পর্যটন কেন্দ্রে। নিয়মিত অবসরপ্রাপ্ত মানুষের এক দল বেড়াতে যেতেন। সেখানে রেজিস্টার্ড ছিলেন মল্লারও। ঘুরতে যেতেন, বছরে দুবার। দলের অন্যরা লক্ষ্য করেন যে মীরা ও মল্লার একে অপরকে বেশ পছন্দ করছেন। তারাই এই একসঙ্গে থাকার আর্জি জানায়। বলে : দূর এই বয়সে আর ছাদনাতলায় গিয়ে কি হবে ? বরং লিভ টু গেদারই ভালো।

তবে মীরা আজকাল বেশ বিরক্ত। মল্লারকে আগে যেমন মনে হয়েছিলো আদতে তেমন মানুষ সে নয়। খালি মীরাকে দিয়ে ফাই ফরমাইশ খাটায়। আগে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতো, খোঁজ খবর নিতো, একসাথে সময়

কাটানোর জন্য কত রকম বাহানা করতো কিন্তু এখন সব কেমন বদলে গেছে। মীরা যেন কেবলই এক অস্তিত্ব। সঙ্গিনী নন।

বিয়ে করা বৌ হলে কি এমন হত ?

আচ্ছা মীরা কি মল্লারের রক্ষিতা ?

মীরার সামাজিক পরিচয়টা কি ?

তার পূর্বজীবন বড়ই দু:খের। অবিবাহিতা ছিলেন। কাজ করতেন একটি স্কুলে।

একমাত্র দাদার কাছে থাকতেন মা। কলকাতায়। মীরা কাজ করতেন পাশের মফ:স্বল আলিপুরহাটে। দাদারা বেড়াতে যাবেন কাশ্মীর। ভূ স্বর্গ বলে কথা। কত আগে থেকে ঠিক করা আছে সব ! তাই তো হাইলি ডায়বেটিক,অসুস্থ মাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করে দিয়ে চলে গেলেন। দাদার স্ত্রী অর্থাৎ বৌদির একটি স্তন পোড়া। দাদার এক রক্ষিতা ছিলো। একটি মুসলিম মেয়ে। মেয়েটি স্বামী পরিত্যক্তা। দাদা কলেজের ল্যাবে কাজ করতেন। মেয়েটি করতো লোকের বাড়ি রান্নার কাজ। বৌদি যেদিন জানতে পারলেন ফতিমার কথা সেদিন তুলকালাম হল। তাকে শান্ত করতেই কাশ্মীর ভ্রমণের আয়োজন। নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে হয়ত দাদাকে ক্ষমা করেছিলেন বৌদি।

তাই মাকে যেতে হল নার্সিং হোমে।

চিকিৎসার নামে কোথাও, কখনো মায়ের একটি কিডনি কেটে নেওয়া হয়। ডায়বেটিক ছিলেন। অন্য কিডনি অকেজো হতেই নার্সিং হোমে গেলেন ও অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান। মীরার জীবনে এরপরে অশান্তি ঘনিয়ে আসে। দাদা বৌদির ঝামেলা হত খুব। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছেই করতো না। এদিকে নিজেও একা। অবসরের পরে কেউ কোথাও নেই।

দূর সম্পর্কের কিছু আত্মীয় ছিলো। তাদের সাথে কালেভদ্রে দেখা। তখনই ভ্রমণ গ্রুপ : যাযাবরের কালীদাস ভদ্র দিলেন প্রস্তাব। বল্লেন : মীরা, তুমিও একা, মল্লার বাবুও তাই।

কেন তোমরা একসাথে, একজোট হয়ে থাকছো না ?

সেই শুরু। একসাথে, পায়ে পায়ে পথ চলার।

মীরা অবসরপ্রাপ্ত হলেও আজকাল একটি কাজ করেন। হতদরিদ্র নেপালী মেয়েদের সীমানা পেরিয়ে বিভিন্ন পতিতালয়ে চালান করা হয় (হিউম্যান ট্রাফিকিং)। তাই বাংলা–বিহারের সীমায় এই পলাশপুর গ্রামে একটি এন জি ও কাজ করে সেইসব হতভাগ্য নেপালী মেয়েদের হয়ে যার সদস্য অভিনেত্রী মনিষা কৈরালা।

মীরা মেয়েদের কাউনসেলিং করেন। তাদের মেনস্ট্রিমে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় সদাব্যস্ত আজকাল। স্বনির্ভর হওয়া, আত্মসচেতনা ও আত্ম মর্যাদা বাড়ানোর কাজে সাহায্য করেন।

সংস্থার নাম আম্রপালী। লোগোটাও ভারি সুন্দর। এক বৌদ্ধ্য শ্রমণকে জলপান করাচ্ছেন এক বারবণিতা।

মেয়েরা ভীষণ কাঁদে। ওরা হাত পা ছুঁড়ে বলে : এই ঘৃণ্য জীবন কি শেষ হবেনা ?

মীরা বোঝান যে জীবনের অর্থ কেবল শুদ্ধতা নয়। শুদ্ধ, অশুদ্ধ সমস্ত কিছু নিয়েই জীবন। মানুষ একধারে ভালো অন্যধারে মন্দ। জীবনের অর্থ অতীতকে ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। বহু মানুষের সাথে দেখা হবে। দেখা হয়। তারা কেউ মান ও হুঁশ কেউবা নিখাদ জন্তু। তাদের নখের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হই আমরা। তবুও জীবনের স্রোত থেমে থাকেনা। লাইফ গোজ অন। নতুন করে হিসেব নিকেষ করতে হয়। আনন্দস্নান করে ডুব দিতে হয় জনসমুদ্রে।

কাজ হয় এইসব কথায়। আসলে মীরার কথা বলার ভঙ্গীমাটি ভারি সুন্দর। আস্তে আস্তে, গুছিয়ে বলেন। লোকের ভালোলাগে। স্ট্রেট ফ্রম হার্ট।

ওরা কাজ পেলে চলে যায় অন্য শহরে, অন্য পরিচয়ে। কখনো বিদেশে।

মীরাার নিজের জীবনই তো আজ এক ধাঁধা। তার সামাজিক পরিচয় কি ?

মন্দিরে গিয়ে সিঁদুর পরিয়েছে তো মুখোশ। সেকালে যেমন উত্তম –সুপ্রিয়া বলতেন -- আমরা বিয়ে করেছি। বিন বিয়াহি নই।

সেরকম মীরা ও মল্লার। আসল গল্প কেউ কি টের পায়না ? পরিচিত গন্ডী ছেড়ে জীবনকে নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার সাহস কজনের থাকে ? তাও মফ:স্বলে ও গ্রামে?

মীরার মতন আর কি কেউ এরকম আছেন ? বিন বিয়াহি ? স্বেচ্ছায় ??

অস্তমিত যৌবনে, মেনোপজের পরে প্রথম সম্ভোগের আনন্দ নিতে চাওয়া নষ্ট বুড়ি?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভাবছে মল্লার। কারণ একটু আগেই পুড়িয়ে ফিরেছেন মীরাকে। মীরা আত্মহত্যা করে নি। ওকে মেরে ফেলেছে গ্রামবাসীরা। ডাইনি সন্দেহে।

কারণ ও নাকি আম্রপালীর ছোট অফিস ঘরে সুন্দরী নেপালী মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে জাদুটোনা করে -মেয়েগুলো তারপর কোথায় চলে যায় কেউ জানেনা।

তাই পেট্রল ঢেলে তাকে পুড়িয়ে ফেলেছে ওরা।

আগুন এখনো জ্বলছে। মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে গ্রাস করছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিপাশ - ওম্ স্বো-য়াহা। (স্বাহা)। মাল্লার হাতটা বাড়িয়ে ছুঁয়ে ফেললো শিউলিগাছের ফুলগুলো। এক এক করে কুড়াচ্ছে, নিষ্পাপ ফুল। ফুল তবুও নির্মল। এই ভয়ানক গ্রামে। যেখানে বাতাসে মানুষ পোড়ার গন্ধ। বাতাসে ভেসে আসছে শোকগাথা। চিরন্তন দু:খগুলো হাসিতামাশা করছে নিজেদের মধ্যে। বলছে : যুগ যুগ ধরে দু:খের এই এক প্যাটার্ণ এবার চরিত্র বদলাক।

ওরা হেসে কুটোপাটি। কে বলবে ওরা দু:খ দরিয়ার অসুখ কণা, বোঝার উপায় নেই।

মল্লারও জোরে জোরে হাসছে -- হা হা হা হা -----

হাসিরেখা মিলিয়ে যাচ্ছে কালের গহ্বরে ---- শিউলিবাড়িও তাহলে আজ পুড়ছে।

এতক্ষণে চুমুক দিয়ে চায়ের পেয়ালাটা বুঝি শেষ করা হল, চিনামাটির পেয়ালাটা সরিয়ে রেখে মল্লার -----!!!!!!

কমলালেবু রঙের গাড়ি

অস্ট্রেলিয়ার ছোট্ট শহর ডেলস্‌ফোর্ড। পাহাড়ি এলাকা। সুন্দর, ছিমছাম। সমস্ত সুবিধে আছে এই ক্ষুদ্র জনপদে। একটি প্রাকৃতিক জলাশয় আছে যার রূপে পাগল হয়ে যাওয়া যায়। গোয়েন্দা শার্লক হোমসের সঙ্গে আলাপ ভ্রমণ পাগল, বঙ্গ তনয়া অনন্যার এই জলাশয়ের পাড়েই, পেপার- টির সুঘ্রাণ নিতে নিতে। উডস্টক ভিলা নামক কাঠের বাড়ি, জলের ওপর, আদতে দোকান। অঢেল বই দোকানটিতে, সদালাপী সাদা চামড়ার মালিক ও মালকিন এবং গোয়েন্দা শার্লক হোমস একসঙ্গে ---লোভনীয় পটভূমি। অনন্যা বাঙালী মেয়ে হলেও চিরটাকালই ডাকাবুকো। লোকে বলতো : টমবয়। কলেজে পড়তে পিঠে রুকস্যাক বেঁধে বেরিয়ে পড়তো দূর অজানায়। সুদূরের পিয়াসী বলেই হয়ত ঘর বাঁধলো মহাদ্বীপ, ভিন্ন মহাদেশ অস্ট্রেলিয়ায়। বিয়ে করলো একজন মুসলিম সহপাঠীকে সবার আপত্তি সত্ত্বেও। অনন্যা মুখোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ -শ্রেষ্ঠ হল অনন্যা হুসেইন। স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ইতিহাস।

পেশায় একদিকে প্রত্নবিদ। মাটি খুঁড়ে পুরনো মানুষ ও তার কঙ্কাল বার করে হিসেব নিকেষ করেন সভ্যতার, মানব জমিনের বয়সের। কঙ্কালের মাথায় চোট দেখে বুঝতে সক্ষম হন আগেও অপরাধীরা নির্মম হত আজকের মতন। অপরাধ ও প্রেম অবিনশ্বর।

অনন্যা মদিরাবতী। একটি বারে কর্মরতা। ছোট স্কার্ট, গলায় ঝকঝকে মুক্তো। সুরাপাত্রে পরিবেশন করে অনন্য ওয়াইন কিংবা ভদ্‌কা। ওর কোনো ছুঁৎমার্গ নেই।

ডবল এম এ, একটি ইংলিশে অন্যটি সমাজ বিজ্ঞানে।

ভালোবাসা ও সৃষ্টিশীলতার কোনো জাত হয়না, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

সন্ধ্যে ছটায় হাজির হয় বারে। ফেরে ভোর পাঁচটায়। তারপরে গরম জলে স্নান করে স্বামীর শয্যা সঙ্গী হয় কিছুক্ষণ। ওরা বলে ক্রিকেট ম্যাচ। ম্যাচ হয়ে গেলে হালকা ব্রেকফাস্ট খেয়ে শুতে চলে যায়। স্বামী সেজে গুজে কাজে বেরিয়ে যান। পতি অন্ত প্রাণ অনন্যার।

একটি সন্তান বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। নাম অঙ্গদ, অঙ্গদ হুসেইন।

ছুটি ছাটায় বাড়ি আসে। বাবা মাকে ছেড়ে যেতে চায়না বেচারা!

স্কুল জীবনে ফিরে গেলেই বাবা মাকে বেমালুম ভুলে যায়।

আসলে অনন্যার বেড়ানোর নেশা তাকে সন্তানের কাছ থেকে দূরে করে দিয়েছে। হোস্টেলে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে ভালো মানুষ হবে এটা বাইরের দুনিয়া জানলেও অনন্যা জানে যে তার ভ্রমণে ব্যাঘাত যাতে না ঘটে তাই এই ব্যবস্থা। হয়ত কোনো কোনো ছুটিছাটার দিনে ও চলে যায় অ্যাডিলেড গামী বাসে করে নিরুদ্দেশে। কিংবা গাড়ি নিয়ে গ্রেট ওশিয়ান রোডে। একদিন মোটেলে থেকে সমুদ্রের গর্জনে স্নান করে ফিরে আসে নিজগৃহে। সবই তার হঠাৎ করে হয়। সংসার আছে কিন্তু অন্তরে ভবঘুরে। এমনিতে অনন্যা খুব সংসারী। নিপুন হাতে ঘরের কাজ করে। বারেও সে বেশ জনপ্রিয় মানুষ। অনেকের লোলুপ দৃষ্টি ছাড়িয়ে স্নেহ মাখা দৃষ্টিও স্পর্শ করে তাকে। বুড়ো বুড়িদের নিজ হাতে তুলে দেয় গাড়িতে। কচিকাচাদের শাসন করে : বেশি খেয়োনা। গাড়ি চালিয়ে যেতে হবেনা!

ওরা মাঝে মাঝে রেগে যায় : সিটিং ইন আ পাব হোয়াই আর ইউ সো মাদারলি?

- বিকজ আই অ্যাম ইওর মাদার, বলেই গালে টোল ফেলে প্রীতি জিন্টার মতন হেসে ওঠে।

সম্প্রতি, বাইরের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে উড়ে আসে উল্কা। এক বুড়ো খুব বিরক্ত করতে আরম্ভ করে তাকে। বয়স আন্দাজ ৬৫। এন আর আই। ব্যাবসায়ী। কন্ট্রোল ফ্রিক। মদ্যপ। লম্পট। মদ খেতে খেতে প্যান্ট খুলতে আরম্ভ করে। অনন্যা শুনেছে লোকটি ক্যাসিনো চালাতো, দু নম্বরী করে ধরা পড়ায় ব্যবসা বন্ধ হয়েছে।

আদতে বাঙালী। নাম অরণি দত্ত। পরিচয় দেয় : রণি ড্যাট্রা বলে।

বুড়োর ঢুলুঢুলু চোখ ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে গা ঘিনঘিন করে অনন্যার।

বরকে বলতে সঙ্কোচ হয়। কারণ প্রফেসর সাহেব এক কথায় সবকিছু নাকচ করে দিতে ওস্তাদ, বলবেন : কাজ ছেড়ে দাও। তোমার এই অ্যাডভেঞ্চার করার স্বভাব তোমায় একদিন ডোবাবে।

কাজেই তাঁকে কিছু জানায় না। অনন্যার ভালোলাগে বিভিন্ন মানুষ দেখতে। পেটে পানি পড়লে কেমন গলগল করে বেরিয়ে আসে গোটা জীবনটা সবার সামনে ----

অনন্যা এনজয় করে। মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতিটি মানুষ কী দু:খী। জীবন এত করুণ ও কৃপণ কেন ? অনন্যা যেন সকরুণ বেণু বাজাবার মতন সুরাপত্র ভরে দেয় নতুন সুধায় প্রতিটি মায়াবী রাতে। চাঁদের মিহিন আলোয় কাচের জানালা হয়ে ওঠে আধি ভৌতিক। ভেতরের মানুষগুলি মুখোশে মোড়া কাঠের পুতুল, ক্ষণিকের জন্য। অনন্যার হাতে। অনন্যা মেতে ওঠে পুতুল খেলায় !

বুড়ো পুতুলের মাথা মেলার পুতুলের মতন নড়ে, ক্রমাগত।

ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হবার প্রচেস্টা ও একদিন বিপজ্জনক জায়গায় হস্ত সঞ্চালন। অনন্যা সাবধানী। এরপরে মোবাইলে ন্যাস্টি মেসেজ। নোংরা আবেদন। সমস্ত শালীনতার সীমা অতিক্রম করলেও অনন্যার নীরবতা লক্ষ্য করে বুড়োর মনে আক্রোশ জন্মায়। মৃত্যুর হুমকি দিয়ে বসে সে। অনন্যা শঙ্কিত, ত্রস্ত। তার করুণ আবেদন শুনেই প্রথম দেখা করতে রাজি হন প্রখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস। অনন্যা তার কমলা লেবু রঙের গাড়ি চেপে দেখা করতে গিয়েছিলো নিরিবিলি এক জায়গায়। ডেলসফোর্ডে।

সেখানেও এক বিন্দু বেড়ানো, এক মুঠো অ্যাডভেঞ্চার। শার্লক যেন সিলভেস্টার স্ট্যালোন। অথবা হ্যারিসন ফোর্ড। নারী তার কোমলতা নিয়ে ডুবে যেতে চায় কাঠিন্যে, শামুকের খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ার মতন। অনন্যাও তার পুরুষোচিত নারীত্ব নিয়ে হেরে যেতে চায় এই ধরণের মানুষের কাছে, ইচ্ছে করে - বারে বারে। তবে শার্লক সেরিব্রাল। তার

মস্তিষ্ক তরবারির মতন। সবকিছুকে ফালাফালা করে দেয়। বুদ্ধির ছটা আলোর মতন মোলায়েম নয়। মোলায়েম বরং পরিবেশটা। পেপার টি খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। ইউক্যালিপটাসের মিষ্টি গন্ধ, জলে ঢেউ-এর আনাগোনা, পাখির গান --অলিভ গ্রিন পায়জামা ও অফ হোয়াইট টি শার্টে শার্লক মায়াবী। অনন্যা ভারতীয় শাড়িতে। মেহগনি রঙের বালুচরী। শ্যাওলা ব্লাউজ।

শরদিন্দুর ভাষায় যা হতে পারে ব্রাউজ। অর্থাৎ ব্রা কাটিং ব্লাউজ।

নরম মোমের মতন শরীরের বিভায় হয়ত বা গোয়েন্দা মুগ্ধ। গোয়েন্দার মন বোঝার ক্ষমতা সবার থাকেনা। দোকানের মালিক চায়ের শুন্য পেয়ালা পূর্ণ করে দিয়ে গেলেন। মধ্য বয়স্ক। পুরু ফ্রেমের সোনালী চশমা। নম্র।

- আমি যখন জন্মাই তখন আমার নাম ছিলো টম হোমস। কিন্তু গোয়েন্দা শার্লক হোমসের ভক্ত ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। তিনি আমার নাম পাল্টে রাখেন : শার্লক।

তখন কেউ ভাবেনি আমি সত্যি একদিন গোয়েন্দা হব।

মৃদু হাসে অনন্যা। সাহেবদের অ্যানা।

-লোকটি ঠিক কি হুমকি দিয়েছিলো আপনাকে ? জানতে চায় হোমস।

অনন্যা বিস্তারিত ভাবে সব জানায়। কবে, কোথার থেকে, কীভাবে ইত্যাদি।

লোকটি মাঝে অ্যানাকে পিছু ধাওয়াও করতো। থার্ড হ্যান্ড মার্সিডিজ নিয়ে অনন্যার রূপালি মাছের মতন সরু গাড়ির পেছন পেছন যেতো। অ্যানা ভয়ে লুকিয়ে পড়তো পুলিশ হেড কোয়ার্টারের পেছনে। গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকে যেতো। অ্যাব অরিজিন কিংবা ভদ্রভাবে বললে : ইন্ডেজেনাস মানুষের রাইটস্ সম্পর্কে যেন জানতে চায় এরকম ভান করে ঘুরতো পুলিশ স্টেশানের মধ্যে। রণি ড্যাট্রা চলে গেলে বেরিয়ে আসতো। যেন সাপ ও বেজির খেলা।

সব জানালো নিখুঁত ভাবে । শার্লক নোট করে নিলেন । ডিজিট্যাল ডাইরিতে ।

- হাতে লেখার অভ্যাস চলে গেছে বুঝলেন মাদাম । এখন হাতে লিখতে কষ্ট হয়। বরং বন্দুক চালাই নিপুন ভাবে । বলে ক্যাঙ্গারু পাই-এ মুখ ঢোকালেন ।

সাধারণত: মিট রোস্ট, ব্রকলি সেদ্ধ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ দিয়ে লাঞ্চ সারেন শার্লক । একটু উল্টেপাল্টে নেন । অনন্যা লাঞ্চে খায় রাইয়ের রুটি (লো -জি আই, গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স) ও সামান্য সবজি । সঙ্গে মুর্গি কিংবা মাছ বেক করা ।

আসলে অনন্যা তো লাঞ্চ খায় বিকেলে । ঘুম থেকে উঠে । সারাদিন তো ঘুমিয়ে কাটায় ।

শার্লক জানালেন, তদন্ত হবে ।

বেশ কিছুটা সময় গেলো । জানা গেলো এইসব কাজে সময় লাগে । প্রমাণ ও জটিলতা সরিয়ে নির্যাস নিয়ে তদন্ত হল । সম্পর্কও গাঢ় হল গোয়েন্দা ও ক্লায়েন্টের । পাকড়াও হল রণি ড্যাট্রা । উত্তম মধ্যম দেওয়া হল তাকে । বুড়ো হাড়ে অত যাতনা সইলো না । অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল । সেখানেও বিপত্তি । এক নার্সকে মোলেস্ট করে বসলো । জানা গেলো পার্ভার্ট বুড়ো বাড়ির কুকুর বেড়ালকেও ছাড়েনা ।

অতএব এবার যাবে মানসিক হাসপাতালে ।

অর্থাৎ একটি নিষ্পত্তি হল কেসটির । অনন্যা ওরফে অ্যানা ধন্যবাদ জানালো শার্লককে । শার্লক পেশায় পুলিশ কিন্তু পদমর্যাদায় গোয়েন্দা ।

আসলে অনন্যার গোয়েন্দাদের প্রতি তেমন সমীহ ছিলনা । নিজের বোনের বিয়ের সময় এক গোয়েন্দা ভাড়া করা হয়েছিলো দিল্লীতে । পাত্রপক্ষের খোঁজ খবর নেবে । গোয়েন্দা গিয়ে পাত্রের কাছে মোটা টাকা দাবী করে বসে । বলে : টাকা দিন ভালো রিপোর্ট দিয়ে দেবো । পাত্র ছিলো নীতিবাদী ভেতো বাঙালী । নীতি নিয়ে বাঁচে, নীতি বেচে খায় ।

বললো : দূর মশাই, যা ইচ্ছে রিপোর্ট দিন গিয়ে যান, মামদোবাজি পেয়েছেন ? হ্যাঁ ? টাকা টানার যত্তসব ফন্দি।

টাকা না পেয়ে গোয়েন্দা বাজে রিপোর্ট লিখে দেয়। পাত্র সোজা হবু শ্বশুরবাড়িতে যোগাযোগ করে বলে : আমার ওপরে আপনাদের ভরসা নেই ? আমি কি এতই মন্দলোক ? দেখুন ছাপোষা মানুষ আমি। কোনো কুকর্মে লিপ্ত নই। অফিস ব্যাতীত বাড়িতে নেট পর্যন্ত করিনা ! আর অফিসে তো অর্ধেক সাইটই খোলেনা !

পাত্রের এহেন সরলতায় পাত্রীপক্ষ মজলেন এবং বিবাহ হয়ে গেলো। সবাই বললেন : অ্যাট লিস্ট ভালো রিপোর্টের জন্য ঘুষ ঘাস তো দেন নি !

গোয়েন্দা শার্লক হোমস অন্যরকম। হবেনই তো তাই তো নামের মাধুর্য আছে।

ইনি কি যে সে !

অনন্যা পতিব্রতা। সুখী গৃহিনী। ছেলে বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। স্বামী অধ্যাপক, ইতিহাস খনন করেন। খেয়ালি, পন্ডিত, নিজের সৃষ্ট জগতেই থাকেন। কালো হন্ডা চড়েন, জাপানী গাড়ি, ইকনমিক। তবে খনন কার্যে কৃপণতা না পসন্দ।

অনন্যা কমলালেবু রঙের গাড়ি কিনেছে। রূপালি মাছের মতন গাড়িটা ইদানিং গ্যারেজেই থাকে।

একদিন খবরের কাগজে সংবাদ এলো : গোয়েন্দা শার্লক হোমস নিহত হয়েছেন। ভারতীয় ছাত্রদের উত্যক্ত করা একটি অ্যাফ্রিক্যান গ্যাংকে ধরতে গিয়ে গোলাগুলির বর্ষণে প্রাণ হারিয়েছেন। খুব কেপেবেল অফিসার ছিলেন। তুখোড় আবার সংবেদনশীলও। অবসরে কবিতা লিখতেন।

পুলিশ মহলে শোকের ছায়া। অফিসার দারপরিগ্রহ করেন নি। স্ট্রেট সেক্স। একাই থাকতেন।

সমাধিস্থ করা হবে মেলবোর্নের কাছেই। মেলবোর্ণ কাপের দিন পাবলিক হলিডে। সেদিনই সমধিস্থ করা হবে। কারণ দেহে পচন ধরছে। মেলবোর্ন

কাপ ঘোড়ার রেসের খেলা। সবাই আনন্দে মেতে ওঠেন সেদিন। কিন্তু আজ আকাশে বাতাসে বিষাদের সুর। লোকে হাসতে ভুলে গেছে।

শববাহী গাড়ি এগিয়ে চলেছে, শায়িত প্রিয় অফিসারের দেহ । সবাই শ্রদ্ধাবনত।

শুইয়ে দেওয়া হল এক সময় অফিসারকে । চিরঘুমে । সিমেটারিতে । ধর্মীয় কাজ হল সুষ্ঠভাবে। ফুলে ফুলে ছেয়ে যাওয়া কফিন নিপুন হাতে ভরে দেওয়া হল গর্তে। তারপর নৈঃশব্দ। এক চরম উদাসীনতা চারিদিকে। তবুও বিদায় নিতেই হবে। কাজেই এক সময় বিদায় নিলেন সবাই।

সূর্যাস্তের কমলা আভা মেখে একটি কমলালেবু রঙের গাড়ি এসে দাঁড়ালো গোরস্থানের গেটে ।নেমে এলেন এক সুন্দরী। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন শার্লকের কবরের দিকে যেখানে শায়িত বীর সন্তান। আলতো করে রেখে দিলেন একটি গার্ডেনিয়া ফুল।

গাড়ির কমলা রঙ ও ময়ূখমালির কমলা মিলে মিশে একাকার।

বহু দূরে এক স্কুল গোয়িং হোস্টেল ফেরৎ ছাত্র তার অধ্যাপক বাবাকে জিজ্ঞেস করলো : বাবা সব ফুল কথা বলে, একটি করে মানে আছে, গার্ডেনিয়া ফুলের অর্থ কী?

বাবা হেসে বলেন : সোনা, এই ফুলের অর্থ : You're lovely; secret love --

জিগোলো

ব্যাঙ্গালোর শহরের একটু বাইরে এক সবুজের অভিযান শেষ করে একটা বড় গেট । সার দেওয়া কৃষ্ণচূড়া পেরিয়ে ঝাঁ চক্চকে একটি অফিস । কাঁচের ঘর, মসৃণ মেঝে, চওড়া নরম সোফা । নাতিদীর্ঘ পোশাকে রিসেপশনের ডেস্কের আড়ালে সুন্দরী ললনা ।

মন্ত্রা এন অগস্ত ইনফর্মেশন সিস্টেমস্ লিমিটেডের অফিস ।

ভেতরে সুসজ্জিত ঘর, ব্রিলিয়্যান্ট কোন ইন্টিরিয়র ডিজাইনারের সৃষ্ট অফিস স্পেস।

একদিকে কফি মেশিন রাখা সেখানে গেস্টরা এসে টুকটাক কফি ভরে নিয়ে বিলাসবহুল সোফায় বসে খাচ্ছেন । সুট বুট পরিহিত এক্সিকিউটিভেরা নিজেদের মধ্যে মার্কিনি অ্যাক্সেন্টে কথা বলছেন ।

সিকিউরিটির লোক ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে । অলিভ পোশাক, কাঁধে হাজার গন্ডা মেডেল আঁটা, যেন পরমবীর চক্র পেয়েছেন ।

কিউবিকেল, হ্যাঁ কিউবিকেল গুলো পর পর দাঁড়িয়ে আছে । ভেতরে দুজন করে বসার ব্যাবস্থা । মণিদীপা চৌধুরী যখন প্রথম এই অফিসে আসে জুনিয়র হিসেবে ওর দম বন্ধ হয়ে আসতো । কিন্তু পেটের দায়ে কাজে আসতেই হত ওকে প্রতিদিন ।

রোজ সকালে উঠে অফিসের কথা মনে করে মাথা ধরে থাকতো । তবুও আসতে হত এই পায়রার খুপড়িতে । গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা । পাশের জন কম্পিউটারের মণিটর মায় পাসওয়ার্ড পর্যন্ত গিলে খাচ্ছে । এক সিনিয়র ম্যানেজার ওকে শিখিয়েছিলেন, যখন তখন সহকর্মীদের ডেস্কের কাছে চলে যাবে, আড়চোখে দেখবে কি লিখছে ই-মেলে, যখন টয়লেটে যাবে তখন ওর মেল খুলে পড়ার চেষ্টা করবে । এই হল প্রতিযোগিতার বাজার । এগুলো না করলে আমাদের গ্রুপ অন্য গ্রুপকে টক্কর দিতে সক্ষম হবেনা, ইয়ার এন্ডিং এর প্রাইজগুলো আমরা পাবো না, বুঝলে না --

মণি আমতা আমতা করে বলেছিলো – স্যার আ–আমি ––!

বোকা –ভীতু মেয়ে কোথাকার ! পিঠে আলতো চাপরানি দিয়েছিলেন ওর ম্যানেজার মিস্টার বাত্রা । চাপড় মারার সময় শূন্যে থাকার চেয়ে হাতটা যেন একটু বেশী সময় পিঠে ছিল । ভীতু মেয়ে ভাবার চেষ্টা করেছে, এ তো স্নেহের চাপড়, উনি তো আমার অগ্রজই । বিবাহিত, সুখী, স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।

অফিসে সদা জাগ্রত অজস্র আঁখির মর্মভেদী বাণ বিদ্ধ করছে প্রতিনিয়ত ।

চোখাচোখি হলেই নকল হাসি ছড়িয়ে যাচ্ছে মুখে । যেন কত আপনার তারা, হেসে নিজেদের মমত্ব জানাচ্ছে ।

মৃত্যুর চেয়ে জীবনে বেঁচে থাকাটাই যেন বেশি শক্ত আজকাল । মারা যাওয়া অনেক সহজ, অনেক সহজ, অনেক সহজ ।

ওর একটু কবিতা টবিতা লেখার বাতিক ছিল । একটু সংবেদনশীল মন একটু ভাবুক ।

লাঞ্চের সময় খাবার খেতে খেতে সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা না মেরে ও কবিতার বই পড়তো কিংবা ওয়েবজিন খুলে নতুন কবিদের কবিতা ওয়ার্কশপে ঢুকে মেধা মালাই দিত । পাশে বসা পদ্মলক্ষ্মী হেসে গড়িয়ে পড়তো ।

- তোমরা বাঙালিরা পাগল আছো, খালি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকো । এখন এক হয়েছে ওয়েবজিন, লাইফ তো একটাই ইয়ার, জাস্ট এনজয় ! কম্পিউটারে হুমড়ি খেয়ে পড়া বন্ধ করো । জীবনকে উপভোগ করো ––বলে হেসে উঠতো পদ্মলক্ষ্মী ।

মণিদীপাও হাসতো । মিষ্টি হাসি । হেসে বলতো –– কেউ কেউ পাগল নাহলে আজ এই ঠান্ডা ঘরে বসে সহজেই এত ডায়লগ দিতে পারতে ? হয় গভীর বনে কাঠ কেটে জীবন কেটে যেতো নয়ত হায়নার সঙ্গে লড়াই করতে হত । আর আমি কবিতা ভালোবাসলেও বিজ্ঞানকে হেয় করে যেই সব কবি তাদেরকে একেবারে পাত্তা দিইনা । খেয়াল করবে বিজ্ঞান না

থাকলে কিন্তু কবিবর প্রথম কবিতাটা লিখে বাক্সবন্দি করেই রাখতেন। গুটেনবার্গ কিংবা এডিসন না এলে আজ কি হত ভাবতে পারো ? পাখির পালিক দিয়ে তালপাতায় লিখে লিখে হাত ব্যাথা হয়ে যেতো, একসময় লেখা ছেড়ে দিতো। এখন দেখো তো ডাবলু ডাবলু ডাবলু ডট কম এসে কত সুবিধে হয়েছে, অংকের এই মেধা মালাই না থাকলে পারতাম কি আমি বাংলার এত দূরে বসে বাংলা গল্প কবিতা পড়তে নাকি তুমি পারতে কাজে ফাঁকি দিয়ে সুদূর পরবাসে তোমার বোনের সঙ্গে সাংসারিক কূটকাচালির গল্প করতে ?

এবারে যেন পদ্মলক্ষ্মী খোঁচা খেয়েও একটু খুশি হল, বেশ জব্দ করা গেছে কবিগুলোকে ! ওগুলো দুচোখের বিষ। ভালো লেখকগুলো তো বেড়ে বজ্জাত লুকিয়ে চুরিয়ে যা করে মানুষ সব ছাপার অক্ষরে লিখে ফেলে, পিত্তি জ্বলে যায় পদ্মার। সেই স্পিসিসগুলোকে নাস্তানুবুদ করা গেছে দেখে মণিদীপাকে লাঞ্চ খাওয়াবে স্থির করলো। মণিদীপার অবশ্য কোন তাপ উত্তাপ নেই। কারণ সে জানে এর লাঞ্চ মানেই সেই একই শান্তি সাগর কিংবা শক্তি সাগরে ঢুকে সস্তায় ধোসা –ইডলি অথবা হাজার রকমের রাইস, কার্ড রাইস, লেমন রাইস, ভেঙ্গি –বেগুন ভাত (ইংলিশে ওরা লেখে বাথ) রাইস বাথ, বিসেবেলি বাথ (সস্তার খিচুড়ি ওপরে সাবুর পাপড় ছড়ানো) ইত্যাদি।

কোনক্রমে পেট ভরলেও মন ভরবে না। তাই মণি বিশেষ আগ্রহ দেখালো না।

আর এই কাজের জগতে তো বন্ধু বলে কিছু হয়না। কে কোথায় কি কলকাঠি নাড়ছে, এই তো পাশের কূপের রম্ভা আর লাভনইয়া খুব বন্ধু ছিলো। কিন্তু দুজনেই দুজনের সম্পর্কে নালিশ জানাতো তাদের বসকে। অথচ দুজনে গলায় গলায়। কাজেই মণি বেশি বন্ধুত্বের ধার ধারেনা, স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিল পদ্মলক্ষ্মীকে যে ও খেতে যাবেনা, ওর শরীরটা ভালো নেই। পদ্মার মুখখানি একটু মেঘে ছেয়ে গেলো। ইতিমধ্যে আরেকজন এসে উপস্থিত হয়েছে। সুপুরুষ, সুঠামদেহধারী ও আকর্ষক হলেও মানুষ হিসেবে লোকটি সুবিধের নয়, খুব গায়ে পড়া। চুইং গামের মতন সেঁটে যায়।

সভ্যতার কোন ধার ধারেনা। কেউ অসুস্থ হয়ে বাড়িতে থাকলেও ক্রমাগত ফোন করতে থাকে। তারপর শুরু হয় এস এম এসের ঘটা। তিতি বিরক্ত হয়ে তখন ফোন বন্ধ রাখতে হয়। মুখে সবসময় কথার ফুলঝুরি। বড় বড় ম্যানেজার, ডিপার্টমেন্টাল হেডদের কথায় ও ব্যবহারে নাকানি চোবানি খাওয়ায়।

যাকে যা ইচ্ছে তাই বলে দেয়, হেনস্তা করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল কেউ

প্রতিবাদ করে না, ওকে কেউ চটায় না। নিজে কেঁদে ককিয়ে বি-এ পাশ করে কি করে যে এই এতবড় কোম্পানিতে ঢুকে সবার ওপরে ছড়ি ঘোরাচ্ছে সে এক বিস্ময়। একজন খুব পদস্থ ব্যাক্তি ওকে রিক্রুট করেছিলেন তাই ওর চাকরি হয়েছে।

তারপর কাজে গাফিলতি করেও আজ সে সবার মাথায় চড়ার সিঁড়ি পেয়ে গেছে।

লোকে অবাক হয়েই থাকে। স্পিকটি নট। ওর নামের আদ্যাক্ষর হল ডি বি।

ওকে সবাই ডি বি বলেই ডাকে। আড়ালে মণি অবশ্যি ওকে দালাল বিশেষ বলে থাকে। ডি বি জাতে নীচু। অনেকে বলে সেই কোটায় হয়ত ঢুকেছে যদিও ওদের কোম্পানিতে এইরকম কোন কোটা নেই তবুও বিগ বসের মনের মাঝে আন্ডার প্রিভিলেজড্ বলে সহৃদয়তার জাল বুনে সে ঢুকে পড়েছে, এখন রাজত্ব করছে উচ্চশিক্ষিতদের মাঝে। এদের অফিসে যেহেতু দক্ষিণী বেশি তাই জাতপাতের লড়াই তলায় তলায় ভালই চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা দল বেঁধে খেতে যায়, অব্রাহ্মণরা সেখানে অনাহুত। এই প্রথাভাঙার জন্যই হয়ত কোন উচ্চপদস্থ কর্তা ডি বি কে রিক্রুট করেছেন, হতে পারে।

সবাই ডি বি-র ব্যবহারে থরহরি কম্পমান। তবুও কারো যোগ্যতা না থাকলেও তাকে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেবার মতন অসভ্যতা করার কেউ

হয়ত প্রয়োজন বোধ করেন না।

ওদের ভাইস প্রেসিডেন্ট তো উচ্চ শ্রেণীর আইয়ার ব্রাহ্মণ। তিনিও এইসব জাতের বেষ্টনীতে ভালই বাঁধা। নিজের জাতের লোকেদের ফেভার করেন বলেও বাজারে গুজব আছে। পাক্‌কা নিরামিশাষী। পেঁয়াজ পর্যন্ত ছোঁননা। রক্ষণশীল মানুষ।

অফিসের বাইরে নীচু জাতের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা কিংবা কথা পর্যন্ত বলেন না। নিজের জাত নিয়ে যথেষ্ট গরিমা আছে সেটা মাঝে মাঝে হাবে ভাবে বেরিয়ে পড়ে।

হঠাৎ মধ্যদিনের বেসুরো গানের মতন ডি বি-র আগমণ দেখে মণি ও পদ্মলক্ষ্মী দুজনেই একটু বিরক্ত হল। এসেই একমুখ হাসি হেসে শুরু হয়ে গেলো বাক্যবাণ -- শোঁ শোঁ করে ছুটে আসছে তীরগুলো।

- কি করছো মিনি লেডিজরা ? (মিনি লেডিজ কারণ ওর মতে আজকাল নারীরা পুরুষদের মতন চাপা পেন্টুলুন পরে তাই ওরা ফুল লেডিজ নন)

তারপর পদ্মলক্ষ্মীর দিকে চেয়ে বললো- তোমাকে তো সলমন রুশদি ভাগিয়ে দিয়েছে, কি এমন কূকীর্তি করেছিলে ?

রাগে পদ্মলক্ষ্মী ফেটে পড়তে চাইছে কিন্তু পারছে না। এহেন স্থুল রসিকতায় যারপরনাই বিরক্ত। যদিও সে নিজেও অন্যকে খোঁচা দিতে ছাড়ে না সুযোগ পেলে।

তবুও, তবুও রেগে গেলো কিন্তু চেপে রাখতে হল।

একটু ভারী গলায় বলে উঠলো- ডি বি আই এম নট দ্যাট পদ্মা, আই এম ইওর কলিগ অ্যান্ড মাই হাজব্যান্ড রানস্ আ কমার্শিয়াল ওয়েবসাইট।

একটু চিরবিরিয়ে, কেটে কেটে বললো ইংলিশেই।

ডি বি দমার বান্দা নয়, সেও ততোধিক জোরের সঙ্গে বলে উঠলো - হোয়াট ডু ইউ মিন বাই, হি রানস্ আ ওয়েবসাইট ? তুমি কি বলতে চাও ও ওয়েবসাইটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায় ?

গা জ্বলে গেল পদ্মার। ইচ্ছে করছিল পেপার ওয়েট দিয়ে মুন্ডু ভেঙে দিতে।

কিন্তু সভ্যতা, ভদ্রতা -- কিছু মুখোশ। এগুলোকে তো অমান্য করা যায় না, সবাই তো ডি বি হতে পারেনা !

ওদের সহকর্মী বিজয় মালহোত্রার পিতৃবিয়োগ হয়েছে । সবাই সমবেদনা জানাচ্ছেন এমন সময় ডি বির আবির্ভাব। শুরু হল বাক্যবাণ --

জন্মালে মরতেই হবে। এই নিয়ে এত আদিখ্যেতা করার কি আছে ?

তোমরা কেন কাজ না করে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো ?

মণি সেদিন ভাবছিল যে মানুষ এত নির্মম হতেও পারে ?

ডি বি কথা পাচার করে বলেও অভিযোগ শোনা যায় । সহমর্মিতা দেখিয়ে লোকের পেটের কথা টেনে বার করে তার সেই কথা চাউর করে । নোংরা রাজনীতি করে ।

ওর বাবারও একই হাল । হাউজ ওয়ার্মিং সেরেমনিতে ওর বাড়িতে গিয়ে মণি দেখলো যে ওর বৃদ্ধ পিতা খালি সমাজের ওপরতলার মানুষের সঙ্গে কত গা ঘষাঘষি করেছেন তারই ফিরিস্তি দিয়ে চলেছেন । বিশেষ করে উচ্চজাতের সঙ্গে ।

- আই হ্যাভ আ ব্রাহমিন ফেন্ড অ্যান্ড ওয়ান সাত্রিয়া (ক্ষত্রিয়) নেবার -- --

আর ভদ্রলোকের পুত্র মহামান্য ডি বি নেটে ঢুকে ব্রাহ্মণ সারনেম নিয়ে চ্যাট করে বলেও শুনেছে মণি । তাই ও মনে মনে ভাবে যে সমাজ এদের সুযোগ দিলেও দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরোতে এদের বেশ কয়েক প্রজন্ম কেটে যাবে ।

কাজ ফেলে নিজেই এসে হয়ত গল্প জুড়ে দেবে তারপর ফিরে গিয়ে ম্যানেজারকে বলে দেবে - তোমার জুনিয়র কাজের সময় আমাকে ডেকে গল্প করে বিরক্ত করে । ব্যস্ ! হয়ে গেলো । ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়ে ধমকাবে । আজেবাজে কথা বলবে ।

গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়বে ।

ডি বি কাউকে রেয়াৎ করেনা । কাউকে তোয়াজ করেনা ।

যেমন অশ্বিনী দেশমুখ, আই আই টি কানপুরের ফার্স্ট গার্ল। তারপর আই আই এম। কয়েকটি কর্পোরেট হাউজ ঘুরে অবশেষে এখানে। তাকেও কি ছাড়ে ডি বি ? গায়ে চিমটি কেটে কেটে কথা বলে। এক একটা কথা বাঘের আঁচড়ের সমান।

এই তো সেদিন ভরা পার্টিতে অশ্বিনীকে বলে বসলো : একজন কোডিং এর লোক কি পারেনা যা তুমি রিসার্চ হেড হয়ে পারো ?

কিংবা শামসের জঙ। তাকে বললো- তোমাকে কোম্পানি কেন পুষছে জানিনা বাপু !

কোম্পানির লিগাল ম্যাটার হ্যান্ডেল করার কি আর কোন লোক পেলোনা ওরা ?

বলাবাহুল্য শামসের জঙ একজন স্মার্ট, চকচকে লইয়ার। একটু জং ধরা নন জঙ সাহেব। এল এল এম ও পরে ল-তে পি এইচ ডি ডিগ্রীও ভরেছেন ঝুলিতে।

কোম্পানি লয়ের চোস্ত মানুষ। আইনজ্ঞ মহলেও দুঁদে বলে নাম আছে ওঁনার।

তাকেও রেহাই দেয়না আমাদের ডি বি।

সবাই আড়ালে গালি দেয় কিন্তু সামনে হে হে করে হাত কচলায়। মণি কিছুতেই বুঝতে পারেনা কেন এমন হয় ! বুঝে উঠতে পারেনা যে শিক্ষাগত যোগ্যতাহীন ও অকর্মণ্য এই ব্যাক্তিকে কেন এত ভয় পায় আর তোয়াজ করে সকলে।

রথী মহারথীরা পর্যন্ত তাকে সমঝে চলে। কোথাও কোন প্রতিবাদের ঝড় নেই।

মহিলা মহলে ওকে নিয়ে তুমুল হাসাহাসি হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওকে আসতে দেখলে সবাই গম্ভীর হয়ে যায়।

ব্যাঙ্গালোরে আজকাল খুব বৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি উইকেন্ডেই বিকেলের দিকে আকাশ কালো করে ওঠে তুমুল ঝড়। তারপর প্রবল হাওয়ার সঙ্গে আসে বৃষ্টিদানা।

ইলশেগুড়ি নয়, ঝমঝমাঝম । চারিদিক সাদা, লাল মাটির ওপরে ফেনাফেনা ঢেউ । হঠাৎ সৃষ্ট কোন ঝোরার মতন সবেগে বয়ে চলেছে । বাতাসে ঠান্ডা পরশ ।

এই ঠান্ডাটা ভালোলাগে মণির । কৃত্রিম এয়ার কন্ডিশনড্ নয় –প্রাকৃতিক হিমেল পরশ । আলাদা একটা ভালোলাগা জড়িয়ে আছে মণির এই বর্ষণের সঙ্গে । কলকাতার কালবৈশাখীর কথা মনে পড়িয়ে দেয় । দারুণ অগ্নিবাণে সন্ধ্যের সময় আকাশ কালো করে তুমুল ঝড় ও বৃষ্টি । বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ । তৃষিত ধরায় জলের কণা, ভেজা মাটির গন্ধ, বৃষ্টি রাজকন্যে ছিল বন্দিনী, হল শৃঙ্খল মুক্ত তাই আনন্দে মাতোয়ারা । সেই জলোচ্ছ্বাসের ছবি এখনো ধরা আছে মন ক্যামেরায় ।

আজ ছুটি, তাই দুপুরে ওড়িয়া রাঁধুনির তৈরি পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে গরমাগরম ভাত খেয়ে – দিন গড়ালে পি জি অ্যাকোমডেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথে মণি চলেছে লাইব্রেরির দিকে । একটা লাইব্রেরি আছে, সেখানে পঞ্চানন ঘোষালের কিছু অপরাধ বিজ্ঞানের বই এর কালেকশন দেখেছিলো । তার বড় প্রিয় বিষয় । সেই বই সংগ্রহ করতেই যাওয়া । এখানেই আরেক বাঙালী লেখিকার বই দেখেছে । ভদ্রমহিলা একটি ওয়েবসাইট চালান । নিজেই খুলেছেন, নিজেই লেখেন । নিজের পয়সায় একের পর এক বই ছাপিয়ে চলেছেন । তার দুটি কপি এখানে দেখেছে মণি । মাঝে মাঝে পড়ার ইচ্ছে হয় কিন্তু আগে পরিচিত কেউ রেকমেন্ড করুক তবে পড়বে সে । ওয়েবসাইটে চিঠিপত্র দেখে মনে হয় লোকে বইটা পড়ে কিন্তু লেখিকা নিজেই আবার ছদ্মনামে চিঠি ছাপান নি, তাই বা কে জানে ? আজকাল মুখ কম মুখোশ বেশি । এই তো এক ভদ্রলোককে চেনে মণি, লোকটির স্পিরিচুয়াল গুরু আছে, সে আবার কম্পিউটারে বসে মেয়েদের সঙ্গে নষ্টামি করে । দাদা কিংবা কাকার মুখোশ পড়ে নেয় তারপর সহজেই হাতে চলে আসে সেই স্বর্ণডিম্ব । স্ত্রী ভাবেন বিদ্বান স্বামী অফিসের পরে কম্পিউটার খুলে না জানি কোন নতুন অ্যালগরিদম্ লিখছেন । সংসারের কোন কাজ করেন না -- অফিসের পরে আমার একদম সময় নেই মেশিনে বসতে হবে –এই বলে গিন্নির ঘাড়ে সব দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দেন ।

একদিন মজা করে মণি বলে ফেলেছিল– আপনার যা দৈহিক ওজন তাতে মেশিনে বসলে তো মেশিন ভেঙে যাবে, কালকে কি করে চালাবেন ।

ভদ্রলোক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফু: করে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিলেন ।

মণির দু:খ হয় ওর সরল স্ত্রীর কথা ভেবে । যাও বা কিছু শালীনতা, শিষ্টতার পর্দা ছিল তা চুকে গেছে এই ইন্টার্নেট হাতে আসার পরে । ভদ্রলোক ;না ভদ্র নয় একে ছোটলোকই বলা ভালো নোংরা রাজনীতি করে অফিসে একটা উচ্চপদ হাসিল করেছে বলে গুজব আছে বাজারে, কথাবার্তা শুনলেই ওর গভীরতাহীন চরিত্রের হদিস পাওয়া যায় । নিজেকে সাংঘাতিক কেউকেটা মনে করে । ইহজগতে যেন কিছুই আর জানার নেই, বোঝার নেই সব জানা হয়ে গেছে, বোঝা হয়ে গেছে ।

মণির বান্ধবী রত্না বলে– লোকটা একটা এ গ্রেডের ছাগল । লোকে পরকিয়া করলে তোর সঙ্গে করবে কেন রে বুড়ো ভাম ? পৃথিবীর তাবৎ যুবকগণ কি মরিয়াছে ?

এই লেখিকারও তো আবার গুরু টুরুর ব্যাপার আছে । সাইটে ছবিও আছে ।

প্রথমে গুরুর মস্তকের ছবি ছিল, সেটা দেখে তো মণি ভেবেছিল ওটা নরেন্দ্র মোদির ছবি । মহিলার কি মতলব কে জানে ! বড় বড় ডায়লগ দেন সম্পাদকীয়তে । উদার কণ্ঠে এক নারীর প্রশংসা করতে নাকি উনি অন্য কোন নারীকে দেখেন নি ! অথচ নিজের বেলায় দেখো -- কি করলেন উনি ? ওখানে মাধবী মৈত্র তো দারুণ লেখেন । কে যেন একবার সেটা ঐ ওয়েবসাইটে গিয়ে বলেছিল, ব্যস্ মাধবীর লেখা ওখানে ছাপা বন্ধ হয়ে গেলো । তবে ? ঈর্ষা কি হয়নি ওঁর ? জ্বালা কি ধরেনি ? অথচ কথা বলতে তো পয়সা লাগেনা তাই না ? মুখে যা বলা যায় তাই কি নিজের জীবনে কেউ করে, মানে ? তাহলে দুনিয়ায় এত ঝামেলা হতই না ।

কেউ যদি বাস্তব জীবনে বলে যে ঐ লেখিকার লেখা সত্যি ভালো তখন সময় দিয়ে পড়া যাবে । ঐ লেখিকাকে মাথায় চড়াবার দরকার নেই । আপাতত: মুলতবি থাক, এখন পঞ্চানন ঘোষালই সই । যদিও বই দুটির প্রচ্ছদ দেখে বড্ড পড়তে ইচ্ছে করে । নাহ্ লেখিকা গ্রাফিক্সটা ভালই

করেন। আসলে মণি তো আর কোন গ্রাফিক্স করনেওয়ালাকে চেনেই না যে দুজনের মধ্যে মোরগ লড়াইয়ের মতন সুপ্ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে রিং-য়ের বাইরে বসে মজা দেখবে আর ভুট্টা খাবে। মণিকে ওর কাকা শিখিয়েছিলেন,

যেথায় দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই,

পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।

নীতিকথা। সবাই জানেন। মণির মনে হয় কেউ কেউ এই সংলাপটি একটু বদল করে নিয়েছেন আজকালকার জমানায় ---

যেথায় দেখিবে রতন, করিও ততক্ষণাৎ পিষ্টন

অমূল্য বলিয়া সমাজ করিবার আগেই বেষ্টন।

এইসব আবোলতাবোল ভাবতে ভাবতেই এসে গেলো পার্ক। বড় বড় দেবদারু আর শিমূলে মোড়া এইসব পার্কে কচিকাঁচা ও অস্তরাগের মানুষেরা হাত ধরাধরি করে খেলা করেন। পাখির গান আর কাঠবেড়ালির দুষ্টুমি দেখতে মণিও মাঝে মাঝে এসে পৌঁছায়। তবে আজ আর হাতে সময় নেই। একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে চায় গন্তব্যস্থলে। কখন আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। উইকএন্ড বলে কথা!

মণি চলেছে, সন্তর্পণে। ফুটপাথে পা মেপে মেপে। এই রাস্তাটা একটু শর্টকাট তাই একটু জংলী জংলী ভাব চারপাশে। কিছু পুরনো বাংলো, কিছু গ্যারেজ। পরিত্যক্ত খেলার মাঠ, আগাছায় ভর্তি। নির্জন পথ, অলস সারমেয়। একটু গা ছমছমে তো বটেই। আজ যেন মেঘলা আকাশের ছায়া পড়ে আরো ভৌতিক লাগছে।

একটি মোটর বাইকে করে দুটি চ্যাংড়া চলে গেলো, রঙীন পোশাক পরা, অদ্ভুত চুলের কাটিং, মণি দেখছিলো দেখে ফ্লাইং কিস ছুড়ে দিলো।

কিছুদূর গিয়ে একটা পাঁচিলের ধারে দেখলো এক ব্যাক্তি মুত্র ত্যাগ করছেন।

মণিকে আসতে দেখে ওর দিকে মুখ করে পুরুষাঙ্গ নাচিয়ে কম্মো সারতে লাগলো।

পোশাক দেখে কিন্তু রীতিমতন ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে।

মণি কোনক্রমে আঁচলে মুখ ঢেকে হাঁটার স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

হঠাৎ ঝমঝমাঝম শুরু হয়ে গেলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই খুব জোরে জোরে বৃষ্টির ফোটা গুলো গায়ে এসে ফুটতে ফুটতে ওকে পুরো কাকভেজা করে দিলো।

মণি ছাতা সঙ্গে এনেছিল কিন্তু ছাতায় এই বৃষ্টি আটকানো যায়না। যায়না

জলের উচ্ছ্বাস থেকে বাঁচানো নিজেকে। তাই পুরো স্নান করে ফেললো।

চকলেট ও চন্দনী রঙের বাটিকের শাড়িতে মণিকে আজ বড় সুন্দর লাগছিলো।

এই শাড়িটা ওর মায়ের ডিজাইন করা। মা ভারি সুন্দর সূচিশিল্পের কাজ করেন। বাঁধনি, বাটিক, সাদা খোলে মধুবনী চিত্র আঁকা ইত্যাদি করে করে পাড়ায় বেশ নাম করে ফেলেছেন। একটা শাড়ি ওর জন্যে করেছিলেন সেটাই ও আজ পরেছে।

মাথায় এলো খোঁপা, তাতে দক্ষিণীদের মতন ফুল গোঁজা। সাদা ও গোলাপী থোকা থোকা ফুল। জল পড়ছে চুল বেয়ে, ফুল বেয়ে কাঁধের ওপর।

এইভাবে ভিজলে নির্ঘাত নিউমনিয়া হয়ে যাবে। তাই ও দৌড়ে সামনের একটা বাংলোর গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। গেটটা খোলাই ছিল।

রঙীন পাগড়ি জড়ানো দরোয়ান কাশতে কাশতে এসে হাজির হল। হাতে একটা লাঠি। অনেকটা দুর্গের প্রহরীর মতন যেমন দেখেছিলো অমিতাভকে, একলভ্য সিনেমায়।

মণি ইশারায় বৃষ্টির দিকে দেখাতেই দরোয়ান ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলে উঠলো- *আপ ব্যালকনি মে উঠিয়ে। ওর উধারই ইন্তেজার কিজিয়ে যব তক রেন বন্ধ না হো জায়ে। আম আপকো বোলতা হ্যায়। যাইয়ে, যাইয়ে, যাইয়ে না, শরমানে কা কোয়ি বাত নেহি।*

সত্যি তো এই আশ্বাস বাণী পাওয়া এই দূর্যোগের দিনে কম ভরসার কথা নয়
।

কাজেই কাল বিলম্ব না করে ব্যালকনিতে উঠে গেলো মণি । সারা শরীর থেকে জল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে । ব্লাউজ ভিজে গেছে, গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে সিল্কের শাড়ি ।

বক্ষবন্ধনী প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে । পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে । জলে ভেসে যাচ্ছে বারান্দা । কোনক্রমে একটা প্লাস্টিকের চেয়ার দেখে টেনে নিয়ে বসতে যাবে এমন সময় পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনে পিলে চমকে গেলো !

কে ? কে ও? কে কথা কয় ?

সেরকমই বাচনভঙ্গী, সেরকমই কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতন কথামালা -- যেই কথামালা কোন লঘুগুরু মানে না । কথাগুলো ডার্ট বোর্ডের দিকে যেন ছুটে আসে বিদ্ধ করতেই । জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে মণি দেখলো বিশাল বেডরুম ।

এক পাশে পালঙ্ক, খানদানি ড্রেসিং টেবিল, বেলজিয়ান আয়না, রাজসিক সোফা, ফুলদানি আর আর---ও কে ? আধো আলো আধো ছায়াতে ঐ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে -মিসেস হরিণী আইয়ার, ওদের কোম্পানির চল্লিশোর্ধ উচ্চজাতেদের তোষনকারী বদরাগী ভাইস প্রেসিডেন্ট, স্বামীর সঙ্গে যথেষ্ট বনিবনা নেই বলে বাজারে যার দূর্নাম আছে ।

স্খলিত বসনা, হরমোন পিলের আধিক্যে ঈষৎ শিথিল দেহবল্লরী, উন্মুক্ত - প্রায় অস্তমিত যৌবন, চালকুমড়োর মতন ঝুলে পড়েছে বক্ষযুগল আর কৃষ্ণচক্ষু মেলে চেয়ে আছে হরিণী আইয়ারের অভিমানী স্তনবৃন্ত, নিচু হয়ে নাভিমূলে একমনে বিলি কাটছে নিচু জাতের কথাসাগর ডি বি । বিড় বিড় করে কি বলছে শোনা যাচ্ছে না এত দূর থেকে । ওর স্পর্শে লাজনম্রা হরিণীর শরীর কম্পমান ।

ওরা অসর্তক, ওরা ভাবতে পারছে না যে কেউ এই দূর্যোগের দিনে এসে যেতে পারে -

হঠাৎ কি খেয়াল হল ডি বি এগিয়ে এলো জানালার দিকে, হয়ত পাল্লাগুলো বন্ধ করতেই । মণিদীপা ঝট করে সরে গেলো পাশে । তারপর ভেসে গেল এক অনাহুত জোয়ারে । ঝড়ের পরে আকাশভাঙা বৃষ্টির ঢেউ থেকে বাঁচতে আশ্রয় খুঁজেছিল এই অট্টালিকায় যখন, তখনও জানতো না ঝড়

এখনো থামেনি, ঝড় শুরু হল মাত্র। মনের আকাশে, হৃদয়ের বাতাসে, চেতনা ছাড়িয়ে যেই ঝড়ের আনগোনা আরম্ভ হল তার পূর্বাভাস কেউ তো ওকে দেয় নি!

যখন ঝড় ওঠে এইভাবেই ওঠে, পাতারা লাজে নয় স্রেফ ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে নিরন্তর।

যতই কালো হোক

অরণি এক আশ্চর্য ছেলে। কালোদের সে ঘেন্না করে। বন্ধুরা ওকে রেসিস্ট বলে বিদ্রুপ করে কিন্তু তাতে ওর বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। কালো লোকেদের হাতে জলপান পর্যন্ত ওর পক্ষে অসম্ভব। ওর মায়ের গায়ের রং শ্যামলার দিকে বলে সে মায়ের চেয়ে বাবাকেই বেশি ভালবাসে।

লোকে আড়ালে ওকে ক্ষ্যাপাটে বলে। ওর বংশে অবশ্য এর আগেও এই জিনিস দেখা গেছে। ওর ঠাকুমাই এই ধরণের মানুষ ছিলেন। কালোদের শুধু ঘেন্নাই নয় মুখের ওপরে গালাগালি দিতেও ছাড়তেন না। সে যুগে হয়ত এগুলো অনেকেই করতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল কটা বাঙালি মেয়ে সেই অর্থে ফর্সা হয়?

ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে অরণি একটা ভালো চাকরি পেয়েছে। একটি বহুজাতিক সংস্থায় সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে। আপাতত: সে পুণাতে আছে। বাঙালি ঘরকুনো, সকলে জানে। অরণিও পুণায় একাকিত্বে ভোগে। অনেক বন্ধুবান্ধব থাকলেও কিসের যেন একটা অভাব মনে হয় সবসময়। সেই অভাব অনেকটাই কাটলো চ্যাটের দৌলতে। অবসর সময় সে চ্যাট করে। ইয়াহু, এম এস এন, বাংলা চ্যাট, জিমেল কিছুই বাদ যায়না। এখন তার কত বন্ধু! পুণায় বসেই সে অস্ট্রিয়ার হেঁশেলের ঘ্রাণ নিতে পারে, আমেরিকার ড্রয়িং রুমের কথা ভেসে আসে। এই ইন্টারনেট এক চমৎকার। কোন দু:খ হলে বসে যাও অনলাইন, মনের কথা খুলে বল অদেখা বন্ধুকে। যন্ত্রণা লাঘব হবে অথচ চেনা পরিচিত কেউ জানবেও না। অরণি খুব উপভোগ করে এইসব চ্যাট লাইন। বিভিন্ন দেশের মানুষ ছাড়াও যেই বন্ধুটির সঙ্গে চ্যাট করে সব থেকে বেশি আনন্দ পায় সে আর কেউ নয়, রাকা। মুম্বাইবাসিনি। সেও সফটওয়্যারে কাজ করে। আগে অরণি প্রায়ই কলকাতায় যেত। এখন

বছরে একবার যায়। চ্যাটের সুবাদে হোমসিকনেস অনেকটাই কেটে গেছে। রোজ সন্ধ্যায়, কাজের পরে অরণি চ্যাট লাইনে আসে। আর সেতো ঐদিকে থাকবেই। জানা কথা। তারপরে শুরু হয় মধুর আলাপন। রাকা তাকে মুগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। কম্পিউটারের স্ক্রীন থেকে ভেসে আসে ফুলের সৌরভ, এক অদ্ভুত আবেশে ডুব দেয় মন। রাকাও অরণির সঙ্গ, বলা ভালো ইলেকট্রনিক সঙ্গ বেশ উপভোগ করে। আস্তে আস্তে ওদের সম্পর্কটা ভালোবাসায় পরিণত হয়। দুজনে দুজনের ছবি দেখেছে, ফোনেও কথা হয়। রাকার চেহারার প্রতি বিশেষ কোন ছুৎমার্গ নেই তবে অরণিকে বেশ দেখতে। স্মার্ট চেহারা। অরণিও রাকাকে দেখেছে। খুব মিষ্টি চেহারা। টানা টানা দুই চোখ। গায়ের রংও বেশ ফর্সা। আর ওর গলার স্বরটিও বেশ মিঠে। এখন শুধু সামনাসামনি দেখার অপেক্ষা।

পুণা থেকে মুম্বাই আজকাল হাইওয়ে দিয়েই যেতে বেশি ভালোলাগে। সুন্দর রাস্তা। মাখনের মতন মসৃণ। দুপাশের প্রাকৃতিক শোভাও মনোমুগ্ধকর। বর্ষাকালে অপরূপ। পাথুরে পাহাড়ে তিরতিরে ঝর্ণা, চারিদিকে সবুজের ছোঁয়া। খুব মনোরম যাত্রাপথ। অরণি এক স্বর্ণালী ভোরে মুম্বাই অভিমুখে যাত্রা করে। রাকার সঙ্গে কথা হয়ে আছে। ওরা একটি বিশেষ জায়গায় মিট করবে। তারপরে কথাবার্তা গল্পগুজব করে দুপুরে একসঙ্গে খেয়ে নেবে।

মুম্বাই পৌঁছতে একটু দেরী হয়ে গেল। বাসস্ট্যান্ড থেকে রাকার ওখানে যেতে সময় লাগলো প্রায় আধঘন্টা। ট্রাফিক জ্যাম ছিল। যাইহোক দূর থেকে দেখতে পেল একটি মেয়ে হাত নাড়ছে। আগেই বলা ছিল কি রঙের শার্ট পরবে। কি রঙের ট্রাউজার। সব ঠিক করাই ছিল তাই হয়ত চিনতে অসুবিধে হয়নি। রাকা হাত নাড়ছে। অরণি এক পা এক পা করে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ! সেই চোখ সেই মুখই তো বটে ! কিন্তু একি? কি দেখছে সে ? গায়ের রঙ এতো কালো ? একে টেনেটুনে উজ্জ্বল শ্যামও তো বলা চলে না ! তবে যে ছবিতে দেখেছিল টুকটুকে একটি মেয়ে ? মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হল সে।

দূর থেকে রাকা হাত নেড়েই যাচ্ছে । অরণি ভদ্রতার খাতিরে একবার হাসলো, তারপর এগিয়ে গেল রাকার দিকে । রঙ রহস্যের সমাধান করতেই হচ্ছে !

- বাব্বা আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছিলে না ! রাকা অনুযোগের সুরে বলে ওঠে ।
- না মানে ঠিক চিনতে পরিনি ।
- কেন?
- তোমাকে ছবিতে অনেক ফর্সা লাগছিল । অরণি বলেই ফেলে ।
- ওহ ! এই ব্যাপার ? আরে আমি তো অ্যাডোবি ফটোশপে একটা স্পেশাল এফেক্ট দিয়ে ছবিটাকে ফর্সা করে দিয়েছিলাম । জানো তো ? ইমেজ এডিটিং সফটওয়্যার পাওয়া যায় বাজারে। তোমার সঙ্গে একটু মজা করছিলাম । যদিও জানি গায়ের রঙ আমাদের মধ্যে কোন বাধাই নয়!

শেষের লাইন কটাই শুধু অরণির কানেরও ভেতর দিয়া মরমে পশিল---- *গায়ের রঙ কোন বাধাই নয় !* প্রচন্ড রেগে যায় সে মনে মনে । কে বলেছে ওকে ? ও কি জানে কালোদের আমি কতটা ঘেন্না করি ! আমাকে ও ঠকালো কেন ? কেন ? কেন বললো না যে সে এত কালো? মাথার ভেতরে যেন আগুন জ্বলছে । সারা গায়ে একটা জ্বালা । ইচ্ছা করছে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে। শেষমেষ একরাশ বিরক্তিতে অরণি বলেই ফেলে- আমাকে তুমি ঠকিয়েছো রাকা । তুমি যে ডার্ক আমাকে আগে বলনি কেন ? জানো আমি কালোদের কতটা ঘেন্না করি ? আই হেট ডার্ক স্কিন । তোমার বলা উচিৎ ছিল যে তুমি ফর্সা নও । তুমি অচল সেটা জেনেই ইন্টারনেটে ফাঁদ পেতেছিলে তাইনা ? তুমি ঠগ রাকা, তুমি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছো ।

রাকা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অরণির দিকে । ওর বিরুদ্ধে একসঙ্গে এতগুলো অভিযোগ শুনে সে দিশেহারা । ঠগ, বিশ্বাসভঙ্গ করেছো - কথাগুলো যেন অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে । শুন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে । সে তো কিছু ভেবে এটা করেনি । কেবল একটু মজা করেছে । আর তার চেয়েও বড় কথা অরণি যে এরকম রং এর প্রতি দূর্বল তা

জানলে সে তো আগেই ওকে এটা বলে দিতো যে সে ফর্সা নয়, কালো, বেশ কালো । অরণি শুধু গায়ের রঙটাই দেখলো? মনের রঙের কি কোনই মূল্য নেই তার কাছে ? আর রাকা তো কুশ্রী নয় ! তার চোখমুখ ভীষণ সুন্দর । সবাই বলে । শুধু রঙ কালো বলে এই অবহেলা ? বিষন্ন রাকা ধপ্ করে বসে পড়ে একটা বেঞ্চে।

এক মূহুর্ত অপেক্ষা না করে গটগট করে অরণি ফিরে যাচ্ছে, দূরত্ব বাড়ছে । আস্তে আস্তে সে মিলিয়ে গেল মানুষের ভীড়ে, রাকা একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার চলার পথে । তার স্বপ্ন, তার ভালোবাসা এক নিমেষে হারিয়ে গেল । তার সমস্ত আশা, আকাঙ্খা একটু আলোর অভাবে ডুবে গেল অন্ধকারে । হতাশায় রাকা মাথা নিচু করে বসে রইলো। অরণির কথাগুলোয় সে যত না অপমানিত বোধ করছে তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হয়েছে । এই ২০০৫ সালেও একজন আধুনিক মানুষ যাকে সমাজের ক্রীম বলা যায় সে এরকম বর্ণবিদ্বেষী হতে পারে? মানবসভ্যতা কি এগোচ্ছে না পেছনের দিকে যাচ্ছে ? মন বলে কি কিছুই নেই ? মনের রঙে কি রাঙানো যায়না হৃদয় ? রাকা ভীষণ আহত হয়েছে । অরণির সঙ্গে দেখা নাহলে জীবনের এই দিকটা তার চিরদিন অদেখাই থেকে যেত ।

আজকাল আর চ্যাটে আসেনা রাকা । অবশ্য আসলেই বা কি ! অরণি কি আর যাবে ওর সঙ্গে চ্যাট করতে ? ও এখন চ্যাট লাইনে অন্য স্বপ্নের সন্ধান করে চলে । তবে এবারে আর ঠকার বান্দা ও নয় । আগে থেকেই সব খোলাখুলি বলে নেবে । একটা কালো মেয়ে, কি সাহস ! ভাবলো কি করে যে অরণির মতন ছেলে এরকম একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ? সে সমাজে মুখ দেখাবে কি করে ? কালো বৌ ! জোর বাঁচা বেঁচে গেছে এই যাত্রায় । মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় । এই একটি জায়গায় সে কালো ফর্সা মানেনা । সে মা কালীর ভক্ত । কালীপূজার দিন রীতিমতন সকাল থেকে উপোস করে গভীর রাতে পুজোয় বসে । ভক্তিভরে পুজো করে । জগৎ জননী কালো হতেই পারেন । কিন্তু বৌ ! কভি নেহী ।

অরণির প্রথম বিদেশ সফর । স্বভাবতই খুব উত্তেজিত সে । মুম্বাই হয়ে পাড়ি জমাবে সুদূর হল্যান্ড । টিউলিপের দেশ । ইউরোপের সব প্রথম সারির দেশগুলো ঘুরে দেখবে । দেখবে মানবসভ্যতা কত এগিয়ে গেছে ।

আবার ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা ভেনিস, রোম, বার্লিন, প্যারিস সবই দেখবে। একরাশ ভালোলাগা নিয়ে সে হাজির হল মুম্বাই এয়ারপোর্টে।

ফ্লাইটের অনেক দেরী। এক কাপ কফি নিয়ে অপেক্ষমান। হঠাৎ একটি ছেলে তার দিকে একটি ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে বললো- প্লিজ হেল্প মি, ক্যান ইউ টেক কেয়ার অফ মাই ব্যাগ ? আই ওয়ান্ট তো গো টু দা টয়লেট। প্লিজ !

অরণি কোন বাক্যব্যয় না করে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে নিল। ছেলেটি চলে গেল।

এদিকে ফ্লাইটের সময় হয়ে গেছে। ছেলেটি সেই যে টয়লেটে গেছে ফেরার নাম নেই। কি হল ভেবেই পাচ্ছেনা অরণি। কি করবে ? সিকিউরিটি চেক অ্যানাউন্স হয়ে গেছে। ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট, অনেক ঝামেলা। ব্যাগটা কি এয়ারপোর্ট স্টাফের হাতে জমা দেবে ? ভাবতে ভাবতেই দুজন পুলিশ এসে হাজির -- আপনার এই ব্যাগে কি আছে?

- তা তো জানিনা।
- জানেন না মানে ? চলুন আপনার ব্যাগ চেকিং হবে।

চেকিং হবে শুনেই অরণি ঘাবড়ে গেল। কি ফ্যাসাদে পড়া গেল রে বাবা, কার না কার ব্যাগ।

- শুনুন এটা আমার ব্যাগ নয়, প্লিজ শুনুন আমার কথা ! ততক্ষণে অরণিকে টেনে নিয়ে পুলিশ চলেছে এয়ারপোর্ট এর অন্যদিকে। কোন কথাই কানে তুলছে না।
- যা বলার বড় কর্তাদের বলবেন। এখন চুপচাপ চলুন।

পুলিশ যখন ধরেছে তখন তো যেতেই হবে। কথায় বলে বাঘে ছুলে আঠারো ঘা আর পুলিশ !

পুলিশের পেছন পেছন যাওয়ার পরে ব্যাগ সার্চ করে হার্ড ড্রাগ্স পাওয়া গেল।

চূড়ান্ত অপমানিত হতে হল তাকে । এমন কি লক আপে নিয়ে যাবার কথাও কানে এলো । যতই সে বলে যে এই ব্যাগ তার নয় কিন্তু প্রমাণ হবে কি করে ? একজন অফিসারে তো বলেই দিলেন যে একজন অচেনা লোক ব্যাগ দিয়ে গেল আর আপনি নিয়ে নিলেন ? এই ম্যাচিওরিটি নিয়ে বিদেশ যাচ্ছেন ? কি বলবে ভেবে পায়না অরণি । একবার ভাবলো সহকর্মী দীপককে কল করে৷ কিন্তু সে তো পুণেতে ! মাথা নিচু করে বসে থাকে । কতক্ষণ ছিল জানেনা । শুধু জানে হল্যান্ড যাওয়া আপাতত আর হলনা । আর একবার গায়ে কাদার ছিটে লেগে গেলে কোনদিন যেতেও পারবে কিনা সন্দেহ, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সে, হাই প্রোফাইল কানেকশন তো নেই মোটেই । তাতে হয়ত কিছু সুবিধে হলেও হয় । এদিকে রাত বেড়ে গেছে, ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে । মাথামুন্ডু কিছুই ভেবে পাচ্ছেনা । কি কুক্ষণে যে ব্যাগটা নিতে গেল ! ভালমানুষী না দেখালেই হত । এইসব আকাশ পাতাল ভাবছে এমন সময় একজন অফিসার এসে বললেন যে স্বয়ং মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার ফোনে বলেছেন অরণিকে তার ওখানে নিয়ে যেতে । অরণি অবাক হয় ।

ভাবে ব্যাপারটা বেশ জটিলতার দিকেই যাচ্ছে । পুলিশ ভ্যানে তুলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কমিশনারের অফিসে । কিন্তু ভ্যাগের অদ্ভুত পরিহাস ! একদিন যাকে চূড়ান্ত অপমান করেছিল সেই রাকাকে দেখলো কমিশনারের ঘরে বসে থাকতে ! রাকা এখানে ?

রাকার বাবা পুলিশ অফিসার এটা সে জানতো । যদিও কোথায় কাজ করেন বা কি পদমর্যাদা সেটা জানা ছিলনা । অবশ্য থাকলেই বা কি ? রাকা তো তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে ।

ইতিমধ্যে কমিশনার এসে উপস্থিত । পরিষ্কার বাংলায় বললেন,

- অরণিবাবু কে আপনাকে ব্যাগটা দিয়েছিল ?
- একজন কম বয়সী ছেলে ।
- কেমন চেহারা মনে আছে ?
- ঠিক মনে নেই তবে মাথায় অল্প টাক ছিল আর পরণে জিন্স ও সাদা টি শার্ট ।

- আপনি ব্যাগটা নিলেন কেন?
- উনি বললেন যে উনি একটু টয়লেটে যাবেন তাই।
- আমি যদি বলি ওখানে বিষ আছে, এনে আমার চায়ে ঢেলে দিন, দেবেন ?
- না না সে কি কথা ! তাই আবার হয় নাকি ?
- তাহলে আপনি ব্যাগটা নিলেন কি মনে করে ? ওর ভেতরে কি বিষ আছে দেখতেই তো পেলেন। আপনারা শিক্ষিত ছেলেরা যদি এগুলো না বোঝেন, সচেতন না হন তাহলে কি করে চলবে। খবরের কাগজে কি খালি খেলার পাতা পড়েন ?

অরণি চুপ করে থাকে। কমিশনার বলেই চলেছেন ---

---আমার মেয়ে রাকা নিজে চোখে না দেখলে আপনাকে তো বাঁচানো মুস্কিল হয়ে যেতো। ভাগ্যিস ও সেই সময় ওখানে ছিল। ওর তো বাইরে যাবার কথা ছিল। আপনাকে ও ওখানেই দেখে এবং সেই ব্যাক্তিকে যে আপনার হাতে এই ব্যাগিটি গছিয়ে দিয়ে পালায়। গোলমালের পরে ও আমাকে ফোন করে। এবার থেকে একটু কেয়ারফুল হবার চেষ্টা করুন। আমাদের ডিপার্টমেন্ট ঐ লোকটির সন্ধান করছে,না পাওয়া অবধি আপনি বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না। মুম্বাই ছেড়েও যেতে পারবেন না।

অরণি খুব অবাক হল, রাকা ওখানে ছিল? কৈ ওর তো চোখে পড়েনি? যখন ঐ ব্যাক্তি ওকে ব্যাগটা দেয় আশেপাশে তো কাউকে দেখেনি ! তবে রাকা কি করে এলো? মনে নানান প্রশ্ন ভীড় করে। তবে কি কমিশনার সাহেবের মেয়ে রাকা ওকে চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল ? যাকে ও একদিন ছোট করেছিল, গালাগালি দিয়েছিল,অরণি কি স্বপ্ন দেখছে ? আজকালকার দিনেও এরকম মানুষ আছে ?

লজ্জায় কুঁকড়ে গেল সে। একটা বেদনার আস্তরনে ঢেকে গেছে মন। আত্মগ্লানিতে, বিবেকের দংশনে ভারাক্রান্ত, নিজেই নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দিচ্ছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। রাকা একটু দূরে

বসেই একটি ম্যাগজিনের পাতা উল্টাচ্ছে। ও কি পড়ছে নাকি নিজেকে আড়াল করে রেখেছে ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে দ্বিধাহীন অরণি তাদের মাঝের আড়ালটুকু নিজে হাতে সরাবার সংকল্প নেয়। জীবনকে সে বুঝতে শিখেছে এই মেয়েটির জন্যেই। বুঝেছে, নিকষ কালো মোমরাতেই চাঁদ ওঠে। চাঁদের মধুরিমাতেই তো মনের মাঝে সুন্দর পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে ভালোবাসার পুষ্পদল। সেই ফুল অনেকেই দেখে কিন্তু ফুলের ফোটা কজন দেখতে পায় ? অরণি সেই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে একজন। তাই সময় নষ্ট না করে সে এগিয়ে যায় অবিনশ্বর রাকার দিকে।

বৃষ্টিদিনে

১

অর্দ্র প্রভাত, নাকি তরলদিন ? সকাল থেকেই অঝোর ধারায় ঝরছে । বাড়িতে থাকলে মন্দ লাগতো না, খিচুড়ি, ডিমভাজা, ভোলানাথ বাজারে গেলে ইলিশও জুটবে তারপরে কোন মনের মতন বাংলা সিনেমা চালিয়ে সুন্দর দিন কেটে যাবে । কিন্তু তাকে আপিস যেতেই হবে । বড়সাহেব এসেছেন চেন্নাই থেকে । কাজেই ভূমিকম্প হলেও আজ তাকে যেতেই হবে ।

রাস্তায় জল জমে আছে । এই জমা জল দেখলে জয়ের মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা । ওদের উত্তর কলকাতার বাড়ির সামনে জল জমে গেলে ওরা বাচ্চারা মিলে কাগজের নৌকো বানিয়ে জলে ভাসাতো । সোনার শৈশব, হারানো শৈশব । স্মৃতির মণিকোঠায় যতনে তোলা আছে।

পুরো নাম জেসন উইলিয়ামস্ । ডাকনাম জয় ।

আপিস পৌঁছতেই বেলা এগারোটা বেজে গেল । রাস্তায় অসম্ভব জ্যাম । অনেক জায়গায় জল জমে আছে । গাড়ি চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে । পাশের টেবিলের সৌগত রসিকতা করে বলেই ফেললো -- অকৃতদার বড়সাহেব কি করে বুঝবে বৃষ্টিদিনের মজা, বৌকে জড়িয়ে শুয়ে থাকার দিন, খুনসুটি করা -- শালা ! একি অফিসে আসার সময় ?

জয় হেসে সায় দিল । যদিও সে এখনো অবিবাহিত । তবে প্রেমরস সুধা পান করানোর জন্যে যে মেঘলা দিনের জুড়ি নেই সেইটুকু না বোঝার মতন বেরসিক সে নয় ।

২

সারাটা দিন কেটে গেল মিটিং করেই । বিকেলে ঘরে ফেরার সময় বাসের জন্যে অপেক্ষা না করে আজ সে একটা ট্যাক্সি নিল । ভবানীপুর চত্বরে ওর অফিস । ফোনে হুকুম দিয়ে রেখেছে মা কে, আজ ভুনিখিচুড়ি বানাতে হবে । সঙ্গে ঝুরি ঝুরি আলু ভাজা, ডিমভাজা আর পেঁপের চাটনি । খাসা ব্যাবস্থা । এখন বাড়ি অবধি পৌঁছলেই হয় । মনে মনে একটা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললো সে ।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে । রাস্তায় মানুষজন বেশ কম । বাসগুলোও খালি খালি। রিক্সা স্ট্যান্ড খালি । কোথাও কোথাও বেশ জল । গাড়ি ছুটে চলেছে শহরের মধ্যে দিয়ে । ও যাবে নাকতলায় । টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশানের কাছে আসতেই হঠাৎ একটা গোলমাল কানে এলো----বৃষ্টি থেমে গেছে । ট্যাক্সির জানালা আধখোলা । ঠান্ডা বাতাস আসছে । সেই বাতাসেই ভেসে এলো চীৎকার --ধর, ধর । মালটা মেরে পালাচ্ছে । শালাকে ধর । জয় মুখটা বাড়িয়ে দেখলো একটি মেয়ে, মেয়েই মনে হল রাস্তায় জল কাদায় পড়ে আছে, শরীরটা কুঁকড়ে গেছে, আর কতগুলো লোক একটা ম্যাটাডোরের পেছনে ছুটছে । জয়ের ট্যাক্সি এগিয়ে চলেছে । ও ড্রাইভারকে থামতে বললো ।

- সিংজি গাড়ি রোকিয়ে । মেয়েটিকে হাসপাতালে নিতে হবে ।

- বাবু কেয়া পাগল হো গেয়ে হো ? পোলিস কে চক্কোর মে ফাঁস যাওগে ।

জয় খুব বিরক্ত হয়ে রাগত স্বরে বলে উঠলো– তুমি গাড়ি থামাবে ? থামাও বলছি ।

- নেহি সাব, মাত্ রোকিয়ে, জেনানা হ্যায়, জখমি হ্যায়, পোলিস ফাসা দেঙ্গে ।

জয় জোর করে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে যেতে উদ্যত হল । তখন সিংজি গাড়ি সাইড করে রাখলো। আহা রে ! মেয়েটির অনেক ব্লিডিং হচ্ছে । এক্ষুনি হাসপাতালে না নিলে বিপদ। সিংজিও এসে দাঁড়িয়েছে পাশে । দুজনে মিলে ধরাধরি করে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে চললো বাঙ্গুর হাসপাতালের দিকে । ওটাই নিয়ারেস্ট ।

রাস্তার লোকগুলো মেয়েটিকে তুললো না, বেঁচে আছে কিনা দেখলো না উল্টে ম্যাটাডোর ওয়ালাকে ধরতে ছুটলো । বিস্মিত জয় এর কোন যুক্তি খুঁজে পেলনা । আরে ধরলেই নাকি পুলিশ কেস হবে। তা হোক, তাই বলে একজন মরনাপন্ন রুগিকে বাঁচাবে না, সাহায্য করবে না ? অথচ পলাতক ড্রাইভার এর বিচার করার বেলায় কোন খামতি নেই । সেসব দিব্যি হচ্ছে । কিল চড় ঘুঁষি, লাথি সম্ভব হলে গণধোলাইয়ে পরপাড়ের টিকিট ধরিয়ে দেওয়া । অদ্ভুত লাগলো জয়ের । আজব সমাজে বেঁচে আছি আমরা । বেঁচে আছি তো ? নাকি কেবল শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছি ?

৩

বাড়িতে মাকে কল করে জানিয়ে দিয়েছে । ফিরতে রাত হবে । মাও খুব অবাক হলেন-- সত্যি মেয়েটির এমন বিপদে কেউ এগিয়ে এলো না ? আজকাল বিপদে পড়লেও কোন সাহায্য পাবার উপায় নেই । বিপদে পড় আর মরো ।

মেয়েটির বাড়িতে ফোন করা হয়েছে । ওর মা ছাড়া কেউ নেই । বয়স্ক মানুষ । পাড়ার কিছু ছেলে আসছে । এদিকে পুলিশ তো জেরা শুরু করেছে জয়কে । আপনার কে হয়, কোথায় পেলেন, কেন নিয়ে এলেন কেউ তো আনেনা ---- এনে যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে তার কোন উল্লেখ কিন্তু ইন্সপেক্টার একবারো করলো না । তবে সিংজি আগেই

বলেছিল ঝামেলা হবে কাজেই জয় চুপ করেই বসে রইলো । কোন অনুযোগ নেই তার।

মেয়েটিকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে । বাহাত্তর ঘন্টা না কাটলে কিছু বলা যাচ্ছেনা । আপাতত জয় পুলিশ স্টেশানে বসে ভাবছে যে দিনটা সে কিভাবে শুরু করেছিল আর কিভাবে শেষ হতে চলেছে । জীবনের পথের বাঁকে কোথায় যে কি আছে কেউ জানেনা । তবুও কেমন তরতর করে আমরা এগিয়ে যাই অনাঘ্রাত ভবিষ্যতের দিকে । ক্ষয় হতে পারে জেনেও।

৪

পুলিশের ঝামেলা চুকতে পরদিন ভোর হয়ে গেল । বাড়ি ফিরে স্নান সেরে মা কে বললো– মা এক কাপ চা করো। মা,ছেলের রাত করে বাড়ি ফেরা পছন্দ করেন না । কারণ একবার গভীর রাতে বাড়ি ফেরার সময় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে তার বাবা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছেন । তারপরে স্কুল পড়ুয়া জয়কে অনেক কষ্টে একা হাতে তার মা মানুষ করেন । টাকা পয়সার টানাটানি ছিলনা । বাবা মোটামুটি সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন । অর্থ নিয়ে ভাবনা ছিল না । কিন্তু একাকিনি মহিলার পক্ষে একটি বাচ্চাকে মানুষ করা যে সহজ নয় সেটা ওর মা ডেলাইনা ভালই বুঝেছিলেন । তাই জয়ের ওপরে কড়া হুকুম ছিল যে যেখানেই যাও, যাই করো সন্ধ্যার মধ্যে ঘরে ঢুকে পড়ো । কিন্তু সেই মা আজ বেশ খুশি বলেই মনে হল । তাঁর ছেলে একটি মহৎ কাজ করেছে বলে বেশ গর্বিত । মেয়েটির নাম ধাম জিজ্ঞেস করলেন । নাম ঋতু । ধাম কোন মফঃস্বলে । তবে মেয়েটি কলকাতায় একটি ঘর ভাড়া করে থাকে । এখানে চাকরি করে । ওর মা এখন কলকাতায় রয়েছেন । মা ও মেয়ে এই নিয়ে ওদের সংসার ।

সব শুনেটুনে ডেলাইনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন --- ভবিতব্য, সবই ভবিতব্য । বলে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন ।

৫

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। জয় নিয়মিত মেয়েটির খবর নেয়। এখন ও বেশ সুস্থ। খবরের কাগজে জয়ের ছবি বেরিয়েছে। সবাই একবাক্য স্বীকার করছে যে সে একজন মহামানব। আপিসে জয়ের খুব নাম হয়েছে। এইরকম কেসে সে আগ বাড়িয়ে এত উপকার করেছে এতো ভাবা যায়না। কে করে ? এই নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক চলছে। দুলালবাবু যিনি কয়েকদিনের ভেতরেই রিটায়ার করবেন উনি তো একবারে খুশীতে ঝলমল করছেন। খবরের কাগজের কাটিং নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন -- আমার অফিস কলিগ, খুব ভালো করে চিনি ওকে। ভীষণ ভালো ছেলে। এরকমটি আর পাবেন না, জুড়ি মেলা ভার।

দুলালবাবুর মনেই থাকছে না যে তার পারচেজ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি গোলমাল লাগে জয়ের, সময় মতন কাজ হয়না, নানান ঝামেলা পোয়াতে হয় জয়কে সেইজন্যে। কিংবা তুষার কাঞ্জিলাল। যে ছেলেটি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ায় বলে প্রায়ই জয়ের বাক্যবাণের শিকার হয় ও মনে মনে জয়দার ওপরে বিরক্ত, সেটা প্রকাশ করেও ফেলেছে সহকর্মীদের কাছে সেও এখন দরাজ গলায় জয়ের প্রশংসা করছে আর এখন কাজেও ফাঁকি দিচ্ছে না বরং নিজে যেচে কাজ নিয়ে যাচ্ছে।

একটা ঘটনা সবকিছুকে কেমন বদলে দিয়েছে। নতুন করে সে আলোর সামনে এসে পড়েছে। তার জীবনতরী কেমন পালতোলা নৌকোর মতন ভেসে চলেছে, চারিপাশে মুগ্ধতা, বীরত্বের পূজা। ফড়িং এর লাফালাফি, ছাগশিশুর ছুটোছুটি সব কিছু থেকেই যেন মধু ঝরছে। এক অবর্ণনীয় সময়ের হাত ধরে এগোচ্ছে জয়। তবে ও খুব সন্তর্পণে পা ফেলছে।

৬

ঋতু এখন একদম ফিট। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে। জয় প্রায়ই যায় ওর বাসায়।

ঋতুর বাড়ি আজ খেতে ডেকেছ। একাই যাবে। যদিও মায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। ঋতুর মাও ভারি ভালোমানুষ। জয়কে খুব স্নেহ করেন বলেই

মনে হয় । কিছু দিন পরেই উনি ওদের নিজের বাড়ি ফিরে যাবেন । আধাশহর, পদ্মডাঙা । কি সুন্দর নাম, শুনলেই মনে হয় ছুটে চলে যাই ।

ওদের বাড়ি পৌঁছে দেখে এলাহি আয়োজন । মাছ, মাংস, পোলাউ – এমন কি মাসিমণি নিজহাতে রসগোল্লার পায়েসও বানিয়েছেন ।

জয় কপট রাগ দেখায়– এত কিছু কেন করতে গেলেন ? এত কেউ খেতে পারে ?

--আহা তোমার যেটা খুশি খাও না বাবা । জানো তো ঋতুর বাবা বাড়িতে লোক এলে খুউব খাওয়াতে ভালবাসতেন । আমি বেশি আইটেম না করলে খুব রাগ করতেন ।

এরপর আর কি বলা চলে । জয় মুখ বুজে খেতে বসে । খাবারের স্বাদও ভারি চমৎকার ।

জীবন নিজের খাতে বয়ে চলে । আপিস থেকে ফেরার সময় আজকাল ঋতুর সঙ্গেই ফেরে । দুজনের আপিসই ভবানীপুর চত্বরে। বেশ জমেছে দুটিতে । ছোটবেলা থেকেই একজন নিকটজনের সন্ধানে ছিল সে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মনের মানুষের দেখা পায়নি । ঋতুর আগমনে যেন তার সমস্ত সত্ত্বায় মধুঋতুর ছোঁয়া লেগেছে । এই শীতেও বসন্তের রং রূপ প্রজাপতির মতন পাখনা মেলেছে । জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত জয় ভীষণভাবে উপভোগ করছে । মায়ের মন কেবল একটু খুঁতখুঁত করছে কারণ ঋতু জয়ের চেয়ে তিন বছরের বড় । জয় অবশ্য ঋতুর সঙ্গে খুবই স্বচ্ছন্দ ।

ইতিমধ্যে মাসিমণি পদ্মডাঙায় চলে গেছেন । যাবার আগে জয়কে সেখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছেন । বাগানের সবজি, লাউশাক, কচি পুঁইডাঁটা খাওয়াবেন । বকফুল ভাজা,পুকুরের মাছ খাওয়াবেন । কাছেই গঙ্গা। ইলিশ খাওয়াবেন। আরো কত কি । নিজের একমাত্র মেয়ের প্রাণরক্ষককে উনি ছেলের মতনই ভালোবেসে ফেলেছেন । জয় আর ঋতুও স্থির করেছে একদিন যাবে । মাকে নিয়েই যাবে । মায়েরও আলাপ হয়ে যাবে মাসিমণির সঙ্গে ।

৭

নির্দিষ্ট দিনে ওরা লোকাল ট্রেনে চেপে রওনা দেয় । পদ্মডাঙা পৌছে রিক্সা করে যেতে হয় । তা ছয় সাত কিলোমিটার হবে । বাড়ির সামনে পৌছতেই দেখলো সামনের পরিচ্ছন্ন বাগানটায় অনেক গোলাপ গাছ । এখন শীতকাল তাই ফুল ধরেছে । ভারি মনোরম ।

- কে এত গোলাপের চাষ করেছে ঋতু ? ডেলাইনা প্রশ্ন করেন ।

- মা করেছেন, আসলে বাবা খুব গোলাপ ভালোবাসতেন ।

- তোমার বাবাকে তোমরা খুব মিস করো তাইনা ?

- হ্যাঁ, মৃদু হেসে বলে ঋতু । আসলে আমি যখন খুব ছোট তখনই বাবা চলে যান। বাবাকে সেরকম মনেও পড়েনা । বলতে বলতে বৈঠকখানার ঘরে এসে প্রবেশ করে ওরা । ছিমছাম সাজানো । সারা ঘরে একটা রুচির ছাপ । একটা মাধবীলতা রয়েছে কোণায়, ভীষণ সতেজ ।

- বসুন আপনারা । ঋতু ভেতরে চলে গেল ।

একটু পরে একজন চাকর চা আর কুমড়োফুল ভাজা নিয়ে এলো । বললো -- মা চানে গেছেন, আসছেন, আপনার খান । সবে জয় একটা কামড় দিয়েছে বড়ায় এমন সময় মাসিমণি ঘরে এসে প্রবেশ করলেন । সাদা কাপড়, সোনালি চওড়া পাড় । কি স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে তাকে ।

এমন সময় ঋতু বলে উঠলো -- আমার বাবার ছবি দেখবে ? বলে ঘরের অন্যপাশে একটা ভারি পর্দা সরাতেই বেরিয়ে পড়লো এক সুপুরুষের ছবি। নীচে লেখা -- ঘনশ্যাম মুখার্জি ।

-- কে ? চমকে উঠলেন ডেলাইনা, জয়ের মা । জয় এরও চোখের পলক পড়ছে না।

ঘনশ্যাম মুখার্জি ? ঋতু, ঘনশ্যাম মুখার্জির মেয়ে ? কৈ আগে তো বলেনি । অবশ্য আগে এই নিয়ে আলোচনাও হয়নি । বাবার কথা উঠলে ঋতু এড়িয়ে গেছে । জয় ভেবেছে যে তার বাবাকে হয়ত সে খুবই ভালোবাসতো

তাই হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে না। তাই সেও কথা বাড়ায়নি। কিন্তু এতো অকল্পনীয়, চিন্তারও অতীত। কি অদ্ভুত পরিহাস ভাগ্যের। কি বেদনাদায়ক ক্ষণ।

ডেলাইনা অস্থির পদচারনায় এগিয়ে গেলেন ছবিটির দিকে। চঞ্চল, ত্রস্ত, ছন্দহীনা।

জয় লক্ষ্য করলো যে মাসিমণিও একভাবে দেখছেন মাকে। এক পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই নারীর দ্বন্দ, লড়াই বহুযুগের ওপার হতে দুজনের চোখমুখে ছড়িয়ে গেছে। দুজনেই বাকশক্তি হীনা, স্মৃতির অতলে ডুব দিয়েছেন।

৮

ঘনশ্যাম মুখার্জির প্রথম পক্ষের স্ত্রী হলেন ঋতুর মা, প্রতিভা দেবী। ঋতু যখন খুব ছোট তখনই অফিসের অ্যাংলো টাইপিস্টের প্রেমে পড়েন সুপুরুষ ঘনশ্যাম বাবু। বাড়িতে স্ত্রী কন্যা থাকা সত্ত্বেও ডেলাইনার রূপসাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে একদিন তলিয়ে যান মুখুজ্জ্যে মশাই। ধর্মান্তরিত হন। ঘনশ্যাম হন রজার উইলিয়ামস্। পাতেন নতুন সংসার। বিয়ের কিছুদিন পরেই জন্ম হয় জয়ের। ডাইভোর্সের পর প্রথমা স্ত্রী অভিমানে, লজ্জায় একাকিনি কন্যাকে নিয়ে ফিরে আসেন পদ্মডাঙায়, তার পিত্রালয়ে। কোন যোগাযোগ থাকে না মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে। এমনকি কবে তার মৃত্যু হয়েছে তাও জানেন না। মেয়েকেও তার ছায়া মাড়াতে দেননি। চিরকাল বলেছেন -- তোমার বাবা আমাদের ভালো চোখে দেখেন না। তাই আমরা ওনার কাছে যাবো না।

কিন্তু প্রকৃতির কি নিষ্ঠুর খেলা। যাকে হবু জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিল ঋতু সেই তার সৎ ভাই? এমনটি যে হবে কোন দিন আঁচ করেছিল?

যেই ঘনশ্যাম মুখার্জিকে তার মা চিরদিন অধরার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন তারই ঔরসজাত সন্তান আজ তাদের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তারই পানিপ্রার্থী ?

ঋতুর মন অস্থির, সে নির্বাক। স্বস্তি পাচ্ছেনা কিছুতেই।

হঠাৎ আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের চমক। বৃষ্টি নামলো, ঝমঝমাঝম। বৃষ্টি ঘরে এসে ঢুকছে,ভিজে যাচ্ছে সব কিছু। কারো হুঁশ নেই। বৃষ্টির সুষমা হারিয়ে যাচ্ছে, দমকা হাওয়ায় সারা ঘর এলোমেলো, ছড়িয়ে যাচ্ছে হিমশীতলতা। আর জীবনের রঙ্গমঞ্চে কাঠের পুতুল নায়ক জেসন উইলিয়ামস্, ঘনশ্যাম মুখার্জির ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এবার তাকে একটা অন্য নাটক লিখতে হবে।

ধানশীর দেশে

ধানশী যেন এক রাগিনি। সত্যি সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। এক অপরূপ সুন্দরী, কোমল, মার্জিত মেয়ে যে হৃদয়ে সপ্তসুরের দোলা লাগায়। ভাসায় কিন্তু ডোবায় না। তাকে বারবার দেখতে ইচ্ছা করে, সান্নিধ্যে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

বিদেশ থেকে ম্যানেজমেন্ট পাশ করে সে তার পৈত্রিক হোটেলের ব্যবসা সামলাতে এসেছে উত্তরবঙ্গে। ডুয়ার্স অঞ্চলে তাদের বিশাল তিনতারা হোটেল -- শেভরয়।

বহু মানিগুণী মানুষ এই হোটেলের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। লোকশনটিও ভারি সুন্দর। পাহাড়ের ঢালে চা বাগানের কোলে এক অপূর্ব স্থাপত্য। কিছুটা ভারতীয় কিছুটা পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ। পেছনে নীল পাহাড়ের সারি। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে। এক দিকে একটি ছোট নদী। স্বচ্ছ তার জল। শোনা যায় চাঁদনি রাতে চিতা বাঘ ওখানে জল খেতে আসে।

ধানশীর বাইরেটা কোমল কিন্তু অন্তরে সে বজ্রকঠিন। এতবড় একটা হোটেলের দায়িত্ব নিয়ে খুব সুন্দর সামলাচ্ছে। অনেক ইনোভেটিভ স্কিম চালু করেছে যা টুরিস্টদের আকর্ষণ করবে। এমনকি উৎসাহীদের জন্যে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি হেলিকপ্টার ভাড়া করেছে। সোজা ডুয়ার্স থেকে গ্যাংটক ও দার্জিলিং নিয়ে যাবার জন্যে।

বেশির ভাগ সময় তাকে কলকাতায় থাকতে হয়, মাঝে মাঝে আসে শেভরয়ে। সম্প্রতি খবর পেয়েছে যে তার সাহেব বয়ফ্রেন্ড হ্যারি ইন্ডিয়া আসছে। বেড়াতে তো বটেই, ধানশীর সঙ্গে দেখা করতেও। অনেকদিন তার প্রেয়সীর সঙ্গে মোলাকাৎ হয়নি। সেই যবে ধানশী বিদেশ থেকে পাশ করে এলো তারপর থেকে একবারও দেখা হয়নি। ফোন করে। কিন্তু

সামনাসামনি দেখার তো একটা আলাদা অনুভূতি আছে। খুশিতে মনটা ভরে আছে। যোহান স্ট্রস চালিয়ে গরম কফির কাপে চুমুক দেয়।

হ্যারি এসে গেছে। স্থানীয় লোকের সে হয়েছে হরিদাদা। হ্যারি ভারি খুশি--- ইন্ডিয়া ইজ ভেরি নাইস, সো ম্যানি থিংক্স হ্যাপেনিং হিয়ার, সো কুল!

যদিও কলকাতার গরমে নাজেহাল হয়েছে। তবে এসি টেসি চালিয়ে ম্যানেজ হয়ে গেছে। আপাতত: সে উত্তরবঙ্গ যাত্রী। ওদিকে গরম কম। আর ধানশীর কর্মস্থলটিও দেখার বাসনা আছে। যথাসময়ে পাড়ি দেয় উত্তরবঙ্গ। এয়ারপোর্ট থেকে নেমে গাড়ি করে হোটেলে যাবার পথে একটি স্যাঙচুয়ারির পাশ দিয়ে নিয়ে গেল ধানশী। সবুজ সবুজ গাছ, কালো পিচ রাস্তা আর সার দিয়ে রাখা কাঠের গুঁড়ি, কাঠ চেরাই হচ্ছে। ঘাসের আটি মাথায় নিয়ে চলমান স্থানীয় নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট মানব। দেখে হ্যারি উচ্ছ্বসিত। এরকম মানুষ সে জাপানে দেখেছে --হোয়াট আ নাইস ট্রিপ। ইন্ডিয়া ইজ গ্রেট ম্যান।

এই প্রথম সে হিমালয় দর্শন করবে। স্বভাবতই খুব খুশি। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত, দেবাদিদেব হিমালয়। বইয়ে পড়েছে, হিন্দুরা খুব স্যাক্রেড মনে করে এই গিরিশ্রেণীকে। কত না তীর্থস্থান ছড়িয়ে আছে এই হিমালয়ে। সব বইয়ে পড়ে এসেছে। পকেটে একটা হিমালয়ের ম্যাপও আছে। তারপর শুনেছে শেরপাদের বীরত্বের কথা। মাউন্ট এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘায় তারা কত অভিযাত্রীর সহকারী হয়েছে। সব দেখার, জানার ভয়ানক কৌতুহল তার।

- ধীরে ধীরে সব হবে। এত তাড়ার কি আছে? ধানশীর কথায় মৃদু হাসে হ্যারি।
- ওয়েল আই মাস্ট সি ইচ অ্যান্ড এভারিথিং উইদাউট মিসিং আ সিঙ্গিল।
- ওকে বাবা, এখন চল। ডিনার খাওয়া যাক।

ধানশীর সঙ্গে ওর কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়ায় হ্যারি।

অলিভ ট্রাউজার ও কালো গেঞ্জি পড়েছে ধানশী । বয়কাট চুল । কানের হীরের দুল চক্‌চক করছে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে । স্মার্ট, অভিজাত, আকর্ষনীয় ।

ডিনারের আগে এক পেগ হুইস্কি খেল ওরা । সঙ্গে মশলাদার চিকেন কাবাব ।

হ্যারি বললো– আমাদের ট্র্যাভেল প্ল্যানটা ফিক্স করে ফেলা যাক ।

- ওকে, বলে একটা উত্তরবঙ্গের ম্যাপ বার করলো ধানশী । -- দেখো কোথা থেকে শুরু করবে, সিকিম, দার্জিলিং, নেপাল, ভুটান নাকি ডুয়ার্স !
- বাট ডুয়ার্স ইজ নট হিমালয়া । আই ওয়ান্ট টু গো টু হিমালয়া ফার্স্ট।

তারপরে সিকিমের নীল হাতছানি, কালিম্পং এর কমলা রোদ আর শৈলরানী শ্বেতশুভ্র দার্জিলিং সফর সেরে আমাদের হরিদাদা খুব খুশি । চোখে মায়াবী আবেশ । বার বার শুধু একই কথা ইন্ডিয়া ইজ ভার্সেটাইল। ইন্ডিয়া ইস বিউটিফুল । ইন্ডিয়া ইজ গ্রেট ।

হাত দিয়ে ভাত মেখে খাচ্ছে, ধুতি – পাঞ্জাবি পরা শিখে নিয়েছে । খুব উপভোগ করছে সে প্রতিটি মূহুর্ত, প্রতিটি ক্ষণ । ভারত তার অনবদ্য মনে হচ্ছে ।

শেষমেশ বলেই ফেললো যে সে এখানেই আস্তানা গাড়বে । ইউরোপে আর ফিরে যাবে না ।

শুনে ধানশী খুব খুশি -- গুড ডিসিশন ।

দুটি হৃদয় ভেসে যায় আনন্দ ধারায় । খুশির ফোয়ারায় । উদ্দাম প্রেমে মত্ত অরণ্য, পাহাড়, ঝর্ণারাও । বিমুগ্ধ, মাতাল ওরা দুটিতে । নদীকে নতুন নামে ডাকছে, অচেনা বনফুল কুঁড়িয়ে তার ঘ্রাণ নিচ্ছে, লুকোচুরি খেলছে, পাখির গানের সঙ্গে অজানা সুরে গেয়ে উঠছে ।

ধানশীর বাবা মাও ভারি খুশি । জামাই কাছেই থাকবে । মেয়েও দেশান্তরী হবে না । ইন্ডিয়া–ইউরোপ শাটেল করতে হবেনা । এদিকে ওদের হোটেল একটি প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড অফ এক্সিলেন্স পেয়েছে । তার সবটুকু

কৃতিত্বই ধানশীর । তার বাবা খুব খুশি হয়ে একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করেছেন । সেই সুবাদ সোসাইটিতে হবু সাহেব জামাইকেও ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবেন । খোদ ইউরোপিয়ান জামাতা, কম কথা ? একজন ভারত প্রেমী, সাচ্চা প্রেমী । যে ভারতবাসী হবে বলে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েছে । শুধু তার কন্যাটিকেই নয় – এই দেশের মাটি, জলহাওয়া, নদনদী পাহাড়কে ভালোবাসার ডোরে বাঁধতে চেয়েছে । একি মুখের কথা ? মুগ্ধপ্রাণ এই তরুণ ভারতবর্ষের গায়ে গরীবের দেশ, নোংরা দেশ এইসব তাকমা না সেঁটে নিজে তার একজন হতে চায় । এই তো প্রকৃত ভালোবাসা । ধানশীর পিতা একটি আত্মগরিমার ঢেকুর তোলেন । যেন খনি থেকে মহামূল্যবান হীরেটি একমাত্র উনিই খুঁজে পেয়েছেন ।

পার্টির দিন এগিয়ে আসছে । ওদের কলকাতা যেতে হবে । শেভরয় হোটেলে কিছু সমাজ সেবামূলক কাজও হয় । সেই সুত্রেই ধানশীকে দিয়াবাড়ি নামে একটি চা বাগান অঞ্চলে যেতে হবে। কিছু গরীব গুর্বোদের আর্থিক সাহায্য করা ছাড়াও একটি বিনামূল্যের হাসপাতাল চালায় তাদের শেভরয় ট্রাস্ট সেখানে ক্যান্সার নিয়ে একটি সেমিনার হচ্ছে । দু একদিন থাকতে হবে ।

হ্যারি অর্থাৎ আমাদের হরিদাদা গেলেন না । উনি বসে বসে হিমালয়ের স্লাইড শো দেখছেন । ধানশী ওর গালে একটি বিদায় চুম্বন এঁকে দিয়ে চলে গেল ।

তারপরে মাত্র একবারই কথা হয়েছিল । ফোনে । ধানশীই ফোনটা করে ।

শেষ কথা ছিল -- আমার জানিনা কেন খুব শীত করছে, মাথায় খুব যন্ত্রণা । ব্যাস, লাইন কেটে গেল । আর ওকে ফোনে ধরা যায়নি । হ্যারি অনেক চেষ্টা করেছে ।

পরদিন সকালে উঠে হ্যারি স্থির করলো সেও যাবে দিয়াবাড়ি । গাড়ি নিয়ে বেরোবার মুখে ম্যানেজার মিস্টার সিংহ এসে হাজির । চোখে মুখে উৎকণ্ঠা । আলুথালু বেশ, উসকো খুসকো চুল । কিছুটা অন্যমনস্ক ।

-- হোয়ার ইজ ধ্যানাশী ? হ্যারি ওকে আবিষ্কার করতে চাইছে ।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার ।

-- হোয়াট হ্যাপেন্ড মিস্টার সিনহা ইউ আর লুকিং পেল হোয়াটস্ দা ম্যাটার ? হোয়ার ইস ধ্যানাশী ? মিস্টার সিংহ নির্বাক । শুন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন ।

– নাও কাম অন টেল মি, হোয়ার ইজ ধ্যানা --- কথা শেষ হবার আগেই অবিন্যস্ত মিস্টার সিংহ বলে ওঠেন -- সি ইজ নো মোর । ইটস্ আ কেস অফ ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া । চিকিৎসার সময় দিলেন কৈ ?

-- সার্টেনলি ইউ আর জোকিং ম্যান, ইট কান্ট বি ------! সি কান্ট লিভ মে দিস ওয়ে -- সি কান্ট -- দিস ইজ আনফেয়ার ম্যান -- আনফেয়ার--আর্তনাদ করে ওঠে হ্যারিসাহেব । দ্বিখন্ডিত, বিমর্ষ,এক ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা ।

প্রকৃতির সাজানো বাগানে যেই স্বপ্ন সন্ধানে সে এসেছিল সেই স্বপ্ন তার নিমেষে কোথায় হারিয়ে গেছে । স্বপ্নালু চোখে আজ শুধুই কান্না, গভীর কান্না, সেই কান্নার আওয়াজ ক্ষীণ হতে হতে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে কেউ জানেনা । রাত গাঢ় হচ্ছে, বনজোছনায়, সবুজ আভায়, স্তব্ধ পাহাড়ে মানসিক আশ্রয় খুঁজছে এক বিরহী পথিক । জীবন তাকে যা দিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি কেড়ে নিয়েছে । অনেক অনেক বেশি । ভাঙনের পদশব্দ শুনতে শুনতে শরবিদ্ধ হরিণের মতন যন্ত্রণায় অবগাহন করে হ্যারি । হ্যারি সাহেব । খন্ডচিত্রের মতন ।

এরপরে অনেক বছর কেটে গেছে । হ্যারি সেই যে ভারত ছেড়েছেন, গত বাইশ বছরে একবারও যাননি । একবারো না । কোন সেমিনার বা কনফারেন্সেও নয় । হ্যারি ইতিহাসের অধ্যাপক। সম্প্রতি একটি মেয়ে ভারত থেকে তার ডিপার্টমেন্টে পড়তে এসেছে । সেদিন ডিনারে শুনলো। দেখা হয়নি । খুব শীঘ্রই হতে পারে । সামনেই নতুন ছাত্রদের সঙ্গে প্রফেসরদের একটা মিটিং হবে।

মিটিংয়ের দিন হ্যারি সাহেব একটু তাড়াতাড়ি গেলেন । ভারত থেকে এসেছে মেয়েটি, হয়ত অ্যাকাডেমিক্সের বাইরেও কিছু কথা হবে ।

ঐ তো মেয়েটি ! গোলাপী জামা, ঘিয়ে ট্রাউজার । লম্বা কালো চুল, এদিকেই আসছে ।

সঙ্গে আরেক প্রফেসর, ড্যানিয়াল।

- হেল্লো হ্যারি, দিস ইস প্রাচী, সি ইস ফ্রম ইন্ডিয়া।

- হাই। প্রাচীর গলা রিনরিন করে উঠলো।

কিন্তু হ্যারিসাহেব সৌজন্যতাও ভুলে গেছেন। তার কথা হারিয়ে গেছে। এ কে ? কাকে দেখছেন? সেই মুখ সেই চোখ সেই কপাল, ভ্রূপল্লবে সেই ডাক, কে এই মেয়ে ? কে ?

যেন কয়েক যুগ পেরিয়ে ধানশীই তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কি অদ্ভুত! কি পরিহাস ভাগ্যের।

–তুমি ইন্ডিয়ার কোথায় থাকো ? আর ইউ ফ্রম বেঙ্গল ? গলাটা ঝেড়ে বলেন ওঠেন প্রফেসর হ্যারি।

– ইয়েস স্যার, আই অ্যাম ফ্রম ক্যালকাটা, ওয়েল নোন মুখার্জী ফ্যামলি, মাই গ্রান্ড ফাদার ওয়াজ আ বিজনেস টাইকুন। মাই আন্টি ওয়াজ অলসো আ স্টুডেন্ট ফ্রম দিস ইউনিভার্সিটি।

কোন ভুল নেই, সেই পরিবারের মেয়েই তো বটে।

–– ইফ আই এম নট মিসটেকেন,ইওর আন্টি ওয়াজ ধ্যানাশী মুকার্জি।

–– ইয়েস, বাট হাউ ডিড ইউ নো হার ?

হ্যারি সাহেব অনেক দিন পরে পুরনো খাতা খুলে বসলেন। স্মৃতির পাতা থেকে এক এক করে উঠে এলো সব ছবি। আজও স্বচ্ছ, সমুজ্জ্বল।

এরপর নিয়মিত গল্পগুজব, একসঙ্গে কফিপান। প্রাচীও এই পরবাসে একজন অভিভাবক পেল। হ্যারি সাহেব কত কথা বলতেন। তার মনে জমা হয়ে আছে কত বেদনা। নিজের সন্তানসম ছাত্রীকে ঝর্ণাধারায় মতন সব বলে যেন বড় হালকা মনে হত। ধীরে ধীরে বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও ওরা ভালো বন্ধু হয়ে গেল। প্রাচীকে অনেকবার উনি বলেছেন ভারত থেকে পার্মানেন্টলি চলে আসতে। কিন্তু সে বলে ভেবে দেখবে। একদিন বলেই ফেললো যে তার হবুবর ওখানে আছে তাই সে এই দেশে সেটেল করবে না।

- হবু বর আছে তো কি ? ওকেও নিয়ে এসো।

- ও আসবে না।

- কেন ?

- ও আসতে পারবে না, ওর অসুবিধে আছে।

হ্যারি সাহেব চুপ করে রইলেন। যদিও আজকাল ইন্টারনেট আছে তবুও এই মেয়েটি কিছুদিন পরে চলে গেলে তার বড় একা লাগবে। এ যেন তার হারানো স্বপ্নের এক টুকরো, এক খন্ড। তার জীবনের সবচেয়ে মাধুর্যময় দিনের এক চিলতে রোদ্দুর। অনাগত ভবিষ্যতের কথা মনে করে এক ব্যাথাতুর অনুভূতিতে মনটা ছেয়ে যায়।

প্রাচীর হবুবর অতীন আসবে না। অতএব প্রাচী চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়া। আজই তার শেষ সপ্তাহ। হ্যারি সাহেব স্থির করেছেন বহুদিন পরে ভারতে যাবেন। অতীনের সঙ্গে আলাপ করবেন, প্রাচী তো তার মেয়েরই মতন। আজ ধানশী বেঁচে থাকলে তাদেরও একটা এরকম মেয়ে থাকতো, হয়ত এরকমই দেখতো হত -----আর মনের সুপ্ত ইচ্ছা যেটা আছে সেই ব্যাপারে খুব একটা আশাবাদী না হলেও একবার চেষ্টা করে দেখবেন তাকে এখানে আনা যায় কিনা। রাজি করানো যায় কিনা।

সময় মতন ওরা দিল্লী বিমানবন্দরে এসে নামলো। হ্যারি সাহেবকে নিয়ে প্রাচী কলকাতায় এলো। ওনার একটা নতুন পরিচয় আছে, উনি ওর প্রফেসর।

মুখার্জি পরিবারের সকলে হ্যারিকে দেখে খুব খুশি। এতদিন পরে উনি এলেন। পরিবারের পুরনো মানুষেরা ওনাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। প্রাচীর বাবা মা অর্থাৎ ধানশীর দাদা বৌদি তো খুব আনন্দিত, গর্বিত। প্রাথমিক খুশির ঝলক কাটার পরে হ্যারি গেলেন অতীনের সঙ্গে দেখা করতে। সল্টলেকের একটি ছোট বাংলো। পরিপাটি করে সাজানো, বাইরে বোর্ডে লেখা :

মেজর জেনেরাল প্রতাপ মৈত্র

বিওয়্যার, ডগস্ অন ডিউটি।

হ্যারি সাহেব খুব হাসছেন। হা হা হা হা, প্রাণ খুলে হাসছেন।

-- গৃহকর্তা বেশ রসিক তো।

ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, একটি যুবক কম্পিউটারের সামনে বসে। প্রাচী পরিচয় করিয়ে দিল।

--এই অতীন, অতীন মিট মাই প্রফেসর।

অতীন বসেই হাত বাড়ালো। কম্পিউটারের এপাশে হ্যারি সাহেব একটু বিরক্ত হলেন, ভারি অভদ্র লোক তো।

ওরা দূরে সোফায় গিয়ে বসলো। এমন সময় অতীন তার হুইল চেয়ারখানা ঘুরিয়ে সোফার কাছে এসে পৌঁছলো। হ্যারিসাহেব চমকে উঠলেন! হৃদপিন্ডটা কেঁপে উঠলো। মস্তিষ্ক সারা দেহে এক অদ্ভুত সংকেত প্রেরণ করছে। কেমন দমবন্ধ হয়ে আসছে।

আলাপন সেরে বেরোতে বিকেল গড়িয়ে গেল। সূর্যের শেষ আভায় উষ্ণতম শহর মায়াময়। ক্লান্ত চরণে ঘরে ফিরছে অফিসযাত্রীরা। পাখপাখালিও ডানা ঝাপটাচ্ছে, বাসায় ফিরছে।

একটি ছোট কফিশপ দেখা যাচ্ছে। প্রাচী বললো- কেমন লাগলো স্যার আমার হবু বরকে।

নির্বাক হ্যারি সাহেব যেন এই মূহুর্তের জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলেন,

--- তুমি বলেছো তোমার অ্যারেঞ্জড্ ম্যারেজ। দেখে শুনে একরকম একজনকে লাইফ পার্টনার

হিসাবে চুজ করলে ? লাইফ ইস নট আ গেম মাই চাইল্ড !

--- ও তো শুধু চলতে পারেনা, পঙ্গু, আর কি অভাব আছে ওর মধ্যে? ওর ভেতরে যে জ্ঞান, বোধ, সহমর্মিতা আছে তা অনেক দুপেয়েরই থাকে না। আমি রীতিমতন ছোটখাটো একটা কোর্টশিপ করেই ওকে জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করেছি। আর সবাই তো সুস্থ মানুষকেই লাইফ পার্টনার হিসেবে চান আমি নাহয় একটু ব্যাতিক্রম।

অসম্ভব সহজ ভাবে কথাগুলো শেষ করে মিষ্টি হাসলো প্রাচী। যেন কিছুই হয়নি, এই বাধা কোন বাধাই নয়। আর হ্যারি সাহেব ? উনি অবাক হয়ে চেয়ে আছেন তার মুখের দিকে, প্রাচী - তাঁর ছাত্রী, ধানশীর ভাইঝি। একটি ভারতীয় মেয়ে। আজ অনেকবছর পরে যেন আবার নতুন করে চিনলেন তার প্রিয় ভারতবর্ষকে। এই রূপ দেখার জন্যেই তো ফিরে ফিরে আসা। ধন্য প্রাচী, ধন্য ভারতবর্ষ। ধানশীর কাছেই শেখা একটিমাত্র রবীন্দ্র সঙ্গীত মনে মনে গুন গুন করে ওঠেন হ্যারি সাহেব ---তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে !

মানবী কথা

মানবীর মুখটা পুরো বাঁদরের মতন। লোকে বলে ভয়ানক বাজে দেখতে। গায়ের রং কালো নয় তবে ফর্সাও নয়। মেয়েটি কিন্তু রত্ন।

নরমসরম স্বভাব, কখনো রাগ করেনা, কারো পিছনে কাঠি দেয়না (কথ্য ভাষায়)। খুবই ভালোমানুষ। বাবা আর্মিতে কাজ করতেন। সেই সুত্রে সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছে মানবী। নানান সংস্কৃতির আনাচে কানাচে ঘুরেছে। খুব ভালো নাচে। কিছুদিন মণিপুরী নাচের তালিম নিয়েছিল। কিছু স্টেজ শো করেছে। এখন সময়াভাবে ঐ দিকটা বন্ধ আছে। কাজের খুব চাপ। ব্যস্ত কসমেটিক সার্জেন মানবী। যার রূপ দেখে লোকে মুখ ভেংচাতো সে নিজে আজ সবার রূপকার। ভাগ্যের অদ্ভুত খেলা।

ভালোবেসেছিল অবাঙালী তরুণ সুরযকে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সের ছাত্র ছিল। মানবীকে পাত্তাই দেয়নি। কানাঘুষোয় শুনেছে সুরয বলেছিল --মানভ নেহি হ্যায় ইসি লিয়ে উসকা নাম মানভী হ্যায়। ও এক চিম্পাঞ্জি হ্যায় ! বুকটা ভেঙে গিয়েছিল মানবীর। আয়না দেখাই ছেড়ে দিয়েছিল। কেন সব মেয়ে সুন্দর হয়না ! প্রকৃতির কেন এই অবিচার ?

ডাক্তারি করতে করতেই মানবী বিয়ে করে। ১২ বছরের বড় এক অধ্যাপককে। ভদ্রলোক বিপত্নীক ছিলেন। মানবীর সঙ্গে আলাপ কুলু মানালি বেড়াতে গিয়ে। পরে একসঙ্গে ট্রেকিং করেছে ওরা। মানবীর ওনাকে ভালোলেগেছে কারণ ওনার মধ্যে সে এক আশ্চর্য মানুষকে খুঁজে পেয়েছিল। কি অন্যধরণের চিন্তাভাবনা, অন্য ধরণের জীবনবোধ, দৃষ্টি ভঙ্গী। চেনা ছকের বাইরে এক অচেনা ভুবনের বাসিন্দা। ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা, তারপরে বিয়ে। নি:সন্তান এই দম্পতি অবসরযাপন করেন সমাজসেবা করে। ভদ্রলোক একটু বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। মানবী কোন বাম ধারণা মনে লালন করেনা। তার সোজা হিসেব। গরীবদের দেখার জন্যে স্টেট আছে। কিন্তু আর্তের সেবার ক্ষেত্রে সে স্বামীর পাশে সবসময় আছে। নানান সেবামূলক কাজের পাশাপাশি একটি ছোট

ক্লিনিক খুলেছে ওরা । সেখানে বিনাপয়সায় গরীবদের চিকিৎসার সাথে সাথে প্রয়োজনে কসমেটিক সার্জারি করা হয় । অনেক ক্যান্সার রুগি আসেন। বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক করতে ।

একদিন সকালে চেম্বারে একটি কমবয়সী মেয়েকে আনা হল । মেয়েটির মুখ ভীষণ ভাবে জখম। ছুরি মেরে ক্ষতবিক্ষত দেওয়া হয়েছে । একটি কল সেন্টারে কাজ করতো সে । সদ্য গ্র্যাজুয়েশন করে মোটা মাইনের লোভে এই চাকরী নেয় । সুন্দরীর দেহের আকর্ষণে মত্ত কোন যুবক তাকে দিনরাত কামনা করে না পেয়ে শেষে এই রাস্তা বেছে নিয়েছে । মেয়েটির অফিস থেকে অভিযুক্তকে সাইকো আখ্যা দেওয়া হয়েছে । ড্রেসকোড নিয়ে অবশ্য দু একজন কথা বলেছেন তবে সেই সব অভিযোগ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটির বাড়ি লোকেরা । মানবীকে দেখতে হবে মেয়েটির হারানো রূপ কিছুটা হলেও যাতে ফেরানো যায় ।

মুখের যা চেহারা হয়েছে তাতে সার্জারিতে কতটা উপকার হবে সেটা বলা যাচ্ছেনা । মানবী কদিন সময় চেয়েছে । সম্প্রতি ফেসিয়াল কসমেটিক সার্জারিতে কিছু নব আবিষ্কার হয়েছে । তাতে হয়ত একে সুস্থ করা যাবে । তবে কোন নিশ্চয়তা নেই ।

সেদিন সকালে মানবীর স্বামী রুদ্রদেবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই বিষয়ে । এ কি অবক্ষয় শুরু হয়েছে ! নবপ্রজন্ম এত উচ্ছৃঙ্খল কেন ? ওদের পীড়া দেয় এই বর্তমান সমাজ । রুদ্রদেবের মনে পড়ে তাঁদের সময়ের কথা । তখন সমাজে মধ্যবিত্তদের এত সচ্ছলতা ছিলনা । ছোটবেলায় যখন উনি ক্ষুধার্ত থাকতেন তখন পাশের বাড়ির কুন্ডুবাবু রোজ রাতে মোচ্ছব করে কত খাবার নষ্ট করতেন । পরদিন রাস্তায় সেইসব খাদ্যদ্রব্য পড়ে থাকতো। রাতারাতি সর্বস্ব খুইয়ে বাংলাদেশ থেকে নৈহাটিতে আসা ওদের বিশাল পরিবারের অভুক্ত মানুষগুলোর খাদ্য সংস্থানের জন্য তাঁর মা একবার কুন্ডুবাবুর দুয়ারেও যান ।

কুন্ডুবাবুর সোজা জবাব-- আমি তো লঙ্গরখানা খুলিনি !

মুখের ওপরে চপটাঘাত !

রাতে কারা যেন বামপন্থী গান গাইতো। রোজ কান পেতে সেই গান শুনে চোখের জলে বিছানা ভিজে যেত। লোকে বিদ্রুপ করতো -- মশাই কি রিক্‌শা চড়েন ? আপনারা হলেন বামপন্থী !

রুদ্রদেব নীরব থাকতেন। মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানো যদি বামপন্থা হয় তবে তিনি তাই। অনেকে হিপোক্রীট বলতেও ছাড়েনি। কিন্তু কিছু মানুষের জন্য একটা দর্শন তো মিথ্যা হয়ে যায়না। মানবী অবশ্য এই যুক্তি মানেনা। তার মতে যেই মানবদর্শন বাস্তব জীবনে অচল তার কোন মূল্য নেই। আর বেশিরভাগ কমিউনিস্ট ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে। তাই দুনিয়ার সব কমিউনিস্টদের মানবী ঘেন্না করে।

রুদ্রদেব কোন তর্কে যাননা। কি লাভ ? যার যার ভাবনা তার তার কাছে। যার যেরকম জীবনদর্শন সে তাই নিয়েই বাঁচবে। শুধু মানবীকে বলেছেন যে মনে কারো জন্যে হেট্রেড রেখো না। তাতে নিজেরই অশান্তি বাড়ে।

মানবী মেয়েটিকে দেখছিল। মুখটা কি বীভৎস আকার নিয়েছে। কিছু কিছু স্থানে হাড় বেরিয়ে গেছে। যেই ছেলেটি ছুরি মেরেছে সে নাকি ওকে ভালোবাসতো !

ভালোবাসা ? এর নাম ভালোবাসা ? ভালোবাসা মানুষকে হিংস্র করে ? মানবী জানে না। যেমন জানেনা এই ভোগবাদের সমাজে শতকরা ৭৫ শতাংশ মানুষ যেই মনোবিকৃতির শিকার তা শেষ অবধি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। সবাই সব পেতে চায়। না পেলেই আদায় করে নেওয়ার চেষ্টায় কখনো কখনো হয়ে ওঠে চরমপন্থী। আজকাল বোর্ডে ফার্স্ট সেকেন্ড খালি বলে তারা ডাক্তার হতে চায়, কম্পিউটার বিজ্ঞানী হতে চায়। ওরা কি বড় স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে ? রুদ্রদেব বলেন -- আজকাল সাধারণ ঘরের ছেলেপুলেদের হাতেও অঢেল টাকা। সেই অর্থ ব্যয় করারও তো একটি রাস্তা চাই। সবাই কি অর্থের সদ্‌ব্যবহার করতে জানে ? দামি সুরা, নাইট ক্লাব, জুয়া এইসব এখন সাধারণ ঘরের হাতের মুঠো। ভ্যালুজ গুলো সব ঢিলে হয়ে যাচ্ছে। নোটস্ ও সাজেশন পড়ে পাশ করা প্রজন্ম ভুলে গেছে শিক্ষার আসল উদ্দ্যেশ্য। গভীরতার বড় অভাব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা হয়।

কাল মেয়েটির অপারেশন । সকাল দশটায় । অপারেশন থিয়েটারের সামনে দন্ডায়মান এক ব্যক্তি।

মানবী ঢুকতে যেতেই এগিয়ে এসে ওর দুহাত চেপে ধরলেন ভদ্রলোক ।

- আমার মেয়েকে বাঁচান ডক্টর । ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছিলো । আমি যত টাকা লাগে দেবো । খুব ভালো ঘরে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে । আমার হবু জামাই ওকে ছাড়া বিয়ে করবে না । এখন যদি ওর রূপ ফেরানো না যায় সব শেষ হয়ে যাবে । ভদ্রলোকের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ।

- আপনি এখন ওর সুস্থতার কথা ভাবুন । বিয়ের ব্যাপারটা পরে ভাববেন । খুব মিহিস্বরে বলে ওঠে মানবী ।

লোকে বলে মানবীর বড় ডাক্তার হবার পেছনে ওর জ্ঞান তো আছেই তার সঙ্গে আছে ওর ব্যবহার । বড় মধুর ওর গলার স্বর ও কথা বলার ভঙ্গিমা । মন প্রাণ জুড়িয়ে যায় । অর্ধেক রোগ ওর কথা শুনলেই সেরে যায় । এই ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার হল । ভদ্রলোক একটা দেঁতো হাসি দিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন । মানবী ঢুকে গেল অপারেশন থিয়েটারে ।

টানা আট ঘন্টা অপারেশন করে বেরিয়ে এলো যখন মাথাটা কেমন ঝিম মেরে গেছে। এক কাপ কফি নিয়ে নিজের কেবিনে বসলো । রুদ্রদেবকে ফোন করলো । উনি জানতে চাইলেন রোগিনির অবস্থা । বেশ চিন্তিত মনে হল । মানবী মেয়েটির বিয়ের ব্যাপারটা বললো । রুদ্রদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ।

এদিকে ব্যান্ডেজ না খোলা অবধি কিছুই বলা যাবেনা । মানবী তার কাজ যথাসম্ভব নিপুনভাবে করেছে । বাকিটা ভাগ্যের ওপর । সময় একমাত্র বলতে পারবে কি হবে, কি হতে পারে ।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে । একদিন মেয়েটির ব্যান্ডেজ খোলা হল । চমৎকার! মুখটা একদম স্বাভাবিক লাগছে । হয়ত রূপের সেই জেল্লা নেই তবে একটি মানুষের মুখের মতনই মনে হচ্ছে । মেয়ের পরিবার খুশি, মানবী খুশি, রুদ্রদেবও খুশি ।

গত কয়েকদিন ধরে খালি ফুলের তোড়া আর মিষ্টি আসছে। অভিনন্দন হিসেবে। সহযোগী ডাক্তারেরাও ভারি খুশি। এরকম অপারেশন সচরাচর সাকসেসফুল হয়না। এত নিঁখুত কাজ একমাত্র ডাঃ মানবীর পক্ষেই সম্ভব। এইসব স্তুতিতে মানবী অভ্যস্ত। সে একজন প্রথম সারির কসমেটিক সার্জেন। কত ছায়াচিত্র জগতের সুন্দরীর সৌন্দর্যের চাবিকাঠি মানবীর হাতে। সে কি কেউ জানে? যাইহোক মেয়েটি সুস্থ হয়েছে দেখে ওর বেশ আনন্দ হচ্ছে। সার্জেন হিসেবে তো বটেই একজন নারী হিসেবেও। মেয়েটির হবু শ্বশুরবাড়ির কাছে ওর মাথা উঁচু থাকবে।

একমাস কেটে গেছে। মেয়েটির বাবা এসে একেদিন ওদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করে গেলেন। ডিনারের। মানবী একাই গেল। রুদ্রদেব জ্বরে কাহিল তাই বাড়িতেই বিশ্রামরত।

ফ্রুট্‌জুস নিয়ে এককোণায় বসলো। সুবেশা কিছু তরুণ তরুণী ঘুরে বেরাচ্ছেন। ওরা কারা মানবী জানেনা। ও একমনে দেখছে ওদের। কি সব কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছে। আজকালকার ছেলেপুলে খুব স্মার্ট। মানবীকে ওরা খেয়ালই করছে না। হঠাৎ কাঁধে একটা আলতো স্পর্শে জুঁই ফুল জড়ানো বেণী দুলিয়ে মানবী ঘুরে তাকায়। রোগিনির মা, কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন -- এই আমার হবু বেয়াইমশাই। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। খুব বড় পন্ডিত। মানবী ঘুরে তাকিয়েই স্থবির হয়ে গেল। ভদ্রলোকও ঈষৎ কম্পিত হয়ত বা লজ্জিত। সংলাপহীন। তাহলে চিনতে পেরেছেন। শেষবার যখন মানবী তাকে দেখেছিল তখন তার চোখজোড়া ছিল গর্বিত, নিষ্ঠুর। আজ কি সেই চোখ ক্ষমাভিক্ষা করছে? সে বুঝতে পারছে না। এই মহাপন্ডিতের একমাত্র আদরের ছেলের পছন্দ করা মেয়ে যে মানবীর হাত ধরে এক অপরূপ রূপসাগরে ডুব দিয়েছে তা কি ভদ্রলোককে স্মৃতির অতলে আহবান করলো? ফিরে গেলেন মুছে যাওয়া দিনগুলোতে? যৌবনের সেই উদ্ধত দিনগুলো কি তাকে বিদ্ধ করছে, অনুভবে ক্রন্দন ঝরছে? মানবী জানেনা। শুধু সে জেনেছে যে প্রকৃতি একদিন না একদিন সব হিসেব মিটিয়ে দেয়, কারো কাছে ঋণী থাকেনা।

কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন সকালে রুদ্রদেব খবরের কাগজ হাতে খুব উত্তেজিত ভাবে ডাইনিং হলে এলেন। মানবী পট থেকে চা ঢালছিল।

রুদ্রদেবকে দেখে মৃদু হেসে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল- কি ব্যাপার ? কি হল ? রুদ্রদেব কাগজটা এগিয়ে দিলেন । মানবী স্থম্ভিত । বাকরুদ্ধ । তার চোখের ভাষা রুদ্রদেব স্পষ্ট পড়তে পারছেন । বড় করুণ সেই ভাষা ।

সেদিনের কাগজের হেডিং ছিল এইরকম –

ছুরিকাঘাতে জখম কলসেন্টার এমপ্লোয়ী সুদীপা চন্দ চক্রান্তের শিকার । মূল অভিযুক্ত হবু শ্বশুর সূরয লাল মতিহার । কলসেন্টার চাকুরের সঙ্গে পুত্রের বিবাহের চরম বিরোধী ছিলেন সূরয-----।

সিন্দুর

ঘনবনের পাশে একটি বিশাল বাড়ি খুব সস্তায় পাওয়া গেল। লেখালেখির জন্য আজকাল নিলয়ের একটু নিরিবিলি ভালোলাগে। একটি প্রথম সারির দৈনিকের সঙ্গে সে চুক্তিবদ্ধ। সপ্তাহে একটি করে গল্প লিখতে হবে। এছাড়া তার নিজস্ব লেখালেখি আছে। সম্প্রতি তার দশম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে। লেখক হিসেবে বেশ নাম আছে নিলয়ের। তবে সে একটু অন্যজাতের লেখক। কোন বিষয় মনস্থির করলে অনেক সময় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে সেই পটভূমিতে কিছুদিন কাটিয়ে আসে। এটাই ওর ঘরানা। তাই পাঠকের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি বাস করে সে।

বাড়িটির নাম নালন্দা। বড়ই বেমানান। জংলী কিনারে বাড়ি, তার এই এথনিক নামখানি কে যে দিলেন কে জানে! যদিও দোতলা বাড়িটি ভারি দৃষ্টিনন্দন। বিদেশী স্টাইলে বানানো। ফটক পেরিয়ে বাগান। তারপরে মাধবীলতার ঝাড় দিয়ে মোড়া মূল এন্ট্রান্স। ঢুকেই বিরাট হল। একপাশ দিয়ে সিঁড়ি। অন্যপাশে বাগানে যাবার রাস্তা। পাখির ডাকে মুখরিত। কাঠবেড়ালি এসে হলে খেলা করে। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে দিন গুজরান।

একজন চৌকিদার কাম চাকর লছমন ও তার বৌ ছুমরিকে নিয়ে নিলয়ের সংসার। ওরাই রাঁধে বাড়ে। নিলয় শুধু লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সপ্তাহে একবার শহরে যায় গল্প সাবমিট করতে। তখন কেনাকাটা করে আনে। ইন্টারনেট কানেকশন নেই। হয়ত শীঘ্রই এসে যাবে। তাই নিয়ে নিলয়ের কোন মাথা ব্যথা নেই। সভ্য জগতের বাইরেও যে জীবন আছে এবং তা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট সে কথা যদি একজন লেখক না বোঝে তাহলে বুঝবে কে? সে তো স্বেচ্ছায় তার আধুনিক জীবন পেছনে ফেলে এসেছে! আজ সে বনবিহারী, বনবাসী। শহুরে মুখোশটাকে এক ঝটকায় খুলে ফেলেছে।

ছুমরি কিন্তু বেশ রাঁধে। ঝাল ঝাল বনমূর্গি কিংবা কড়কড়ে ডিমের ঝোল– আহা! মুখে লেগে থাকে। নিলয় একটু ভোজন রসিক। তাই

বাড়িটি কেনার আগে ভাবছিল খাওয়াদাওয়ার কি হবে। পরে ভেবে দেখলো কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়। আর গাড়ি তো রইলোই ! ইচ্ছা হলে শহরে গিয়ে রেস্তোরাঁয় খেয়ে আসবে। কিন্তু ছুমরির কল্যাণে রেস্তোরাঁয় যেতেই হয়নি আজ অবধি। চমৎকার রাঁধে। এই ছুমরিই একদিন দুপুরে এসে বললো- সাব, বাহার এক আউরাৎ বিমার পড়ি হ্যায়, উসকো অন্দর লে আউ?

বাগানের পাশে রাস্তার ধারে একটি অল্পবয়সী মেয়ে পড়ে আছে। বাইশ তেইশ মনে হচ্ছে। সাধারণ পোশাক আশাক। কাঁধে একটি চটের ব্যাগ। নিলয় ছুমরির সহযোগিতায় মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে এলো। কে, কোথার থেকে এসেছে কিছুই জানা গেলনা। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ঘরে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। কিছুদিন পরে মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠলো। ওর নাম সিন্দুর। আধা বাংলা আধা হিন্দি ভাষী। নিলয়ের একজন সঙ্গী হল। মেয়েটি ওর কোন বন্ধুকে মাত্র দুবার ফোন করছে,ব্যাস ! আর কোন যোগাযোগ নেই কারো সঙ্গে। কোথায় থাকো? জিজ্ঞেস করলে হাসে। বলে আমার কেউ নেই। কাজের খোঁজে শহরে যাচ্ছিলাম। পথে বিমার হয়ে পড়ি।

নিলয়ের যদি একটি ছোটবোন থাকতো তাহলে আজ সে এই বয়সীই হতো। --তোমার যতদিন খুশি এখানেই থাকো। নিলয়ের প্রস্তাবে একটি নির্মল হাসি ছড়িয়ে পড়ে সিন্দুরের মুখে।

আজকাল সকালের চা সিন্দুরের হাতেই তৈরি হয়। নিলয় যখন লিখতে বসে সিন্দুর পাশে বসে থাকে। মাঝে মাঝে দু একটি শব্দ সংযোজন করে। নতুন নতুন লাইন বাতলে দেয়। নিলয় অবাক চোখে চেয়ে থাকে। এত গুণী মেয়েটি কিন্তু কোন চাকরী পায়নি। মনে মনে ভাবে চেনাশোনা কাউকে বলে যদি একটি চাকরী করে দেওয়া যায় ! তবে ইদানিং ওকে লেখালখিতে উৎসাহ দেয়। সিন্দুর মিষ্টি হেসে বলে --ভেবে দেখবো। একদিন সকালে চায়ের টেবিলে ভারি সুন্দর একটি কবিতা উপহার দিল নিলয়কে। নিলয় বদ্ধপরিকর - ওকে লেখক বানাবেই। সাধারণত লেখকেরা গল্প খোঁজে, চরিত্র খোঁজে কিন্তু এক প্রতিভাময়ী লেখিকা নিজে এসে ধরা দিয়েছে এ তো পরম সৌভাগ্য ! নিলয় ওকে তার পাবলিশারের

সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে । যার এত গভীর জীবনবোধ, কল্পনা শক্তি, ভাষায় এত দখল সে লেখিকা হবে না তো কে হবে ?

একদিন কথায় কথায় জানা গেল মেয়েটির আদতে ত্রিপুরার বাসিন্দা । জীবন স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে পশ্চিম ভারতে ।

সিন্দুরের চিন্তাভাবনা নিলয়কে নাড়া দেয় । যেমন ও সেদিন বলছিল যে মানুষ এত গাছ কেটে ফেলছে -- কেন ? গাছপালা হারিয়ে গেলে এই গ্রহের জীব বাঁচতে পারবে না । কিংবা আজকাল সবাই বিদেশে পাড়ি দেয় । কেন ? দেশে কি ভালো কবি নেই ? বিজ্ঞানী নেই ? সবাই বিদেশকে নকল করে -- কেন ? নিলয় একমনে শোনে । সাধারণ একটি মেয়ের গভীরতা তাকে মুগ্ধ করে । নিলয়ের লাইব্রেরীর অনেক বই সিন্দুর পড়ে ফেলেছে । সে নাকি পড়তেই সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে । এই অরণ্য প্রান্তরে একাকিনী একটি মেয়ের সঙ্গী শুধু বই ।

একদিন সে মৌরি দিয়ে মূগী রান্না করলো । অপূর্ব তার স্বাদ । সিন্দুরের মা এই রান্না শিখিয়েছিলেন । আর একদিন পোস্ত দিয়ে একটি শাকের প্রিপারেশন করেছিল । সেটিও চমৎকার ।

কখনো কখনো অলস দুপুরে মিঠে সুরে গেয়ে ফেলে পাহাড়ের গান । ভুপেন হাজারিকা ।

রূপসী নদীর বধুয়া, হাওয়ায় দোলা মহুয়া, মনে তে আগুন জ্বালায় ------

ভালো লাগে । নিলয়কে সে দাদা বলে সম্বোধন করে । এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল এক একটি দিন ।

সেদিন মোমজোছনায় বনপথ মায়াবী, অপরূপ । লেখকের সংবেদনশীল মন তাকে টেনে নিয়ে যায় রাস্তায় । নিঃস্তব্ধ চারিপাশ । মনের জলছবি কল্পনার রঙে রাঙানো । অলিন্দে বনমর্মর। আকাশে রঙ বিলাসী নক্ষত্রের কোমল আভা । হেঁটে বেড়ায় নিলয়।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে সিন্দুর তার পাশে । দুজনে মায়াময় সবুজের কোলে । জঙ্গলে ।

নিলয় রসিকতা করে --জানিস সিন্দুর, এই জঙ্গলে ভূত আছে।

সিন্দুর জোরে হেসে ওঠে - হা হা হা ! আমি ভূত ভয় পাইনা।

হাসির ঝঙ্কারে নিলয় নাছোড়বান্দা - কেন, কৃষ্ণা কটেজ দেখেছিস ? ভীষণ ভয়ের।

- আমি গত চার বছর হল কোন সিনেমা দেখিনি। তবে দেখলেও ভয় পেতাম না।
- তুই ভূত বিশ্বাস করিস না ?
- নাহ !
- তুই খুব সাহসী মানতেই হবে।
- হ্যাঁ আমাদের সাহসী নাহলে চলে, একা একা একজন মানুষ এই বিরাট পৃথিবীতে, একমাত্র সাহসই তো আমাদের সম্বল ! ভূতের কথা ছাড়ুন, শায়েরী শোনেন ? আমার শায়েরী বড় ভালোলাগে।

ঘনবন নিঝুম। সিন্দুর মন্ত্রমুগ্ধের মতন ব্যক্ত করে চলেছে গজলের প্রতি তার অনুরাগের কথা। বুনে চলেছে কথামালা। নিলয় এক মনোযোগী শ্রোতা। শেষ রাতে ওরা গৃহপানে পা বাড়ায়। এক সময় পথ ফুরায়। যে যার ঘরে ফিরে যায়। শেষ হয় দুটি মরমী মনের মিঠেল আলাপন। আসে আরো একটি সকাল। পাখিরা গান গায়, মধু খায়। সিন্দুর রাতপোশাক ছেড়ে সবুজে অবগাহন করে। নিলয় ব্যস্ত কলমের আঁচড়ে। দিনকেটে যায় নিজ গতিতে। এরই মধ্যে একদিন একটি পাখি এসে বাসা বাঁধে ওদের হলের কোণে। একদিন ডাস্টিং করার সময় পাখির বাসাটি ভেঙে দেয় লছমন। পাখিটি গৃহহারা হয়ে পড়ে। একটি ডিম মাটিতে পড়ে ভেঙে যাচ্ছিল। সিন্দুর ছুট্টে গিয়ে ধরে ফেলে। তারপরে পরম মমতায় পাখিটির পুনর্বাসনে সাহায্য করে। নিলয় মুগ্ধ। সিন্দুরের মমতা, কোমলতা নিলয়কে নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর সমস্ত নারীই বোধকরি মমতাময়ী। সে চেনা হোক বা অচেনা।

ইতিমধ্যে শহরে যাবার সময় এসে গেছে। এক স্বর্ণালী ভোরে সে রওনা হয় শহরে। ফিরে এসে দেখে সিন্দুর চলে গেছে। কাউকে বলে যায়নি কোথায়

গেছে। কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কিনা। নিলয় অবাক। তাহলে কি ওর কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ছেড়ে গেল সিন্দুর? নাকি কোন জরুরি কাজ! কিন্তু কিইবা কাজ থাকতে পারে? হয়ত চাকরির সন্ধানে আবার পথে নেমেছে। ও তো মায়ের পেটের ভাই নয়!

একটু অভিমানও হল। কিন্তু কি আর করা? সে নিজে থেকে না ফিরলে কিছুই করার নেই।

আবার নিলয় একা হয়ে গেল। লেখালেখিতে ভুলে থাকতে চাইলো অজানা বোনটির কথা। এক ঝলক তাজা বাতাসের মতন যে নিলয়ের জীবনে এসেছিল।

এক মাস কেটে গেছে। একদিন সকালে রেডিও চালিয়ে জানতে পারলো দিল্লী শহরের কেন্দ্রস্থলে বোমা বিস্ফোরণের কথা। অনেক লোক নিহত হয়েছেন। চারিদিকে হাহাকার। চরম সতর্কতা জারি হয়েছে রাজধানীতে। কারা করছে এই নৃশংস কাজ? কখনো দেখা হলে সে জিজ্ঞেস করবে সেইসব রুক্ষ মানবসন্তানকে। জবাব চাইবে। একজন কৃতী নাগরিক হিসেবে তার কিছু দায়িত্ব তো আছে! মৃত্যুর মিছিলের সওদাগর এরা, এদের কি মন বলে কিছু নেই?

দিনটা মেঘলা ছিল। সেদিন আবার নিলয়ের শহরে যাবার কথা। এইরকম কালো মেঘে ঢাকা আকাশ দেখলে লোকে অভিসারে যায়। নিজের মনেই হেসে ওঠে নিলয়। এও এক ধরণের অভিসার বৈকি! তার একমাত্র ভালোবাসা সাহিত্যের সঙ্গে প্রেম। এখানে খবরের কাগজ মেলেনা। একমাত্র রেডিও ভরসা। ব্রেকফাস্ট সেরে সে বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। পাবলিশার মিঃ ত্রিবেদীর অফিসে বসে এক কাপ চা খেলো। নানান টুকিটাকি কথার পরেই এলো ব্লাস্ট প্রসঙ্গ। মিঃ ত্রিবেদী বললেন -- যেই উগ্রপন্থী সংগঠন এই কাজ করেছে বলে দাবী করেছে তার ভেতর কয়েকজনের ছবি আজ পেপারে দিয়েছে, এদের ধরে দিতে পারলে মোটা পুরস্কার দেবে সরকার। এই দেখুন!

বলে পেপারখানা মেলে ধরলেন নিলয়ের চোখের সামনে।

বড় বড় চোখ করে চেয়ে আছে ত্রিবেদীর দিকে । যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে ! হৃদয়ের একপাশে গভীর যন্ত্রণা আর অন্যপাশে অসীম স্নেহ ও মমত্ববোধ অনুভব করছে । হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজ খানা টেনে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালার বাইরে ফেলে দেয় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ, জনপ্রিয় লেখক নিলয় সেন । এক অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় । হয়ত বা কৌতুহলী মনটাকেও । চিরদিনের মতন । তারপর ভাঙাচোরা লেখক একজন পরাজিত, ম্লান মানুষের মতন উদভ্রান্ত হয়ে পথে নেমে পড়ে । এক অচিন পথে। যেই পথের শেষ কোথায় কেউ জানেনা ।

ভুবন স্যার

১

ভুবন স্যার । সত্যি উনি অসহায় মানুষের এক অন্য ভুবন । ছোটখাটো মানুষটি আর্তের কাছে শালগাছের মতন । যেই বৃক্ষ ছায়া প্রদান করে । শীতল ছায়া । শাখাপ্রশাখায় সবুজ আহবান । গণিতজ্ঞ ভুবনমোহন চ্যাটার্জি ছাত্রছাত্রী থেকে অসহায় মানুষ, গরীব গুর্বো সব্বার ভুবন স্যার । জলপাইগুড়ি জেলায় একডাকে সকলে ওনাকে চেনে । উনি কমিউনিস্ট নন কিন্তু । রাজনীতির ঘোর বিরোধী । ওনার মতে আর্তের সেবা করতে হলে কোন নীতির প্রয়োজন নেই । অন্তরের টানই আসল । তা উনি পারেনও বটে । বাড়িতে সবসময় পাত পড়ছে, ঘরের বাইরের লোক মিলিয়ে রোজ অনেক থালা পড়ে । আগেরকার দিনের মতন মতবাদ ওনার, গুরুগৃহে থেকে, খেয়ে শিষ্যের শিক্ষালাভ । মাটির মানুষ ভুবন স্যারের জনপ্রিয়তা এলাকার নেতাদের ঈর্ষার বস্তু ।

সেই ভুবন স্যারকেই আজকাল পথেঘাটে দেখলে লোকে এড়িয়ে যায়। কথা দূরে থাক কেউ হাসেও না। উনি যে আলঝাইমার্স রোগী। কোন কথা শুরু হলে থামে না উপরন্তু এলোমেলো বকতে থাকেন। শ্রোতা না পারেন যেতে না ধৈর্য্য ধরে শুনতে। তাই পরিচিতরা ওনাকে দেখলে দ্রুত ফুটপাথ বদল করেন। ভুবন স্যার বোঝেন না। বোঝার কথাও না।শুধু স্ত্রীর কাছে অনুযোগ করেন --কেউ আজকাল আমার কথা শোনে না।

দুই ছেলে। দুজনেই উচ্চপদাধিকারী। থাকেন কলকাতায়। দুজনের আলাদা সংসার। আধুনিক গ্যাজেটের সঙ্গে অত্যাধুনিক জীবন সঙ্গিনী। সেই সংসারে বাড়তি আবর্জনা কেউ আনে ? ফলে ভুবন স্যার তাঁর স্ত্রীর সাথে থাকেন নিজের ছোট্ট বাড়িতে। জলপাইগুড়ি শহরে। আজকাল সবচেয়ে মুস্কিল হল উনি অনেক সময় বেরিয়ে যান আর মনে করে বাড়ি ফিরতে পারেন না। একদিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো দুটি কিশোরকে জিজ্ঞাসা করে তবে নিজের বাড়ি আসেন। পরে ওরা ভুবন স্যারের স্ত্রী রাধাদেবীকে এসে বলে যায় যে স্যার মনে হয় আজকাল রাস্তা চিনতে পারেন না। স্ত্রী কথা বাড়ান না। স্বামীকে একা কোথাও যেতে বারণ করেন। কিন্তু ভুবন স্যার শোনার বান্দা নন। একদিন ওনার কথায় সবাই উঠতো বসতো। আজ ওনাকে কেউ নিয়মের বেড়াজালে বাঁধবে এও কি সহ্য হয় ? নাহয় বয়সটাই বেড়েছে। তাতে কি ?

ছেলেরা মাঝে মাঝে আসে। আহা উহু করে। আবার ফিরে যায়। এইভাবেই চলছিল। একদিন বোধকরি পুজোর সময় উনি বাড়ির লোকের অলক্ষ্যে একা বেরিয়ে যান। শেষমেশ পথ ভুলে আর ফিরতে পারেন না। এদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। অবশেষে ওনারই এক পুরাতন ছাত্রের ছেলে ওনাকে বাড়ি দিয়ে যায়। ওনার স্ত্রীকে বলে যায় স্যারকে একা কোথাও না ছাড়তে। খবর যায় ছেলেদের দরবারে। বসে মিটিং। আলোচনার পর আলোচনা। তারপরে মায়ের সব আবেদনকে অগ্রাহ্য করে একদিন স্যারকে নিয়ে যাওয়া হয় বৃদ্ধাশ্রমে। আপাতত: উনি সেখানেই আছেন। পাড়ার লোকেরা বলেছিল একজন রাতদিনের আয়া দিয়ে ওনাকে বাড়িতেই রাখতে। উনিও বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি নন। নিজে হাতে বাড়ি তৈরী করেছিলেন। জমানো টাকা দিয়ে। প্রতিটি ইট তার স্মৃতি বহন করছে। আঙিনায় কত গল্প, উপকথা ভাসছে। কত ঘটনার সাক্ষী এই বাড়ি। সেই স্মৃতি বিজড়িত জায়গা ছেড়ে শেষ বয়সে

যেতে মন চায় ? তবু যেতে হল । সত্যি । একেবারে পার্মানেন্টলি । মা একা পেরে ওঠেননা । কাজেই এই ব্যবস্থা । স্বচ্ছল ছেলেরা আয়ার খরচ দিতে নারাজ । তারা নতুন মডেলের গাড়ির পেছনে টাকা ঢালবে । বাবা একটা পুরনো ছেঁড়া কাগজ । দুদিন পরে ফেলে দিতে হবে ।

বৃদ্ধাশ্রমে টেঁকা দায় । কেউ কথা বলে না । সময় মতন খাবার দেয়না । একটু বাড়তি চা চাইলে পাবার উপায় নেই । সকালে ঘুম না ভাঙলে প্রাতরাশ মিস । কে ওনার জন্যে বসে থাকবে ? কেনই বা থাকবে ? এদিকে ওনার ওষুধের এফেক্টের জন্য সকালে দেরী করে ঘুম ভাঙে । তাই বেশির ভাগ দিন ওনাকে অভুক্ত থাকতে হয় । শুকিয়ে যাচ্ছেন । ছেলের বৌরা বলে বয়স হলে কম খাওয়াই ভালো । তাতেই মানুষ দীর্ঘায়ু হয় । ভুবন স্যারের স্ত্রী নীরবে নিভৃতে কাঁদেন ।

২

কথাকলি । ভুবন স্যারের ছাত্রী । বিজ্ঞান নিয়েই পড়তো । ভালোবেসে ইতিহাস নিয়ে ডক্টরেট করে । ছোটবেলা থেকেই ভালো লাগতো চোল, মুঘল কিংবা বাংলার রাজবংশের ইতিহাস। ভুবন স্যার ওকে সবসময় এনকারেজ করতেন । একদিন কথাকলি বলে -- সমাজে যেই অবক্ষয় শুরু হয়েছে তাতে ভালো কিছু আগামী শতাব্দীতে কি আমরা পাবো ? ভুবন স্যার বলেন যে ভবিষ্যৎ যখন অজানা তখন ভালোটাই আশা করতে অসুবিধে কোথায় ?

কথাকলি আজ ভুবন স্যারের অবস্থা দেখে মর্মাহত । যেই জীবনদর্শন শিখেছিল সে এই অধ্যাপকের কাছে সেই জ্ঞান তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে গেছে । সে পারেনি অন্যদের মতন স্যারকে এই অবস্থায় অবহেলা করতে । রোজ আসতো । স্যারের বাড়ি । বসে বসে তাঁর কথা শুনতো । অনর্গল বকবকানি । কথার খেই হারিয়ে যেত, কথাকলি ধরিয়ে দিত । স্যারের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে বলতো –আমার ভালো লাগে শুনতে । কত জ্ঞানী । এরকম মানুষের সান্নিধ্যে থাকা ভাগ্যের ব্যাপার । নতুন কিছু মনে থাকতো না ওনার তবে পুরনো কথা সব মনে আছে । এটাই নাকি এই রোগের সিম্পটম ।

শেষে কথাকলি তার শিলিগুড়ির চাকরী বদল করে চলে এলো জলপাইগুড়ি । ততদিনে ভুবনবাবুকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । একদিন দেখা

করে এলো। কি অসহনীয় কষ্ট ! বাড়ি ফেরার কি আকুতি ! ঐ বদ্ধ ঘরে কিছুতেই উনি থাকতে রাজি নন। শেষে কথাকলি ও স্যারের স্ত্রী রাধাদেবী ওনাকে নিয়ে এলো। নিজের বাড়ি। একটি আয়া দিয়ে রাখলো। স্যার খুব খুশি। -- মা তুই আমার মেয়ে। আমার ছেলেরা তো বুঝলো না। তুই বুঝেছিস।

ছেলেরা বিরক্ত হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলো না। ভাবখানা যেন -- দেখা যাক কতদিন !

৩

ভুবন স্যার প্রচুর সমাজ সেবা করতেন। কুষ্ঠ রুগীদের জন্য কাজ করেছেন। অন্ধদের জন্য কাজ করেছেন। একটি সাইকেল ভ্যান কিনেছিলেন। অন্ধদের যাওয়া আসার জন্য। পরে সেই অন্ধ স্কুল বড় হয়েছে। আজ তা খুব বড়। কুষ্ঠ নিবারণ সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। স্বপ্নময় চোখে দেখেছিলেন ভবিষ্যত। সেই কুষ্ঠ সমিতি হুয়ের সাহায্যে আজ সমাজের উজ্জ্বল দীপ। ভুবন স্যারের কিছু মনে পড়েনা। বললে মনে পড়ে। তখন অনেক পুরনো কথাই ঝর্ণাধারার মতন বেরিয়ে আসে। ওনার কত ছাত্রছাত্রী আজ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। দেশে এলে ওনার সঙ্গে দেখা করে যায় অনেকেই। ওনার বর্তমান অবস্থা দেখে সহানুভূতি দেখায় কেউ কেউ। কেউবা কয়েক ডলারের চেক লিখে দিয়ে যায় রাধাদেবীর হাতে। এইভাবেই চলছিল। ছেলেরা আর আসেনা। ফোনে খবর নেয়। রাধাদেবীও ওদের বিরক্ত করেন না। কথাকলি আছে যে !

রোডস স্কলারশিপ নিয়ে কথাকলি পড়তে গিয়েছিল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে এক সাহেবের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরে ছেলেটি মারা যায়। ম্যাপেল গাছের নীচে তার কবরে ফুল রেখে চলে এসেছিল ভারতে। ও ঝাড়া হাত পা। এখন যেন নতুন বাবা মা পেয়ে ওর সংসার আনন্দে উচ্ছল। ভরে উঠেছে। বইছে আনন্দধারা। শুধু দু:খ হয় মাঝে মাঝে স্যারের জন্যে। তাঁর আত্মজরা তাঁকে বুঝলো না। চিনলো না। অন্য পাঁচটা বৃদ্ধের মতন বৃদ্ধাশ্রমে ঠেলে দিল। অসুস্থ রোগীকে এইভাবে ফেলে দেওয়া এই কি শিক্ষা ? এই কি সচেতনতা ? স্যারের সারা জীবনের আদর্শ তাঁর অংশরা অনুসরণ

করলো না ? ভোগের পায়ে সমস্ত জলাঞ্জলি দিল ! শিক্ষা কি মানুষকে নির্মম করে ? গভীর বেদনা উঠে আসে হৃদয়ের তলা থেকে । দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কথাকলি।

৪

সেদিন সকালে ভুবন স্যারের বড় বৌমা খবরের কাগজটা হাতে নিয়েই উত্তেজিত । এই বছরের পদ্মশ্রীর তালিকায় রয়েছে ভুবন স্যারের নাম । ওনার একনিষ্ঠ দেশ সেবা ও কৃতী ছাত্রছাত্রী গড়ার স্বীকৃতি হিসেবে । জেষ্ঠ্য পুত্র চমকিত । গর্বিত। শুরু হয়ে গেল ফোনের রিনিঝিনি । ফোনের পর ফোন। কলিগ, বন্ধুবান্ধব,শ্বশুরবাড়ির লোক--- যেন সে নিজেই পদ্মশ্রী পেয়েছে।

ছোটভাইও ইতিমধ্যে খবরটা পেয়েছে । কিছুক্ষণের ভেতরেই বিশাল জাপানী গাড়ি হাঁকিয়ে বড় ভাইয়ের বাড়ি হাজির । হাজির স্তাবকেরা । সকলে মিলে স্থির করলো জলপাইগুড়ি যাবে । ফোন করলো । মা ধরলেন । ছেলেদের গলার আওয়াজ পেয়ে খুশি হলেন ।

ছেলেরা টুকরো টুকরো ছবি জুড়ে একটি পূর্ণচিত্র গড়ে তুললো । প্রেসের কাছে । ক্যামেরার সামনে । শৈশবের স্মৃতি, দুষ্টুমি করে বাবার হাতে মার খাবার গল্প । একসঙ্গে হিমালয়ের পথে পথে ঘোরার গল্প । বাবার সমাজসেবার কথা । শুধু কথার ফুলঝুরি । উৎসবের আয়োজন । হৈ চৈ, উন্মদনা । সাজ সাজ রব । ৮০০ স্কোয়ার ফিটের বাসিন্দারা কৌতুহলী । ছেলেদের মধ্যে রীতিমতন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, কে বাবাকে এনে রাখবে । এভাবেও মানুষ পালটায় !

পরদিন কাঞ্চনকন্যা ধরে যখন উত্তরবঙ্গে পৌছলো ততক্ষণে ভুবন স্যার পাড়ি জমিয়েছেন অনাস্বাদিত এক ভুবনে । এক অখন্ড নীরবতা ছড়িয়ে গেছে ছেলেদের ভেতরে । ওরা নির্বাক । সজোরে কড়া নাড়ছে -- খট খট খট ! ঘরের বন্ধ দরজা যেন কোনদিনই খুলবে না ।

একপাশে কথাকলি অন্যপাশে সুখদু:খের সাথী রাধাদেবী । তাঁর স্মৃতিগুলো এখন জীবন্ত । চোখের সামনে ভাসছে । প্রতিটা মূহুর্ত, ক্ষণ । তার চলার পথ

আজ অন্তহীন । সসীমের মাঝে অসীমকে খুঁজে পেয়েছেন, তাই উনি মৌনব্রতী । বড় বড় পা ফেলে ছায়াপথ ধরে হাঁটছেন পদ্মশ্রী ভুবনমোহন চ্যাটার্জি। নব উদ্যমে। হয়ত অমৃতের মাঝে মিলিয়ে যাবেন বলেই ।

দূর দ্বীপবাসিনি

বঙ্গোপসাগরে একটি দ্বীপ। ফেনিল জলরাশি, বাদামী প্রস্তর, সিগালের ঝাঁক আর রং বেরংয়ের ঝিনুক। এই নিয়েই ছোট্ট দ্বীপ খানি। তারই একপাশে একটি প্রকান্ড বাড়ি। ছিমছাম, রুচিপূর্ণ। দেওয়ালের গায়ে পাথরে খোদাই করা বাড়িটির নাম সমুদ্রমন্থন। বাসিন্দা একজন সমাজসেবিকা শিল্পপতি। সারাটা জীবন দেশের জন্য অনেক করেছেন। ব্যবসার প্রফিট থেকে গড়ে তুলেছিলেন অমৃতা নামে একটি সংগঠন। গরীবদের সাহায্য করা,বিনামূল্যের হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান --- কি না করেছেন! নিজে কোনদিন অভাবী ছিলেন না। তাঁরা একটু অন্যধাঁচের বাঙালী। বাবার ছিল ওয়াইনের ব্যবসা। প্রচুর লাভ হত। অচিরেই রিচ অ্যান্ড ফেমাসের তালিকায় ঢুকে পড়েন। তবুও গরীবদের জন্যে মন কাঁদতো। দামী গাড়ি,

কেতাদস্তুর পোশাক আশাক, প্রায় রোজ রাতেই ক্যান্ডেল লাইট ডিনার, রেন ডান্স সত্ত্বেও সংবেদনশীল একটা মন ছিল তাঁর। আর নামের মতনই তিনি লেখালেখিতে বেশ ভালই ইন্টারেস্ট রাখতেন। বিয়ে করেন ম্যানেজমেন্ট স্কুলের সহপাঠী নভীন মালহোত্রাকে।

বৈধব্যের বয়স দশ। এখন অখন্ড অবসর। লেখালেখি করেই কাটান। রিটায়ার করে উনি এই দ্বীপে বসবাস শুরু করেন। প্রয়াত স্বামীর গড়া *নভীন মালহোত্রা গ্রুপ অফ কোম্পানীর* চিফ মেন্টর পদে ইস্তফা দিয়েছেন তা প্রায় দু বছর হল। এই নির্জনতা, শান্ত পরিবেশ উপভোগ করেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষের কাছে নিরিবিলি এক মহার্ঘ্য বস্তু। সেই নিরালার সবটুকু রস চেটেপুটে খেতে চান উনি। কখনো বালুকাবেলায় হেঁটে বেড়ান। নুড়ি, ঝিনুক কুড়ান। ওনার অট্টালিকার পেছনেই আছে প্রাইভেট বিচ। সেখানে সিগালের ঝাঁক আসে। তাদের খসে পড়া পাখা দিয়ে বালির বুকে আঁকিবুকি কাটেন। কখনো ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যায়। সার দিয়ে জেলে ডিঙি ভেসে যায় সমুদ্রের বুকে। অবাক চোখে চেয়ে থাকেন। ওরা জানেনা শেষ পর্যন্ত তীরে ফিরতে পারবে কিনা। তবু প্রতিদিন রুটিন করে যায়। যেতে হয়। ক্ষয়াটে দেহ টেনে নিয়ে যায় নৌকোগুলি। এই তো মানব জীবন ! এর কতটুকু বদলাতে পেরেছেন সমাজসেবী, বিজনেস টাইকুন লেখা মালহোত্রা? বদল কি এতই সহজ ? নির্জন বেলাভুমিতে একাকিনি দাঁড়িয়ে দেখেন মানুষের বেঁচে থাকা। বিপজ্জনক ভাবে বেঁচে থাকা। হয়ত সাগরের কোন শেষ খুঁজে পাননা তাই তরঙ্গমালার দিকে চেয়ে মনে মনে হয়ে যেতে চান ঢেউ। অসীম বলশালী ঢেউ। যার একটি আলতো পরশে বদলে যায় সব হিসেব। নির্জনতা পিয়াসী লেখা ভাবেন, শুধু ভাবেন। মনে মনে কথাশিল্প গড়েন। ভাবনার জাল বোনেন।

দুরে হালকা জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু একটি হরিণ শিশু চলে আসে সমুদ্রমন্থনে। লেখা ওদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। আবার পালিয়ে যায়,ত্রস্ত পায়ে, বনপথ ধরে। তারপর বাকি দিনটা একা একা দিব্যি কেটে যায়। লাইব্রেরীতে বসলে মনে হয় –*ফুরিয়ে এলো দিন কিছুই তো হল না জানা, কত কাজ রয়ে গেল বাকি !*

জীবনকে দেখেছেন একটা উচ্চতা থেকে। আজ পথের শেষে পৌঁছে মনে হয় এই উচ্চতার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। সমাজে পাঁচমেশালি মানুষের ভিড়। সব জায়গায়ই হেরে যাওয়া, পলাতকেরা আছেন যারা অপরকে খামচে ধরে বাঁচতে চায়। কেউ ছুরি শানায় কেউবা সরীসৃপের মতন ঠান্ডা স্পর্শে মেরুদন্ডে শীতলতা ছড়িয়ে দেয়। আর কেউ কেউ ঘনিষ্ঠতার আড়ালে মিরজাফরের ভুমিকা নেয়। আসলে আমরা সবাই এক খাঁচার বাসিন্দা। কেউ কেউ মুক্তি খোঁজে, কেউ পেয়ে যায়। লেখা তাদেরই একজন। তাই নিয়েই সাহিত্য করেন। জীবনকে দেখার অভিজ্ঞতা, সত্য দর্শনের গভীরতা ছড়িয়ে দেন পাতায় পাতায়। পাঠকের মুঠোয় ধরা দেয় সেই সাতরঙা সৃষ্টি।

মাঝে মাঝে জার্নালিস্টরা চাঁছাছোলা ভাষায় বিরক্ত করে -- আপনি হাঁপিয়ে ওঠেন না? কোন সঙ্গী নেই, কথা বলার লোক নেই। কতদিন এভাবে কাটাবেন ? সভ্যতা থেকে এতদূরে শিক্ষিত মানুষ কিভাবে বাঁচতে পারে? এতো আদিমতার জায়গায়। দুনিয়া দ্রুত এগোচ্ছে মিসেস মালহোত্রা আপনার এই নির্জন জীবনের স্থায়িত্ব কতদিন?

লেখিকা লেখা মালহোত্রা নির্বাক থাকেন। হাসেন। কথা বাড়িয়ে লাভ কি ? একদিন পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে এই শরীর। লেখা ফুরাতে চান না। অবিনশ্বর হতে চান। তাই বেছে নিয়েছেন এই একাকীত্ব। খুঁজে পেতে চান নিজেকে। একটু নিজের সঙ্গে আলাপন, আত্মমগ্ন হয়ে অন্যরকমের এক মুক্তি আস্বাদন, এই তো চান। কল্পনাবিলাসী লেখা ইতিহাস খুঁড়তে চান না। বুকের ভেতরে আলোর পাখির চঞ্চলতা অনুভব করেন। জীবিকা ছেড়ে তিনি জীবনের পথে চলেছেন। দৃপ্ত ভঙ্গীতে। এক অমল সবুজ লেখা মালহোত্রা। ব্যবসায়ী হলেও যিনি ব্যবসা করতে কোনদিনই উৎসাহ পেতেন না।

সেদিন সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। হঠাৎ একটি ফোন এলো। এই বছরের রামণ ম্যাগসেইসেই পুরস্কার পাচ্ছেন লেখা মালহোত্রা। তাঁর আউটস্ট্যান্ডিং অবদানের জন্য। বিশ্বের দরবারে এশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেছে তাঁর নিরলস জনসেবা। এনেছে শান্তির নব বার্তা। তাই এই কৃতি মানুষটিকে সম্মানিত করছেন ওঁরা। এশিয়ার নোবেল প্রাইজ দিয়ে।

খবরটি জানাজানি হবার পর থেকেই ভেসে আসছে খুশির ঝলক । বন্ধুবান্ধব, চেনা অচেনা মানুষের কাছ থেকে । এক পুরনো বন্ধু রসিকতা করে বলেই ফেললেন– হে দূর দ্বীপবাসিনি ! প্রতিভাকে খুঁজে নেয় স্বীকৃতি । পারলেন পালিয়ে যেতে ?

লেখা মৃদু হেসে ফোন নামিয়ে রাখেন । বিভ্রান্ত পৃথিবী অগণন জনতার মাঝে হঠাৎ যেন একজন মানুষ পেয়ে গেছে । পরিয়ে দিতে চাইছে জয়মাল্য । কপালে এঁকে দিতে চাইছে জয়টিকা । সেই ভালোলাগা, ভিন্নতা ও জয়ধ্বনিতে ডুবে যাচ্ছেন লেখা । ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন ।

পরশু পুরস্কার প্রদান করা হবে । সকলেই ব্যস্ত, উত্তেজিত । লেখা মালহোত্রার পরিচিতরা । এক অপরূপ জাদুকাঠির ছোঁয়ায় আনন্দে উদ্ভাসিত । অনেকেই সশরীরে উপস্থিত থাকতে চান পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে । কেউ কেউ চলেও গেছেন । কল্পনায় দেখছেন হাততালিতে মুখর উৎসব প্রাঙ্গন । আঙিনায় হৈ হৈ রব । এক নতুন স্বপ্নের জন্ম হতে চলেছে । খুশীতে উদ্বেল ভারতবাসী ।

হঠাৎ এক অনাহুত ঝড়ে বুঝি থেমে গেল সব কোলাহল । উৎসব বিতরণের আগের দিন প্রভাতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো ভয়াবহ সুনামীর খবর । শতশত প্রাণ ধ্বংস হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় । মানুষ যে তার হাতের পুতুল ! লক্ষ লক্ষ প্রাণের শেষ চিহ্নটুকুও মেলেনি কোথাও । কেউ জানেনা কোন অতলস্পর্শী গহ্বরে তারা নিমজ্জিত আছেন । করুণ আর্তি, হৃদয়ের স্পন্দন চাপা পড়ে গেছে সমুদ্রের ক্রোধোন্মোত্ত রূপের আড়ালে । সারা পৃথিবী জুড়ে হতাশা, শব্দহীন আবহাওয়া ।

গভীর রাতের প্রলয়ে, জলোচ্ছ্বাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই দ্বীপটিও যেখানে বাস করতেন লেখা মালহোত্রা । এই বছরের রামণ ম্যাগসেইসেই পুরস্কারপ্রাপক । সবাই গম্ভীর । হতচকিত । বিহ্বল । গভীর যন্ত্রণায় নিশ্চুপ । স্থম্ভিত মিডিয়া । বোবা সরকার পক্ষ । ব্যথিত পুরস্কার প্রদানকারীরা । আর কখনো এরকম হয়নি তো !

শোক জ্ঞাপন করা হবে । অনুষ্ঠানের দিন সকালে সেইমতন সব সাজানো হল । কেউ এলেন কেউ গেলেন । অডিটোরিয়াম প্রায় ফাঁকা । ব্যাথাতুর

মন নিয়ে অনেকেই ফিরে গেছেন। শুরু হল শোকগাঁথা। হঠাৎ যেন কার পদধ্বনি শোনা গেল। কে ওখানে?

পরীর দেশ থেকে মঞ্চ আলো করে উড়ে এলেন এক হংসবলাকা। শ্বেত শুভ্র পোশাকে সুসজ্জিতা। চোখমুখ স্থির। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন অতিথিদের আসনপানে। সবাই চমকিত। উত্তেজিত। তবে কি স্বপ্ন দেখছেন ওরা ? বিস্ময়ের ঘোরে পুরো ঘটনার নীরব দর্শক তারা। শুধু দেখছেন। ভদ্রমহিলা স্তব্ধ। ভারি চমকে দিয়েছেন সকলকে। কিন্তু কিভাবে ? কিভাবে বেঁচে রইলেন উনি ? সেই দ্বীপটি তো আজ ইতিহাস।

-- ফুল। মৃদু হেসে বলে ওঠেন লেখা মালহোত্রা।

ফুল ? সবাই বিস্মিত। খুলে বলার জন্য অনুরোধ। লেখা অস্বাভাবিকভাবে হাসছেন। জোরে জোরে হাসছেন। সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে সবার কানে। একসময় হাসি থেমে গেল। বিষাদমলিন কণ্ঠ ভেসে এল --- চিরকালই আমি ফুল ভালোবাসতাম। তাই নির্জনতায় অবগাহন করলেও পৃথিবীর যে কোন স্থানে ফুলের আসর বসলে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। সেদিন শুনলাম ফুলের দেশ হল্যান্ডে এক অভিনব ফুলের মেলা বসেছে। এরকমটি আগে কখনো হয়নি। যদিও ওখানে নিয়মিত ফুল নিয়ে এক্সিবিশন, চর্চা হয় কিন্তু এইটি প্রথম হল। শোনামাত্রই ছুট্টে গিয়েছি। নিজের প্রাইভেট জেটে। ওখানেই পেয়েছি সুনামীর সংবাদ। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আমার দ্বীপ। হারিয়ে গেছে শত শত হরিণ, কাঠবেড়ালি, খরগোশ। ওরাই ছিল আমার সঙ্গী। নিকটজন। আর সেই ভাঙাচোরা মাটির মানুষগুলো। ওরা মৎস্যশিকারী।

ঠোঁট দুটো কাঁপছে, মুখে কথা নেই। দুচোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জীবনের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতির আসর ম্লান হয় কান্নায়। ডুঁকরে কেঁদে ওঠেন নব ম্যাগসেইসেই অ্যাওয়ার্ডি। এই সংবেদশীল মনকে ধরাই তো পুরস্কার প্রদানকারীদের লক্ষ্য। তাঁর অভাবনীয় উপস্থিতিতে অডিটোরিয়ামের সব মানুষ একইসঙ্গে কর্ম ও কর্মীর নিবিড় সান্নিধ্য উপলব্ধি করেন। আকুল আবেগে দর্শকাসনে নীরব হয়ে যান ওরা। এখন লেখা মালহোত্রার কথা বলার সময়।

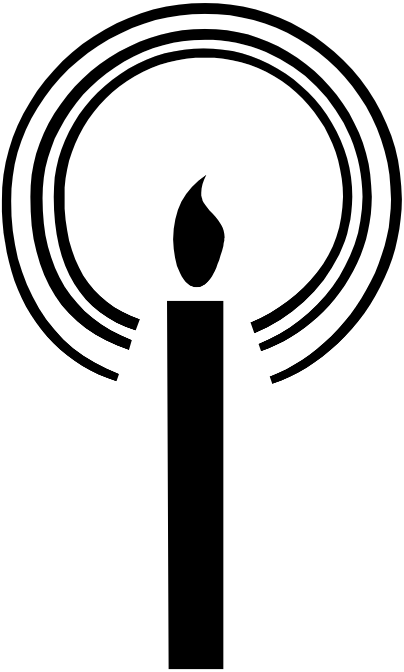

THE END